মুসা আল হাফিজ

প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ

সূচি

হাজার বছরের বিষ

ইসলাম যখন কথা বলে, পশ্চিমা সভ্যতার সব কথা আপন ঠিকানায় ফিরে যায়। দৃষ্টিবানরা দেখে, সেই ঠিকানার নাম জাহিলিয়াত। স্পষ্ট হয় জীবন সম্পর্কে ইউরোপীয় বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির অসারতা। প্রদর্শিত হয় তাদের চিন্তাধারা ও জীবনাচারের ভাঁজে ভাঁজে ছড়ানো মিথ্যা। প্রমাণিত হয় তাদের প্রবৃত্তিপূঁজারী সংস্কৃতির দেওলিয়াত্ব। উন্মোচিত হয় ধর্মের নামে স্বেচ্ছাচারি যাজকতন্ত্রের মুখোশ।

'এজ অব ডার্কনেসের' সে বর্বরতায় সমাচ্ছন্ন ছিলো তাদের জীবন, ইসলাম এর উৎসাদন নিশ্চিত করেছে। ত্রিত্ববাদের যে চিন্তাধারা তাদের ধর্মজীবনকে লাঞ্ছিত করছিলো, তাওহীদের দীক্ষা দিয়ে ইসলাম তার অবসান কামনা করেছে।

যে শাসকশ্রেণী অধিনস্ত সকল মানুষের প্রভু সেজে বসেছিলো, তাদের চাপিয়ে দেয়া দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য যুদ্ধ করেছে। তাদের 'দি হোলি রোমান এম্পায়ার' এর আধিপত্যের অবসান ঘোষণা করেছে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে উৎখাত করেছে যাজক ও শাসকশ্রেণীর স্বেচ্ছাচারের সাম্রাজ্য। তারপর দূরপ্রাচ্যেও তাকে তাড়া করেছে। তিষ্ঠাতে দেয়নি আফ্রিকায়। পিছু ধাওয়া করে চলে গেছে ইউরোপে। স্পেনে প্রতিষ্ঠা করেছে এমন সাম্রাজ্য, যার প্রভাব ও প্রতাপে সন্ত্রস্থ ইউরোপের কায়েমী মহল। যার আলোর উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ছে অন্ধকারের প্রাচীর।

মুসলিম বিজয়স্রোত ভাসিয়ে নিতে চায় বাকি ইউরোপ। সিসিলি, দক্ষিণ ফ্রান্সসহ বহু এলাকা মুসলিম অধিকারে। মুসলিমদের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ইউরোপের পতনাশংকা স্পষ্ট করে তুললো। নিজেদের শেষ চেষ্টা হিসেবে ফ্রান্স-জার্মানী সম্রাট চার্লস মাটেলের নেতৃত্বে টুরসের যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। ৭৩২ সালে সংগঠিত এ যুদ্ধে, প্রথমদিকে মুসলমানদের প্রাধান্য থাকলেও পরে জিতে যায় খ্রিস্টানরা। এ জয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে উইলিয়াম ম্যুর তার "The caliphate, its decline and Fall" গ্রন্থে লিখেন–

খ্রিস্টান ধর্মের ভাগ্য সেদিনের ফলাফলের উপর ঝুলছিলো। ইশ্বরের আশীর্বাদে খ্রিস্টধর্ম পতনের হাত থেকে রক্ষা পেলো।'

সে যুদ্ধে বিজয় ইউরোপের ভাগ্যের ফয়সালা করলেও মুসলমানরা বারবার ইউরোপ জয়ের প্রেক্ষাপট তৈরী করেন। বহুবার পরাজিত ইউরোপ ক্ষমা প্রার্থনা করে মুসলমানদের বদান্যতায় বেঁচে যায়। সম্রাট চতুর্থ কনস্টানটাইন পরাজিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা ও সন্ধি করে টিকে যান। গ্রীকগণও পরাজিত হয়ে ক্ষমা চায় ও করদানের শর্তে রাজত্ব ফিরে পায়। তাদের সম্রাট নাইমি ফোরাস মুসলমানদের হাতে হেরে যায়। কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে জীবন পেয়ে তিনবার সন্ধি ভঙ্গ করে। যুদ্ধ হয়। হার মানে। প্রতিবারই ক্ষমা পায়। মুসলিম শাসকদের উদারতা ইউরোপকে পতনের হাত থেকে বাঁচিয়ে দেয়। তাদের মহত্বকে পরবর্তি ইতিহাস রাজনৈতিক ভুল হিসেবে চিত্রিত করে। পরাজিত নাইমি ফোরাসকে রাজা হিসেবে না রেখে সাম্রাজ্য অধিকার করে নিলে চিরদিনের জন্য 'ইউরোপ' সমস্যা থেকে নিস্কৃতি পেতো মুসলিম জাহান। পরবর্তি পৃথিবীর ইতিহাস রচিত হতো অন্যভাবে।

শেষরক্ষা হিসেবে নিজেদের মানচিত্র টিকিয়ে রাখলেও ইউরোপ রুখতে পারছিলো না মুসলিম সংস্কৃতির প্রবল হাওয়া। মুসলিম সভ্যতার মাহাত্ম ও

ঐশ্বর্যের উদ্ভাসে কেঁপে উঠছে ইউরোপের চিত্ত। তাদের জ্ঞান ও সমৃদ্ধির সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। তাদের রাজত্বকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত বর্বরতায় নিপিষ্ট মানুষ। তাদের বীরত্বের মোকাবেলায় সন্ত্রস্থ পশ্চিমা প্রতিরক্ষা। সমুদ্রে তাদের আধিপত্য, ভূপৃষ্টেও। যুদ্ধমাঠে তারা অপরাজেয়, নৈতিকতায়ও। মনোবলে তারা অদম্য, কৌশলেও। ধার্মিকতায় তারা অতুলনীয়, প্রাত্যহিকতায়ও। আত্মগঠনে তারা অনবদ্য, সংগঠনেও। ঐক্যে তারা শীশাঢালা প্রচীর। দৃঢ়তায় তারা পাথুরে পাহাড়। চিন্তায় তারা স্বচ্ছ-গতিশীল। প্রেমে তারা সুগভীর, সুবিশাল। সেবায় তারা নিবিষ্ট, উদার। তাদের আছে এক কুরআন—জগতের ইতিহাসে যা আসমানী বিস্ময়। তাদের আছেন এমন নবী-সমস্ত কল্যাণের যিনি সমাহার। তাদের আছে এমন আইনী কাঠামো, যা জীবন ও জগতকে করে ন্যায়বান। তাদের আছে এমন বিশ্বাস, যার অটলতায় পাহাড়ও লজ্জিত। তাদের আছে এমন জীবনব্যবস্থা, জীবনের প্রতিটি প্রান্তরে যা বর্ষণ করে কল্যাণের বারিধারা। তাদের আছে এমন আধ্যাত্মিকতা, যা মরণাপন্ন জীবনকে দেয় যৌবনের বিভূতি। তাদের আছে এমন শিক্ষাধারা যার প্রভাবে জীবনের সব বদ্ধ দরোজা খুলে যায়।

মুসলমানদের সংস্পর্শে আসা জনগণের জন্যে তাই ইসলাম এক আশীর্বাদ। কিন্তু অধিপতি শাসক ও যাজকদের জন্য তা ছিলো এক জ্বলন্ত অভিশাপ। ইসলামকে তাই কলুষিত করতে হবে। তার আসল রূপ যাতে জনগণ না জানে। তাকে উপস্থাপন করতে হবে ঘৃণ্য ও বিকৃত অবয়বে। ইউরোপের অধিপতি যাজক- শাসকরা এ কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করলো। অসংখ্য মিথ্যা, উপকথা ছড়ানো হলো। হিংসাত্মক গালগল্প রটানো হলো। বক্তৃতায়- রচনায়- ধর্মসভায় ইসলামকে হাজির করা হলো, দানবীয় অবয়বে। অব্যাহত থাকলো ভয়াবহ প্রচারণা। পশ্চিমা জনজীবনে পড়লো তীব্র ও প্রচণ্ড প্রভাব।

প্রোপাগাণ্ডার মাত্রা আঁচ করতে আমরা নজর দিতে পারি গীতি-গানের প্রতি। অসংখ্য কবিয়াল ও গীতিকার ইসলাম বিদ্বেষী গান রচনা করতেন। গীর্জা তাদেরকে সম্মানী দিতো। ১৮৯৬ সালে ফরাসী লেখক কাউন্ট হেনরি তার "ইসলাম" গ্রন্থে লিখেন- 'কল্পনাও করতে পারি না মুসলমানরা কী ভাববে, যদি তারা মধ্যযুগীয় উপকথাগুলো শুনতে পায়। যদি তারা জানতো খ্রিস্টানরা তাদের নিয়ে কী ধরনের স্তোত্রগীতি রচনা করতো। আমাদের সকল স্তোত্র, এমনকি বারো শতকের পূর্বের স্তোত্রগুলোও একটি মাত্র ধারণা থেকে বিকশিত হয় এবং ক্রুসেডের পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখে। এ সকল স্তোত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি

সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষে পূর্ণ ছিলো। এ সব গানের প্রভাবে ইউরোপের মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা গেঁথে গিয়েছিলো। এক ধরনের বিধ্বংসী ধারণা তাদের চেতনায় প্রোথিত হয়েছিলো। যা আজো তাদের মধ্যে বিরাজমান। প্রত্যেকেই মুসলিমদের বর্বর, অবিশ্বাসী ও মূর্তিপূজারি হিসেবে বিবেচনা করতো।"

আল্লামা আসাদ জানাচ্ছেন– 'জ্বালাময়ী সংগীত শ্যাজো- দ্য রোঁলা রচিত হলো ক্রুসেডের ঠিক কিছু আগে। যাতে দক্ষিণ ফ্রান্সে ধর্মহীন মুসলমানদের উপর খ্রিস্টানদের অলীক যুদ্ধজয়ের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সংগে সংগেই গানটি হয়ে দাঁড়ালো ইউরোপের জাতীয় সংগীত।" "অলীক এই যুদ্ধ নিয়ে রচিত হলো মহাকাব্য। যে যুদ্ধের আবাস তাদের মনে, কল্পনায়। এ যুদ্ধে মুসলমানরা হন ধ্বংস। জয়ী হয় খ্রিস্টান।"

আল্লামা আসাদের পর্যবেক্ষণ– " এ যুদ্ধ নিয়ে রচিত মহাকাব্য হচ্ছে "অখণ্ড ইউরোপীয়" সাহিত্যের সূচনা। আগ থেকে চলমান আঞ্চলিক সাহিত্য থেকে যা ছিলো সুস্পষ্টভাবে স্বতন্ত্র। কারণ ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ।" (দি রোড টু মক্কা)

এ বিদ্বেষ কত প্রকট, প্রচণ্ড ও গভীর ছিলো, তার আন্দাজ পেতে ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম কবি দান্তের ডিভাইন কমেডিতে আমরা নজর দিতে পারি। তার ইনফার্নোর ২৪ তম ক্যান্টোতে হিংসামত্ত খ্রিস্টান মন দাঁত-নখ প্রদর্শন করে। যার অবয়ব খুবই ভয়াল, অবিশ্বাস্য।

এখানে 'মাওমেত' নামে উল্লেখ করেছেন মুহাম্মাদ সা.কে। তার কাল্পনিক নরকের ৯টি স্তরের অষ্টমটিতে 'মাওমেত' এর অবস্থান। এর আগে আছে অপেক্ষাকৃত কম পাপে বন্দি পাপীরা। যেমন কামুক, ধনলোলুপ, পেটুক, খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধবাদী, আত্মহননকারী ইত্যাদি। নরকের সর্বনিম্ন স্তরে শয়তান। আর তার আগের ধাপটি জালকারী ও বিশ্বাসঘাতকদের জন্যে। সেখানে আছেন জুডাস, ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াস। আর আছেন 'মাওমেত'!!! এটা শয়তানের ঠিক পাশের ধাপ। দান্তের ভাষায় 'সেমিনেটর অ.ডি. স্কেন্ডুলা সেইসমা।'

দান্তে তার বিদ্বিষ্ট খ্রিস্টান মনকে এতেও তৃপ্ত করতে পারেননি। মানবতার নবীর সা. জন্যে শাস্তির বর্ণনা দিয়েছেন, যা দান্তের অভিপ্রায়। যেমনটি হলে তার মন খুশি হয়। দ্বেষ ও উন্মাদনার আগুন শীতল হয়।

সেটা কী? খুবই রুচিগর্হিত, খুবই উদ্ভট, নির্লজ্জ। উল্লেখের অযোগ্য। কিন্তু তার ও তাদের মানসিকতা বুঝবার জন্যে সেই বিবরণ জানা চাই।" চিবুক থেকে শুরু করে নিম্নাঙ্গ পর্যন্ত অবিরামভাবে চিরে দু'ভাগ করা হচ্ছে। (অর্থাৎ দান্তে সুযোগ পেলে এমনটি করতেন) দেহের দু'টি অংশ দু'দিকে মেলে দেয়া হয়েছে।"

এরপর নাড়িভুঁড়ির বর্ণনা। মলমুত্রের বর্ণনা। পাশেই আছেন আলী রা.। তাকেও চিরে দু'ভাগ করা হচ্ছে। তিনি দান্তেকে অনুরোধ করেন– যেনো তিনি ফ্রা ডলসিনোকে সতর্ক করে দেন। কারণ তার জন্যেও একই ধরনের শাস্তি অনিবার্য। ফ্রা ডলসিনো ঐশী প্রত্যাদেশ লাভের ভান করতেন। পক্ষে ছিলেন অবাধ যৌনাচারের। দান্তে বুঝাতে চান কর্ম ও পরিণতির বেলায় ডলসিনো ও মুহাম্মদ সা. এক!

ইসলামের ইতিহাসের কীর্তিমান প্রায় সকলকে তিনি লাঞ্ছিত করার গোপন পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করেছেন। নরকে পুড়িয়ে, খণ্ড-বিখণ্ড করে। বীভৎস ও বর্বর প্রক্রিয়ায়। ইউরোপীয় মানসের জন্যে এ ছিলো সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। সর্বোত্তম ও স্থায়ী আদর্শ।

ওরিয়েন্টালিজমে এডওয়ার্ড সাঈদের ভাষ্য– "দান্তে কর্তৃক ইসলামকে কাব্যিকভাবে উপলব্ধিতে বৈষম্য ও বিকৃতি সুসজ্জিত এক পরিকল্পনা। প্রায় সৃষ্টিতাত্ত্বিক অপরিহার্যতার নজির। এর আশ্রয়েই ইসলাম ও তার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সম্পর্কে পশ্চিমের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক এবং সর্বোপরি নৈতিক ধারণার সৃষ্টি হয়।"

এই যে 'ভৌগলিক, ঐতিহাসিক ও নৈতিক ধারণা', ইউরোপ একে কখনো ত্যাগ করেনি। তাদের সভ্যতার রূপ-রং বদলেছে, রেনেসা-রিফর্মেশন হয়েছে, অসংখ্য দিক ও বিষয়ে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে। কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে আগের অবস্থান তারা পরিবর্তন করতে পারেনি। আল্লামা মুহাম্মাদ আসাদ "ইসলাম এ্যট দ্যা ক্রসরোড" এ জানাচ্ছেন– " প্রতিবার মুসলিম শব্দটি উচ্চারণের সাথে সাথে তা তাদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বংশপরম্পরায় এই ঘৃণা প্রতিটি ইউরোপীয় নারী-পুরুষের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। প্রোথিত হয়ে গেছে তাদের মন ও মানসের গভীরে। সবচে' বিস্ময়ের দিক হলো– সব ধরনের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের পরেও তা তাদের মাঝে আজো বিদ্যমান এবং সবলে। ধর্মীয় সংস্কারের একটি সময় এসেছিলো ইউরোপে। বিভিন্ন গোত্র ও সম্প্রদায়ে তারা ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। পরস্পরের

বিরুদ্ধে তারা তখন রণসাজে সজ্জিত। সমরে উন্মুখ, উন্মত্ত। কিন্তু তখনও প্রতিটি গোত্রে ইসলামের প্রতি একই মাত্রার ভয়াল বিদ্বেষ ও তীব্র শত্রুতা দেখা যাচ্ছিলো। সময়ের পরিক্রমায় ধর্মীয় উন্মাদনা দ্রুতই ম্লান হয়ে গেলো। কিন্তু ইসলামের প্রতি বজায় রইলো তাদের একই রকম তীব্র ঘৃণা।

এর এক অনন্য দৃষ্টান্ত ফরাসী দার্শনিক ও কবি ভলতেয়ার। যদিও সে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও গীর্জার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিলো, কিন্তু একই সাথে ইসলাম ও রাসূলে আকরামের সা. প্রতি একই রকম ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতো। এর কয়েক দশক পরে পশ্চিমা বুদ্ধিজীবিরা বিদেশী সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা শুরু করলো। তাদের মাঝে জন্ম নিলো এক ধরনের উদার ও সহানুভূতির দৃষ্টিভঙ্গি। কিন্তু ইসলামের কথা যখনই আসতো, তখনই তাদের বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পুরনো ক্ষোভ ও সংকীর্ণতা উস্কে উঠতো। ইউরোপ ও ইসলামী বিশ্বের মাঝে ইতিহাসে যে ব্যবধান রচিত হয়, তা আর কখনোই জোড়া লাগেনি। ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ পরিণত হয় ইউরোপীয় চিন্তা-চেতনার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে।"

যদিও ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে এ বিদ্বেষ অব্যাহত থেকেছে, কিন্তু এর উত্তাপ বিকাশ ও ভয়াবহ প্রকাশ দেখা যায় ক্রুসেডে। আজ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রভূমিতে আছে সেই ক্রুসেড!

"দি রোড টু মক্কা"য় আল্লামা আসাদের ভাষ্য– 'ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতীচ্যের যুগ যুগ লালিত শত্রুতা –যা আদতে ছিলো ধর্মীয়– আজো অবচেতন মনে তা টিকে আছে। .... ক্রুসেডের ছায়া আজো প্রসারিত হয়ে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর।" "পাশ্চাত্যের লোকেরা আজকের দিনে ইসলাম সম্পর্কে যা চিন্তা করে এবং অনুভব করে, তার শিকড় রয়েছে সেই সব গভীর প্রভাবের চাপ এবং স্মৃতির ছাপের মধ্যে, যা জন্ম নিয়েছিলো ক্রুসেডের সময়।"

হাজার বছর ধরে পশ্চিমা মন ইসলাম প্রশ্নে যে বিষফলের আবাদ করে চলছে, তার ভাড়ারের চাবি হচ্ছে ক্রুসেড। বিদ্বেষবিষাক্ত চিন্তা, রচনাকর্ম, ভাবধারা ও কৃৎকৌশলের যে সমাহার এতে রয়েছে, তার বিপুলতার সামনে ইউরোপের মানবিক প্রেরণাজাত সৃষ্টিকর্ম পরিমাণের স্বল্পতায় নিতান্তই দরিদ্র।

'পোপ দ্বিতীয় আরবান তার ক্লারমেন্টের বিখ্যাত বক্তৃতায় যখন পবিত্রভূমি দখল করে রাখা 'পাষণ্ড জাতির' বিরুদ্ধে খ্রিস্টানদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন,তখন তিনি সম্ভবত তার নিজের অজান্তেই পাশ্চাত্য সভ্যতার চার্টার বা সনদ ঘোষণা করেন ।'

(আল্লামা আসাদ [লিউপোল্ড উইস])

ক্রুসেড ! ক্রুসেড!!

এ ছিলো এক হিংস্র তুফান। খ্রিস্টিয় ধর্মোন্মত্ততার ঝটিকা। ইউরোপ যাকে বলে 'পবিত্র যুদ্ধ'। ইতিহাস যাকে বলে 'বর্বরতা'। ইউরোপ যা পরিমণ্ডিত করে 'রোমান্সের অলৌকিক মহিমায়'। ইতিহাস যাকে অভিহিত করে 'মানবেতিহাসের কলংক'। এতে অংশ গ্রহণকারী সকল নাইট বা বীর ইউরোপের কাছে 'বীরত্বের শ্রেষ্ঠ আদর্শ'। কিন্তু ইতিহাস তাদেরকে কীভাবে দেখে? খ্রিস্টবাদী ঐতিহাসিক গীবনও স্বীকার না করে পারেননি যে, "খ্রিস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করে।" [উদ্ধৃতি : ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত : আশকার ইবনে শাইখ]

চতুর এক লেখকের ভাষায়– "ক্রুসেডগুলো ইতিহাসের চরম উত্তেজনাপূর্ণ অধ্যায়। ব্যর্থতার ফলে অবসাদ না আসা পর্যন্ত খ্রিস্টধর্ম প্রায় তিন শত বছর ধরে মুসলমানদের ধর্মের বিরুদ্ধে প্লাবনের মত অভিযানের পর অভিযান চালিয়েছে। নিজেদের মনে তৈরী কুসংস্কারের কবর রচনা করেছে নিজেরাই।

ক্রুসেড ইউরোপকে করে দেয় ধনশূন্য। জনশূন্য। নিক্ষেপ করে সামাজিক দেউলেপনার অতল গর্ভে। এতে প্রাণ হারায় লক্ষ লক্ষ মানুষ। মানুষ মরে যুদ্ধে, অনাহারে, রোগে। আর ক্রুসের যোদ্ধাদের কলঙ্কিত করে কল্পনাতীত নৃশংসতা।"

ইউরোপ তখন মুসলিম শক্তিসমূহের দ্বারা তিন দিক থেকেই পরিবেষ্টিত। ভূমধ্যসাগর থেকে নিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত মুসলিম সম্রাজ্যের একক আধিপত্য। খ্রিস্টানদের পবিত্র অঞ্চল মুসলিম শাসনাধীন।

কিন্তু খ্রিস্টানরা উদ্বিগ্ন হবে, তেমন কিছু তখন ঘটেনি। মুসলিম দুনিয়ায় তারা আরামেই ছিলো। পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছিলো। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছিলো সর্বোচ্চ মাত্রায়। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করছিলো অবাধে। সরকারী চাকুরির পথ তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিলো মুসলমানদের মতোই। যেমন উন্মুক্ত ছিলো ব্যবসা-বাণিজ্য, সম্পদ অর্জন, রাজনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা, ধর্মপালন, যাতায়াত ও নিরাপত্তা ভোগের অধিকার।

প্রফেসর আর্নল্ড দেখিয়েছেন– সাধারণ খ্রিস্টানরা মুসলিম সম্রাজ্যের উন্নতির যে মাত্রা স্পর্শ করে, খ্রিস্টান রাজ্যেও তা সম্ভব ছিলো না। জেরুসালেমে (জেরুজালেম – ভুল উচ্চারণ) খ্রিস্টান পুরোহিতদের জন্যেও বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট ছিলো। যেখানে মুসলিম সম্রাট হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। সম্রাজ্যের সর্বত্রই ছিলো খ্রিস্টান মঠ ও গীর্জা। সর্বত্রই ছিলো ধর্মীয় তৎপরতার স্বাধীনতা। ৯৬৯ সালে ফিলিস্তিন ও সিরিয়া ফাতেমীদের হাতছাড়া হলে খ্রিস্টানদের জন্য সুযোগ-সুবিধার দরজা আরো প্রশস্ত হয়। খ্রিস্টিয় বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক তৎপরতায় স্বয়ং সুলতানগণ পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন। তীর্থযাত্রী খ্রিস্টানদের আতিথেয়তা তখন আরবদের রেওয়াজে পরিণত হয়।

কিন্তু খ্রিস্টানরা জেরুসালেমে মুসলমানদের উপস্থিতি সহ্য করতে পারতো না। কোনো সহনশীলতাই তাদের মনোরঞ্জন করতে পারেনি। তীর্থযাত্রীরা আরবদের আতিথেয়তা উপভোগ করতো। ফিরে যেতো অন্তরে বিদ্বেষ নিয়ে। অপেক্ষা করতো কখন শেষ হবে দশম শতাব্দী!

কারণ তাদের শুনানো হয়েছিলো দশম শতাব্দী শেষ হলে যিশুখ্রিস্ট স্বয়ং নেমে আসবেন জেরুসালেমে। প্রতিষ্ঠা করবেন হাজার বছরের খ্রিস্টিয় রাজত্ব। অতএব তার আগমনের আগেই জেরুসালেম থেকে খেদাতে হবে যিশুর শত্রুদের। অপবিত্র মুসলমানদের। তারই প্রস্তুতি হিসেবে হাজার হাজার খ্রিস্টান ফিলিস্তিনের দিকে ধেয়ে চললো। যেখানে সেখানে জড়ো হয়ে তারা হুজুরে পাক সা. সম্পর্কে অশ্লীল কথাবার্তা বলতো। এইসব অপরিচিত মানুষ ও তাদের ধর্মোন্মাদনা স্থানীয়দের হতচকিত করে দেয়। কিছু তুর্কমান যুবক কুরআন ও

নবীর সা. অবমাননাকারী কয়েকজনকে প্রহার করে। মরুপথে কিছু খ্রিস্টান যাত্রী লুঠেরাদের কবলে পড়ে। যেমন পড়তো মুসলিমগণ।

পোপ দ্বিতীয় আরবান এই ঘটনারই অপেক্ষা করছিলেন। ১০৯৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চে প্লাসেনটিয়ায় তিনি এক সভা আহ্বান করেন। নভেম্বরে আরেকটি সভা ডাকেন ক্লারমেন্টে। যিশুখ্রিস্টের 'সমাধিভূমিতে' দখলদার অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তিনি ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এতে যারা যোগ দেবে, তাদের জন্যে পাপমোচন ও স্বর্গলাভের নিশ্চয়তা ব্যক্ত করলেন।" যারা যিশুর সন্তানদের উপর হামলা করেছে, তাদের দেশ দখল করতে হবে।" দুনিয়ার সকল সুখ তারা ভোগ করছে। তাদের ঘরে ঘরে আছে অনিন্দ্যসুন্দর রমণী আর তুলনাহীন ঐশ্বর্য। "পিতা এসব দিয়েছেন খ্রিস্টানদের।"

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো হাজার হাজার পাদ্রী-প্রচারক। "মুসলমান সন্ত্রাসীরা যিশুর সন্তানদের উপর হামলা করেছে। যিশু আসছেন প্রতিশোধ নিতে। অতএব তৈরী হও! বেরিয়ে পড়ো!!"

প্রথমে বের হলো পাদ্রী ওয়াল্টারের নেতৃত্বে একটি বাহিনী। বুলগেরিয় খ্রিস্টানদের হাতে তাদের সমাধি রচিত হয়। তারপর সকল জাতি ও ভাষার চল্লিশ হাজার পুরুষ-নারী, বালক-বালিকার আরেক বাহিনী। তাদের নেতা সন্ন্যাসী পিটার। বুলগেরিয়ার মেলভিনে তারা পূববর্তীদের হত্যার বদলা নিলো। মেরে ফেললো, সাত হাজার নারী-শিশু। প্রদর্শন করলো সর্বপ্রকার নীচুতা, বর্বরতা। বসফরাস প্রণালী পাড়ি দিয়ে তারা যখন এশিয়ায় ধেয়ে এলো, মিখদের ভাষায়– 'তাদের দুস্কর্মে প্রকৃতিও কেঁপে উঠলো।' তারা মায়ের কোলের শিশু হত্যা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শূন্যে ছড়িয়ে দিতো। পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে সুলতান তাদেরকে আক্রমণ করেন। তাদের পরাজিত কিছু নেতা মুসলমান হন। বাকিরা হয় নিহত।

তৃতীয় প্লাবনটি তৈরী হয় মিখদের ভাষায়– 'মনুষ্য সমাজের অতীব মূর্খ ও বর্বর আবর্জনা দ্বারা।' এর পরিচালক ছিলো গডশেল নামের এক জার্মান পাদ্রী। অবাধ পৈশাচিক লুণ্ঠন, ব্যাভিচার ও লাম্পট্যে তারা সবাইকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। অমিতাচার ও বর্বরতায় ডুবে গিয়েছিলো। যাত্রাপথে মৃত্যু-রক্ত আর ধ্বংসলীলার ঝড় বইয়ে দিচ্ছিলো। তাদেরকে আক্রমণ করে হাঙ্গেরির জনতা। ফলে বেলগ্রেডের সমতলভূমি ক্রুসেডারদের অস্থি ও হাড়-গোড়ে একাকার হয়ে যায়। জীবিত কয়েক হাজার ক্রুসেডার পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করতে পালিয়ে যায় স্বদেশের দিকে।

পরের বাহিনী গঠিত হয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স ও লরেইনের লোক দ্বারা। মিলসের ভাষায়– 'ওরা ছিল বর্বর, বেপরোয়া, অসভ্য।' মুসলমানদের নাগাল না পেয়ে ওরা হত্যা করে ইহুদীদের। অবাধ লুটতরাজ চালায় শহরে, জনপদে। তাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ হাঙ্গেরিকে বিরান করে দিচ্ছিলো। হাঙ্গেরির যোদ্ধারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় মেননবুর্গের রণাঙ্গনে।"

১০৯৭ সালে গঠিত হয় আরেকটি বাহিনী। সাত লাখ সৈন্যের বিশাল জোয়ার এগিয়ে চললো গডফ্রের নেতৃত্বে। ১০৯৭ এর অক্টোবর থেকে ১০৯৮ এর জুন পর্যন্ত সেলজুক সুলতানের রাজধানী নাইস অবরোধ করে রাখে। সেখান থেকে যায় এন্টিয়কে। ৯ মাস স্থায়ী হয় এন্টিয়ক অবরোধ। ফুরিয়ে যায় খাদ্য। ক্রুসেডারদের এতে কোনো সমস্যা হয়নি। তারা মানুষ হত্যা করতো। রান্না করতো নরমাংস। মৃতদেহের অঙ্গচ্ছেদ ছিলো ওদের প্রিয় এক খেলা। আরবদের মৃতদেহ কবর থেকে তুলে ওরা টুকরো টুকরো করতো। জয়ের প্রতীক হিসেবে তারা প্রদর্শন করতো গণহত্যার শিকার মুসলমানদের কর্তিত মস্তক। শিবিরে শিবিরে বর্শায় বিদ্ধ করে ঝুলিয়ে রাখা হতো মুসলমানদের খণ্ডিত দেহ।

১০৯৮ এর জুনে এন্টিয়ক দখল করে ওরা মর্মর পাথরে তৈরী অট্টালিকা থেকে নিয়ে দরিদ্রের পর্ণকুঠির পর্যন্ত সবকিছু দেয় গুড়িয়ে। গোটা শহরকে বানায় অচেনা এক বধ্যভূমি। চতুর্দিকে লাশ আর রক্ত। সরু গলি থেকে মহাসড়ক প্লাবিত হয় মানুষের রক্তে। এন্টিয়ক জয় করেই হত্যা করে দশ হাজার মানুষ। যুবকদের বানায় দাস। অভিজাত রমণীদের জীবিত রাখে, নিজেরা কতোটা পাশবিক, তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য। অমিতাচার আর ব্যাভিচারের চূড়ান্তে ওরা পৌঁছে যায়। মিখদের ভাষায়– "কুখ্যাত ব্যাবিলনের সকল পাপই 'পবিত্রভূমির পরিত্রাতাদের' মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।" সকল কিছু ধ্বংস করে ওরা এগুতে লাগলো। সিরিয়ার অন্যতম সমৃদ্ধ জনপদ মায়াররা আল নুমান এখন সামনে। নিরাপত্তার অঙ্গীকার পেয়ে অধিবাসীরা অস্ত্রসমর্পণ করলো। এলাকায় প্রবেশ করেই ওরা হত্যা করলো এক লক্ষ মানুষ। যারা জীবিত থাকলো, সকলকে দাস বাজারে বিক্রির জন্য রেখে দেয়া হলো। সুন্দর ও বলিষ্ট অনেককে হত্যা করা হলো; ওদের মাংস সুস্বাদ হবে, এই ধারণায়।

এরপর জেরুসালেম। অবরুদ্ধ হলো নগরী। অধিবাসীরা বুঝতে পারলো, তারা অবশ্যই পরাজিত হবে। হামলাকারীদের সেনাপতি টুনকার্ড তাদেরকে দিলো নিরাপত্তার অঙ্গীকার। নগরীর নেতৃবৃন্দের হাতে তুলে দিলো সাদা পাতাকা। নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে। ১০৯৯ এর ১৫ জুলাই ওরা নগরে প্রবেশ করলো। শান্তির অঙ্গীকার ভুলে গেলো মুহূর্তেই। শ্বাসবিশিষ্ট কাউকেই ওরা বেঁচে

থাকতে দেয়নি। মৃত্যুর আর্তনাদ ও কান্নার রোলের ভেতর শহরটি ডুবে গেলো। তারপর একসময় স্তব্ধ হয়ে গেলো সবকিছু। চতুর্দিকে কবরের নিরবতা। মাঝে মাঝে নিরবতা ভঙ্গ করে ক্রুসেডাররা হুহুল্লাস করছে। ধ্বংসস্তুপের উপর দিয়ে ঘোড়া চালাচ্ছে। এগুতে পারছে না ঘোড়া। রক্তের স্রোতে ভাসমান লাশ দেখে ঘোড়াও যেনো সন্ত্রস্থ। গোটা জেরুসালেম যেনো রক্তে ভাসমান এক মৃত শহর। রেমন্ড দি এ্যাগিলেস নামে এক ক্রুসেডার জানাচ্ছে– 'মসজিদের বারান্দায়ও ছিলো হাঁটু পরিমাণ রক্ত। ঘোড়ার লাগাম পর্যন্ত পৌঁছেছিলো রক্তস্রোতের উচ্চতা।'

মোস্তফা আসসাবায়ী জানাচ্ছেন– "শুধু মসজিদে আকসায় হত্যা করা হয় সত্তুর হাজার মানুষ।"

ইবনুল আসির জানাচ্ছেন– "যে সব আরব দুর্গ ও প্রাসাদের ছাদে আশ্রয় নিলো, তাদেরকে বাধ্য করা হলো ঝাঁপিয়ে পড়তে। জীবন্ত দগ্ধ করা হলো তাদেরকে। যারা ভূগর্ভস্থ আশ্রয়শিবিরে ছিলো, তাদেরকে টেনে বের করা হলো। মৃতদেহের স্তুপের উপর তাদেরকে বলি দেয়া হলো প্রকাশ্যে। কোথাও অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে শিশুরা। মরণাপন্ন বৃদ্ধদের টেনে এনে বলি দেয়া হচ্ছে কোথাও। মাঠে-ঘাটে নর-নারীর মৃতদেহ। পথে-প্রান্তরে শিশুদের খণ্ডিত শরীর। বীভৎসতা দেখে শয়তানও সেদিন কেঁপে উঠেছিলো।"

জেরুসালেমের রাজা হলেন বোইলনের গডফ্রে।

ক্রুসেডাররা থামলো না। ধ্বংসের প্লাবনে ভেসে গেলো সিজারিয়া, ত্রিপোলি, টায়ার ও সিডন। যে সব শহর উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো, সেগুলো বধ্যভূমিতে পরিণত হলো। দোলায়িত শস্যক্ষেত, হাস্যময় দ্রাক্ষাকুঞ্জ আর সমৃদ্ধ ইক্ষুভূমি হলো উজাড়। কমলালেবু - জামির আর খেজুরের বাগান হলো আগুনের খাদ্য। শত শত গ্রন্থাগার আর অজস্র বিদ্যালয় হলো নিশ্চিহ্ন। যেখানে ছিলো কবিতা, দর্শন আর সংগীতের কোলাহল, সেখানে আসর বসানো হলো লাম্পট্যের। উঁচু উঁচু অট্টালিকা, প্রাসাদসদৃশ বালাখানা, সামাজিক মিলনকেন্দ্র পরিণত হয় পাপের আস্তানায়। মসজিদসমূহ দেয়া হয় গুড়িয়ে। জীবিত সকল মুসলমানকে বানানো হয় ভূমিদাস। বহু কবি, ভাষাবিদ, সংগীতজ্ঞ, ঐতিহাসিক, পর্যটক, ভূতাত্তিক, জ্যোতির্বিদ, বিজ্ঞানী, ধর্মতাত্তিক পরিণত হন দাসে। শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসদের সাথে রাস্তায় ফেরি যোগে বিক্রি হতে থাকেন তারাও।

ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল গেলো বর্বরদের হাতে। ১১১৩ এর জুন মাসে বল্ডউইন হন নতুন রাজা। তিনি আগ্রাসী হাত বাড়িয়ে দেন দামেশকের দিকে। ১১১৩ এর জুলাই মাসে দামেশক, মসুল, সঞ্জর ও মারদিনের মুসলিম

বাহিনী সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। মসুলের সুলতান মওদুদের পৃষ্ঠপোষকতায় তারা অভিযান চালান ফিলিস্তিনে। টাইবেরিয়াসের কাছে হয় ঘোরতর যুদ্ধ। ক্রুসেডাররা খেলো শক্ত মার। তাদের বহু লোক নিহত হলো। পালাতে গিয়ে অনেকেই জর্ডান নদীতে নিমজ্জিত হলো। এরপর গুপ্তঘাতক দিয়ে তারা হত্যা করালো সুলতান মওদুদকে। তাদের সাথে ছিলো সমগ্র খ্রিস্টান জগত। অনবরত সামরিক সাহায্য পেয়ে তারা হয় আরো বলিষ্ট। ধ্বংসের তাণ্ডবে মিসমার করতে থাকে শহরের পর শহর।

১১১৮ সালের ৬ আগষ্ট ক্ষমতায় আসেন সুলতান মুস্তারশিদ বিল্লাহ। ক্রুসেডারদের তিনি প্রতিরোধ করেন শক্ত হাতে। দখলকৃত এলাকা থেকে তাদের বিতাড়িত করেন ধীরে ধীরে। তারই শাসনামলে উত্থান হয় মহান মুজাহিদ ইমাম উদ্দীন জঙ্গির। ১১২৭ এর সেপ্টেম্বরে তিনি মসূলের শাসনভার লাভ করেন। সময়টি ছিলো খুবই দুর্যোগময়। ক্রুসেডারদের দৌরাত্মে চতুর্দিক প্রকম্পিত।

ইবনুল আসির লিখেন– 'তাদের সৈন্য ছিলো বেশুমার। বেড়েই চলছিলো তাদের লুণ্ঠন। কেবলই ভয়াবহ হচ্ছিলো তাদের অত্যাচার। কোনো শাস্তির ভয় তাদের ছিলো না। যে কোন অনাচারে তাই উদ্যমের অভাব ছিলো না। তাদের হাত থেকে মুসলিম-অমুসলিম কারোই নিস্তার ছিলো না। তারা যে হারে কর ধার্য করছিলো, তাই দিতে হচ্ছিলো। তাদের দৌরাত্মের কাছে অসহায় ছিলো গোটা দেশ। অসংখ্য শহর। জঙ্গির তাই বিশ্রামের সুযোগ ছিলো না। বর্বরদের মোকাবেলায় তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাদেরকে বিতাড়িত করেন বুজাআ থেকে। মসুল থেকে। ১১২৮ সালে অধিকার করেন আলেপ্পো শহর। তারপর হামাহ।

১১৩৮ সালে সম্রাট কমনিসাসের নেতৃত্বে একদল গ্রীক হানাদার ক্রুসেডারদের সাথে যুক্ত হলে তারা আবার উত্তেজিত হয়। অতর্কিতে দখল করে নেয় বুজাআ। হত্যা করে সকল পুরুষকে। বন্দী করে সব নারী-শিশুকে। তারপর হামলে পড়ে দুর্ভেদ্য সায়জার দুর্গে। কোনো কিছু ঘটার আগেই মহান জঙ্গী তাদরকে ধাওয়া করেন। ক্রুসেডাররা পলায়ন করে। তিনি অগ্রসর হয়ে ত্রিপোলির কাউন্টের রাজ্যে অবস্থিত আকা দুর্গ অধিকার করেন। ১১৩৯ সালে উদ্ধার করেন বর্বরদের লুটমারের কেন্দ্র বারীন দুর্গ।

তারপর দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে ১১৪৪ এর সেপ্টেম্বরে অভিযান পরিচালনা করেন ক্রুসেডারদের রূহা (এডেসা) ঘাটিতে। এ নগরীর প্রতি তারা পবিত্রতা আরোপ করতো। রূহা হাতে নিয়েই তিনি নিরাপত্তা দেন অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তির। মুক্তি দেন সকল বন্দী খ্রিস্টানকে। সকল স্ত্রী ও শিশুকে। ফেরত

দেয়া হয় তাদের সম্পত্তি। এ বীরের হাতে তারপর বর্বররা হারে শীরুজ ও রীবার সম্মুখ যুদ্ধে।

পরে ওরা কয়েকজন গুপ্তঘাতক ক্রীতদাসের মাধ্যমে তাকে হত্যা করায়, সেপ্টেম্বর, ১১৪৬ সালে।এডেসার পতন সংবাদ ইউরোপে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নতুন ক্রুসেড ঘোষণা করেন ক্লেয়ারভক্সের সেন্ট বার্নার্ড। ১১৪৭ সালে জার্মানির সম্রাট তৃতীয় কনরাড ৯ লক্ষেরও বেশি হানাদার নিয়ে যাত্রা করেন ফিলিস্তিন ও সিরিয়ার দিকে। এ অভিযাত্রায় হাজার হাজার সুন্দরী ললনা অংশগ্রহণ করে। চরিত্রহীনতার চূড়ান্ত প্রদর্শনী ঘটিয়েই তারা এগিয়ে চলছিলো। কনরাডের স্ত্রী এলিনর হয় সপ্তম লুইসের শয্যাসঙ্গী। ভোগাসক্তি ও অবাধ মেলামেশার জন্যে বিখ্যাত হন টুলের কাউন্টেস, ব্রয়েসের কাউন্টেস, ফ্লানডার্সের সিবাইল, রসির কাউন্টেস, মরিল, বোইলনের ডাচেসসহ অসংখ্য রমণী। তাদের রাণী ছিলেন, গিনির এলিনর। মুসলিম দুনিয়ায় এ বাহিনী তেমন কোনো গণহত্যা ঘটাতে পারেনি। দামেশক অবরোধ করে ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে যায়। কিন্তু অবাধ যৌনচারের সে উস্কানী তারা চারদিকে ছড়িয়ে দেয়, এর ভয়াবহতা ছিলো তীব্র ও গভীর।

মহান আতাবেক ইমাম উদ্দীন জঙ্গির শাহাদাতের পর শাসক হন তার পুত্র নূরুদ্দীন মুহাম্মদ জঙ্গি। প্রতীচ্যে তাকে নোরাডিনাস নাম দেয়া হয়। ১১৪৮ সালে দামেশকের চারদিকে পঙ্গপালের মত সমবেত কনরাডের বাহিনীকে তাড়িয়ে এগিয়ে যান এন্টিয়কের দিকে। সেখানে আজজাগরা নামক স্থানে চুর্ণ করেন বর্বরদের দর্প। নিহত হয় এন্টিয়কের রক্তপায়ী রাজা রেমন্ড। রেমন্ডের মৃত্যুতে শক্তিশালী হন হিংস্র ক্রুসেডার জোসেলিন। তার কাছে আতাবেক মাহমূদ প্রথমবার পরাজিত হলেও পরবর্তি অভিযানে তাকে করেন বন্দি। ধূর্ততা, ক্ষিপ্রতা ও হিংস্রতায় জোসেলিন ছিলো ফ্রাংকদের প্রধান। তাকে খোয়াড়ে ঢুকিয়েই নূরুদ্দীন জঙ্গি অধিকার করেন বহু দুর্গ। ১১৬২ খ্রিস্টাব্দে দুলুকের যুদ্ধে তিনি অর্জন করেন বিশাল বিজয়। ১১৬৪ এর আগস্টে ক্রুসেডারদের সম্মিলিত বাহিনী আক্রমণ করে সিরিয়ার হারিন শহরে। মুসলমানরা ততদিনে পরাজিত মানসিকতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তাদের পায়ে বারবার দলিত হচ্ছে ক্রুসেডারদের অহংকার। এ যুদ্ধেও তারা দলিত হলো। বন্দি হলো এন্টিয়কের অধিপতি বহেমন্ড, ত্রিপলির রেমন্ড, তৃতীয় জোসেলিন, গ্রীক সেনাপতি ডিউক।

মিসরের ফাতেমী রাজবংশ এ সময় ছিলো মৃত্যুদশায়। আল আজিদ লিদীনিল্লাহ ছিলেন এ বংশের শেষ খলীফা। তিনি ছিলেন চিররোগী। শাসনদণ্ড ছিলো ওজির শাওয়ার আস সাদীর হাতে। সে এক ষড়যন্ত্রের দায়ে হয় পদচ্যুত। সাহায্য চায় নূরুদ্দীন মাহমূদের কাছে। ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে সহযোগিতার শর্তে

তিনি সাহায্যে রাজী হন। মিসরে পাঠিয়ে দেন একদল রক্ষী। যাদের প্রধান ছিলেন আসাদ উদ্দীন শিরকুহ।

তার সাহায্যে শাওয়ার ফিরে পান ক্ষমতা। বিশ্বাসঘাতক শাওয়ার ক্ষমতা হাতে পেয়েই হাত মেলান ক্রুসেডারদের সাথে। শিরকুহকে বাধ্য করেন মিসর থেকে ফিরে যেতে। মিসর ধীরে ধীরে ক্রুসেডারদের খেলার জমি হয়ে উঠলো। শিরকুহ তাই ১১৬৭ সালের জানুয়ারীতে মিসরে আবার প্রবেশ করলেন। বিশাল বাহিনী নিয়ে শাওয়ার তাকে রুখে দিতে চাইলেন। ক্রুসেডার বাহিনীও তার সাথে মিলিত হলো। মাত্র এক হাজার অশ্বারোহী নিয়ে শিরকুহ তাদেরকে পরাজিত করেন। দখল করে নেন আলেকজান্দ্রিয়া। মিসরে হাত বাড়াবে না- অঙ্গীকার করে ক্রুসেডাররা। শাওয়ার অঙ্গীকার করেন জঙ্গিকে সহযোগিতার। শিরকুহ এ মর্মে শান্তিচুক্তি সম্পন্ন করে সিরিয়ায় ফিরে আসেন। কিন্তু ক্রুসেডাররা পরে মিসর ছাড়লো না। শাওয়ার তাদের সহযোগিতা ছাড়লো না। দখল করে নিলো কায়রো ও অন্যান্য শহর। অত্যাচার-অনাচারে মিসরকে দুর্বিষহ করে ছাড়লো। সুলতানের অনুরোধে আবার মিসর গেলেন শিরকুহ। পালালো বর্বররা। নিহত হলো শাওয়ার।

খলীফা আল আজিজ তাকে বানালেন প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান সেনাপতি। দুই মাস পরে শিরকুহ ইন্তেকাল করলে তারই ভাতিজা মহান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী আসীন হন তার পদে। ধারণ করেন আল মালিক উন নাসির উপাধি। ১১৭১ সালে শেষ ফাতেমী খলীফার মৃত্যু হলে বাগদাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় মিসরে। নূর উদ্দীন জঙ্গির সহকারী হিসেবে মিসর শাসন করেন আইয়ূবী।

১১৭৪ সাথে ইন্তেকাল হয় মহান জঙ্গির।আইয়ূবী তখন মিসর হিজাজ ও ইয়ামানের শাসক। নূরুদ্দীন রেখে যান ১১ বছরের এক সন্তান– মালিকুস সালেহ। তাকেই বানানো হয় পরবর্তি আতাবেক। কিশোর রাজাকে নিয়ে ক্রুসেডাররা একের পর এক ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছিলো। তারাই হয়ে যায় তার অভিভাবক। ১১৮২ সালে মালিক সালেহর মৃত্যু হয়। পশ্চিম এশিয়ার সকল রাষ্ট্রপ্রধান সালাহুদ্দীনের আধিপত্য মেনে নেন। তিনি যে কোন প্রয়োজনে তাদেরকে ডেকে পাঠাবার অধিকার লাভ করেন।

জেরুসালেম ছিলো ইউরোপের সকল জনস্রোতের মোহনা। নাইটরা আসছিলো বীরত্ব দেখাবার জন্যে। অভিযাত্রীরা আসছিলো ঐশ্বর্যের জন্য। দাগী আসামীরা আসছিলো অপরাধের দণ্ড থেকে রেহাই পাবার জন্যে। পোপের ভক্তরা আসছিলো পোপের দেয়া মুক্তির নিশ্চয়তা লাভের জন্য। লুটের অভিলাসীরা আসছিলো সমৃদ্ধ জনপদসমূহে 'বৈধ' লুটতরাজের জন্যে।

জেরুসালেমের রাজা আমির তার চতুর্থপুত্র বল্ডউইনকে রাজা বানিয়ে মারা গেলেন। বল্ডউইনের হয়ে গেলো দূরারোগ্য অসুখ। তিনি হলেন ঘৃণার পাত্র। রাজকার্যের অনুপযুক্ত। তার বোন ছিলেন সাইবিলা- মার্কুইসের স্ত্রী। তাদের এক পুত্র ছিলো বল্ডউইন নামে। রাজা বল্ডউইন বাধ্য হয়ে তার ভাগ্নে বল্ডউইনের হাতে রাজত্ব তুলে দেন। কিন্তু সাইবেলা নিজের পুত্র বল্ডউইনকে নির্মমভাবে খুন করিয়ে জেরুসালেমের রাণী হন। গাই দ্যা লুসিগনানের সাথে তার ছিলো গোপন প্রেম। এবার লুসিগনানকে প্রকাশ্যে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে তার মাথায় পরান রাজমুকুট। ১১৮৭ সালে তারা হন জেরুসালেমের রাজা-রাণী। বল্ডইউনের সময় মহান সালাহুদ্দীনের সাথে ক্রুসেডাররা শান্তিচুক্তি করেছিলো। কিন্তু ১১৮৬ সালে রেনল্ডের হিংস্র বাহিনী মুসলমানদের কাফেলা লুট করে ও গণহত্যা চালায়। সালাহুদ্দীন জেরুসালেমের রাজার কাছে চান এর ক্ষতিপূরণ। রাজা তা প্রত্যাখ্যান করেন। দস্যুদের শাস্তি দানের জন্যে আইয়ুবী কারাক অবরোধ করেন। নিজপুত্র মালিক উল আফজালের বাহিনীকে প্রেরণ করেন গ্যালিলি উপসাগরের দিকে।

ক্রুসেডারদের মধ্যে ভয়ানক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লো। তারা সমবেত হলো সফোরা ও সেফোরিস প্রান্তরে। সেখান থেকে সুলতান তাদেরকে তাড়িয়ে দেন হিত্তিন পর্বতের দিকে। যেখানে পাথর ও বৃক্ষের আড়ালে মোতায়েন ছিলো সুলতানের সৈন্যদল।

১১৮৭ এর তিন জুলাই, শুক্রবার ভোর। লুসিগনানের রাজ্যে চরম আঘাত হানেন সুলতান। চতুর্দিক থেকে চলছিলো ঝড়ো আক্রমণ। ভুলুণ্ঠিত হলো দশ হাজার ক্রুসেডার। তাদের প্রধান নেতাদের কেউ হয় নিহত, কেউ বন্দি। বন্দি হন লুসিগনান, কাউন্ট হিউজ সহ অনেকেই। ধরা পড়ে সেই হিংস্র রেনল্ড। পালাতে সক্ষম হন ক্রিপোলির রেমন্ড, সিডনের রেনড, আইবেলিনের বালিয়ান সহ কিছু নেতা।

লুসিগনানের সাথে করা হয় সদয় আচরণ। গণহত্যায় জড়িতদের দেয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। তারপর সুলতান এগিয়ে যান হিত্তিনের দিকে। তার অধিকারে আসে টাইবেরিয়াড, টলেমাইস, নাবলুস, জোরকু, রামলা, সিজারিয়া ইত্যাদি। কোথাও কোনো নারীকে অপমান করা হয়নি। শিশুকে হত্যা করা হয়নি। নেয়া হয়নি প্রতিশোধ। ত্রিপলির রাজা রেমন্ডের স্ত্রী সুলতানের হাত পতিত হন। তাকে সর্বোচ্চ সম্মানসহ স্বামীর কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

এবার সামনে জেরুসালেম। মুসলমানদের শত শত বছরের ঐতিহ্য মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এখানে। তার প্রতিটি ধুলিকণা বর্বরতায় লাঞ্ছিত।

সভ্যতা ও মানবতার প্রহরীদের উপর পরিচালিত ধ্বংযজ্ঞে হতমান। পাপে, অনাচারে, পাশবাচারে দলিত-মথিত। সুলতান নগরী অবরোধ করলেন। ষাট হাজারের অধিক ক্রুসেডার এখানে। তাদেরকে তিনি বললেন– "দুর্গ ছেড়ে দাও। পবিত্র এ শহরে রক্ত ঝরাতে চাই না। অস্ত্র ত্যাগে তোমাদের কল্যাণ। কোষাগারের একাংশ তোমাদের দেয়া হবে। যত জমি আবাদ করতে পারো, সব তোমাদের দেবো।" তারা রাজী হলো না। অবরোধ শক্ত হলো। এক সময় যখন পরাজয় ছাড়া রেহাই নেই, তখনই ক্রুসেডাররা দয়াভিক্ষা চাইলো।

এরা সেই সব হানাদার, যারা পররাজ্য গ্রাসের জন্যে সমুদ্রের ওপার থেকে ধেয়ে এসেছিলো। এরা সেই সব ঘাতক, যারা লক্ষ লক্ষ নিরাপদ মানুষকে হত্যার উৎসবে মেতে উঠেছিলো। এরা সেইসব বর্বর, যারা প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে নগরী হাতে নিয়ে একে বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিলো। পবিত্র শহরের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছিলো। মানবতার বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অপরাধ করেছিলো। শত শত বছরের জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সুশীল অর্জনকে ধ্বংস করেছিলো।

ওরা এখন ক্ষমা চায়। মহানুভব সুলতান তাদেরকে ক্ষমা করলেন। যারা সুলতানের রাজ্যে থাকতে চায়, তাদেরকে সম্মানের সাথে থাকতে দেয়া হলো। যারা তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলো, তাদেরকে নিজের সৈন্য দ্বারা নিরাপত্তা দিয়ে স্ত্রী, শিশু ও ধনমালসহ খ্রিস্টরাজ্যে ফিরিয়ে দেয়া হলো। বন্দিদের জন্য ধার্য করা হলো নামমাত্র মুক্তিপণ। পুরুষ দশ দিনার, নারী পাঁচ দিনার আর শিশু এক দিনার। দশ হাজার খ্রিস্টানের মুক্তিপণ সুলতান নিজেই পরিশোধ করলেন। তার ভাই সাইফ উদ্দীন পরিশোধ করলেন সাত হাজার জনের মুক্তিপণ। সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি পায় হাজার হাজার খ্রিস্টান। ধর্মযাজক, দরিদ্র, বৃদ্ধ ও দুর্বলদেরকে অর্থ সাহায্য করা হয়। জেরুসালেমের রাণী সাইবিলা যখন নগরী থেকে বিদায় নিচ্ছিলেন, সুলতান তখন তার দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। কথা বলেন খুবই কোমলভাবে।

এইসব খ্রিস্টান যখন জেরুসালেম ছেড়ে খ্রিস্টান শাসিত এন্টিয়কে প্রবেশ করে, রাজা বহেমন্ড তাদেরকে নিজের রাজ্যে জায়গা দিতে অস্বীকার করেন। কেড়ে নেন তাদের সর্বস্ব। ফলে তারা আবার প্রবেশ করে সুলতানের রাজ্যে। অভ্যর্থিত হয় সাদরে।

সুলতানের এই উদারতা তার জন্যে কাল হয় দাঁড়ায়। বর্বররা টায়ার নগরে সমবেত হয়। সুচতুর কনরাড সেখানে সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র রচনা করলো। সুলতান তাদের প্রতি নগর সমর্পণের পরওয়ানা জারি করলেন। তারা

ধৃষ্টতার সাথে প্রত্যাখ্যান করলো। বন্দি রাজা লুসিগনান ইউরোপে পাড়ি দেবেন বলে শপথ করলে তাকে মুক্তি দেয়া হয়।

কিন্তু মুক্তি পেয়েই তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলেন। চতুর্দিকে ছড়ানো-ছিটানো সৈন্যদের সমবেত করলেন। আশ্রয়প্রাপ্ত ক্রুসেডাররা জড়ো হলো। গঠিত হলো বিশাল বাহিনী। সুলতানের উদারতা থেকে জীবন সংগ্রহ করলো হিংস্র ক্রুসেড। জেরুসালেমের ক্ষমাপ্রাপ্ত কিছু যাজক ইউরোপে গেলো। সাথে করে নিয়ে গেলো যিশু খ্রিস্টের একটি প্রতিচিত্র। যাতে আছে আঘাতের চিহ্ন। এক যাজক সেটা প্রদর্শন করতেন সর্বত্র। ইউরোপে তৈরী হলো বিভিন্ন উদ্ভট কাহিনী। জেরুসালেমে দখলাবসান উত্তেজনার আগুন সরবরাহ করলো। আরেকটি আগ্রাসনের জন্য জনসাধারণকে প্ররোচিত করতে সকল উদ্যোগ গ্রহণ করা হলো। খ্রিস্টান জগতের তিন রাষ্ট্রনায়ক-জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিখ বারবারানুসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ আগাস্টাস ও ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড কোর দ্যা লায়ন বেরিয়ে পড়েন ক্রুসেডে।

২৯ আগষ্ট ১১৮৯ সালে ক্রুসেডাররা একর অবরোধ করে দখল করলো। আইয়ুবী তাদেরকে পাল্টা হামলা করেন ১১৮৯ এর ১৪ ডিসেম্বর। শহরটি পুনরায় অধিকার করেন ১১৯০ এর মার্চে। কিন্তু ইউরোপের সম্মিলিত শক্তি শহরটির উপর আবার আঘাত হানে। দু'বছর চলতে থাকে যুদ্ধ। একরের যোদ্ধারা কোনো সাহায্য পাচ্ছিলো না বাইরে থেকে। তাদের উপর চড়াও হয় ভীষণ দুর্ভিক্ষ। অবশেষে ক্রুসেডাররা তাদের জীবনহানি করবে না এবং ক্রুসেডারদের তারা দেবেন দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা- এই শর্তে নগরটি আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু মুদ্রা দিতে কিছু দেরি হওয়ায় ইংল্যান্ডের "সিংহ-হৃদয়" রিচার্ড নির্দয়ভাবে হত্যা করেন অধিবাসীদের। ষাট হাজার বেসামরিক মানুষকে মেরে ফেলেন ঠাণ্ডা মাথায়। ক্রুসেডাররা এরপর ভোগের আনন্দে গা ভাসায়। মিখদের ভাষায়– "শান্তির স্বাদ, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য, সাইপ্রাসের মদ আর কাছের দ্বীপপুঞ্জ থেকে ধরে আনা নারীদের নিযে তারা অভিযানের উদ্দেশ্য ভুলে যায়।" দীর্ঘ বিশ্রাম ও ভোগান্ধতার পর তারা যাত্রা করে আসকালানের দিকে। পথিমধ্যে সুলতানের সাথে হয় এগারোটি যুদ্ধ। রিচার্ড হয়ে পড়েন ক্লান্ত। আইয়ূবীর ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ। তিনি চাইলেন সন্ধি। নিজের বোনকে বিয়ে দিলেন সুলতানের ভাইয়ের কাছে। ১১৯২ এর ২ সেপ্টেম্বর মুসলিম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে সংগঠিত হয় শান্তিচুক্তি। অবসান হয় তৃতীয় ক্রুসেডের।

১১৯৩ এর ৪ মার্চ ইন্তেকাল হয় মহান আইয়ূবীর। তার ইন্তেকালের দু'বছর পরে তৃতীয় সেলেস্টাইনের উস্কানীতে ইউরোপ বেরিয়ে পড়ে চতুর্থ ক্রুসেডে। আইয়ূবীর বীর পুত্র মালিক আল আদীলের প্রতিরোধে চরম ব্যর্থতা নিয়ে তারা

ঘরে ফেরে। এর তিন বছর পর তৃতীয় ইনোসেন্ট অর্থ সংগ্রহ, বিলাসিতা ও কামনা চরিতার্থ করার জন্যে আরেকটি ধর্মযুদ্ধের ডাক দেন। শুরু হয় পঞ্চম ক্রুসেডের। এ বাহিনী আক্রমণ করে কনস্টান্টিনোপল। জ্বালিয়ে দেয় নগরীর এক চতুর্থাংশ। খ্রিস্টান নগরীটিকে তারা ভস্ম করতে থাকে আট দিন ধরে। অত্যাচার ও লুণ্ঠনের সবচে' শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে।

১২১৬-১৭ সালে ষষ্ট ক্রুসেড দু'লক্ষ পঞ্চাশ হাজার লোক নিয়ে হামলে পড়ে মুসলিম বিশ্বে। শুধু দিমইয়াত নগরীতে হত্যা করে ৬৭ হাজার নর-নারী। ১২২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর প্রবল মার খেয়ে মুসলিমদের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে তারা দিমইয়াত ত্যাগ করে। ১২২৯ খ্রিস্টাব্দে সপ্তম ক্রুসেডে বের হন জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক। সুলতান আল কামিল ফ্রেডরিকের সাথে শান্তি চুক্তি করলেন। চুক্তির ভিত্তিতে জেরুসালেম গেলো খ্রিস্টানদের হাতে। শান্তিপূর্ণ এ সমাধানে ইউরোপ খুশি হলো না। ১২৪৫ সালে ফ্রান্সের নবম লুইস অষ্টম ক্রুসেড শুরু করলেন। দিময়াত দখল করে মসজিদগুলোকে গীর্জা বানালেন। সব ধরনের বর্বরতার দরজা খুঁজে দেয়া হলো। ব্যারনরা ভোগের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হলো। সাধারণরা মগ্ন হলো জঘন্য পাপকর্মে। স্যার সৈয়দ আমীর আলী মিখদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেন– "ক্রুসেড যোদ্ধারা যিশু খ্রিস্টের পতাকার ছায়াতলে সমবেত হয়ে সকল রকম লাম্পট্য ও অমিতাচারে নিমগ্ন হলো। সবশ্রেণীর লোকের মধ্যেই জঘন্যতম পাপের সংক্রমণ পরিব্যাপ্ত হলো।"

দিময়াত পরিণত হয় ডাকাত, খুনি ও ধর্ষকদের হিংস্র অরণ্যে। জয়েনের উদ্ধৃতিতে আমীর আলী জানান– "বিবাহিতা ও কুমারী মেয়েদের উপর সাধারণ সৈনিকরা করে ঘৃণ্য অত্যাচার।"

ইবনুল আসীর জানান– শুধু দিময়াত নয়, সর্বত্রই ক্রুসেডারা ছিলো একই মাত্রায় বর্বর। তাদের পাশবিকতায় পশুও লজ্জিত হতো। ভূপৃষ্ঠ কেঁপে উঠতো। মানুষ ও মানবতার বিরুদ্ধে এমন কোনো অনাচার নেই, যা তারা করেনি।

নবম ক্রুসেড পরিচালিত হয় ১২৭০ সালে। পাশবিকতার দিক দিয়ে যা সাবেক ক্রুসেডগুলোকে ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু পরিণতির দিক দিয়ে হয় প্রচণ্ডভাবে ব্যর্থ।

কিন্তু এরপর কি ক্রুসেড থামলো? বহু ঐতিহাসিক এরপর ক্রুসেডের সমাপ্তি দেখান। আর কোন অভিযান চোখে পড়ে না বলে। কিন্তু আসলেই কি কোন অভিযান চোখে পড়ে না?

"এ ধর্ম তো সব সেকেলে ও বর্বর ধারণাকে স্থান দিয়েছে। মুহাম্মদ (স.) নিজেও দেখেছেন যে, ধর্ম হিসেবে ওগুলো একেবারেই অযোগ্য।"

–উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথ

আরেক অভিযান

খ্রিস্টান ইউরোপ একদিকে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডে লড়ছিলো, অপরদিকে ইসলামের আলোর ঝলকানিতে তাদের দৃষ্টি যাচ্ছিলো ধাঁধিয়ে। তারা দেখছিলো এক আলোকময় সভ্যতা, যার প্রতিটি স্তরে ঔজ্জ্বল্য আর ঐশ্বর্য। তারা দেখছিলো এক সুগভীর জীবনদর্শন, যার প্রতিটি ধাপে আছে সুমিত সমন্বয়। তারা দেখছিলো প্রজ্ঞা ও মাহাত্মের এমন এক সাম্রাজ্য, যার মোকাবেলা করতে পারছে না তাদের তরবারি।

ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা যতো করা যায়, সবই তারা করলো। কিন্তু তারপরও মুসলমানদের প্রাণশক্তিকে পারলো না জখম করতে। পারতে দিলো না ইসলামী জীবনদর্শন। ধন-সম্পদ যত লুটা যায়, তারা লুটলো। তারপরও মুসলিম জীবন বিধ্বস্ত না হবার মূলে আছে তাদের জ্ঞান ও সংস্কৃতি। সামাজিক বিপর্যয় যতটা

সৃষ্টি করা যায়, সবই তারা করলো। তারপরও ইসলামী সভ্যতা আপন মহিমায় আলো ছড়াতে পারছে সুদৃঢ় আকিদা ও সুষম জীবনবোধের কারণে। শত শত বছরের অব্যাহত যুদ্ধ, প্রবল আঘাত ও বিধ্বংসী তাণ্ডব এই সভ্যতাকে পারলো না হীনবীর্য করতে। পারলো না বিকলাঙ্গ করতে। সামরিক শক্তি দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলিমকে তারা হত্যা করতে পেরেছে, হাজার হাজার জনপদ বিধ্বস্ত করতে পেরেছে, শত শত সমৃদ্ধ শহর উজাড় করতে পেরেছে। কিন্তু পারেনি ইসলামকে হারাতে। ফলে ইসলামের প্রেরণায় অচিন্তনীয় শক্তি নিয়ে মুসলমানরা বারবার জেগে উঠেছে ধ্বংসস্তুপ থেকে। তাদের উত্থান ঘটেছে ফিনিক্স পাখির মতো। জাগরণ ঘটেছে তুলনাহীন প্রাণবন্যায়।

অতএব ইসলামকে হারাতে না পারলে মুসলমানদের হারানো অসম্ভব। কিন্তু ইসলামকে হারানো সম্ভব নয়, যতক্ষণ সে তার মৌলিকত্বে টিকে থাকবে। যতক্ষণ সে তার ওহীভিত্তিক নির্ভেজাল সত্তায় বেঁচে থাকবে। যতক্ষণ তার নিখুঁত কাঠামো বিধ্বস্ত না হবে। হিংসামত্ত পাদ্রীরা ছিলো বড্ড জেদী। তাদের জেদ গোটা ইউরোপকে টেনে নিয়েছিলো মারা ও মরার এমন এক যুদ্ধে, যার কোনো শেষ ছিলো না। সেই জেদ ও প্রতিহিংসা নিয়েই তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো আরেকটি যুদ্ধে। আগের যুদ্ধের সাথে যার প্রকৃতি ভিন্ন। কিন্তু লক্ষ্য একই। স্বরূপ ভিন্ন; কিন্তু গন্তব্য একই। আগের যুদ্ধে ছিলো উন্মাদ বর্বরতা। এ যুদ্ধে আছে চিন্তার উর্বরতা। আগের যুদ্ধে ছিলো উলঙ্গ প্রলয়। এ যুদ্ধে আছে কৌশলী তাল-লয়।

ক্রুসেডারদের অনেকেই বহুমুখী যুদ্ধের প্রয়োজনে কুরআন-হাদীস জানার চেষ্টা করতেন। তাদের নেতা বোহেমন্ড, বল্ডউইন, গডফ্রে, টানক্রেড প্রমুখ আরবী ভাষা ও সংস্কৃতিকে জানার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন। সিরিয়া ও ফিলিস্তিনে তারা তিনটি ছোট ছোট খ্রিস্ট্রিয় রাজ্য কায়েম করেন। প্রতীচ্যের খ্রিস্টানরা স্থানীয় আরবদের সাথে মিশতে পেরেছিলো। আরবদের চেয়ে তারা নিজেদেরকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। যদিও জ্ঞান ও আচরণে তারা ছিলো খুবই নিম্নমানের। দখলিকৃত রাজ্যের মুসলমানদের তারা দাসের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিতো না। তাদের ধারণা ছিলো মুসলমানরা ধর্মহীন। প্রথম সাক্ষাতেই সে ভুল খান খান হয়ে যায়। তাদের ধারণা ছিলো মুসলমানরা দস্যু ছাড়া কিছুই নয়। কিছু দিনের মধ্যে তা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। তাদের ধারণা ছিলো, মুসলমানরা খ্রিস্টানদের অস্তিত্বের দুশমন, কিছু দিন যেতে না যেতেই তারা দেখলো মুসলমানরা কল্পনার চেয়েও উদার। মুসলিম সভ্যতার মহান বৈশিষ্টের ভেতর তারা নতুন এক জীবন প্রত্যক্ষ করতে লাগলো। শিক্ষা ও মহত্ব বঞ্চিত তাদের

জীবন উন্নত সভ্যতার মধ্যে নবজন্ম লাভ করলো। মুসলিম প্রাচ্য প্রত্যক্ষভাবে তাদের জীবনে প্রবেশ করলো এবং জীবনকে ঢেলে সাজালো।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে এদের কোনো পরিচয় ছিলো না। হাসপাতাল তারা জীবনেও দেখেনি। গোসলখানা কী তারা জানতো না। সুগন্ধির ব্যবহার ছিলো তাদের অজানা। এ সবের সাথে ওরা পরিচিত হলো। জীবনে প্রথমবার তারা দেখলো তৈল ও আতর। খবর আদান-প্রদানে কবুতরের ব্যবহার তারা জানতো না। অনুষ্ঠানে আলোকসজ্জা তাদের কাছে ছিলো অভাবনীয়। কম্পাসের অস্তিত্ব ছিলো তাদের অজানা। বারুদের ব্যবহার পদ্ধতি ছিলো তাদের চিন্তার বাইরে। কামানের দ্বারা যুদ্ধ! এ ছিলো এক বিস্ময়। মুসলমানদের থেকে তারা এসব শিখে নিলো। শিখলো লবন ও গোলমরিচের ব্যবহার। শরবত, গোলাপজল, মিসরি, মিষ্টি ইত্যাদির ব্যবহার। চিনি নামক দ্রব্য তারা প্রথম দেখলো প্রাচ্যে। ইউরোপে কোন কিছুকে সুমিষ্ট করার জন্যে মধু ব্যবহার করা হতো। আখ যে খাওয়া যায়, আদাও যে ব্যবহারযোগ্য, এসব তারা আরবদের থেকে শিখে। খাদ্যে পেয়াজের ব্যবহার জানতো না ওরা। লেবুর স্বাদ আস্বাদন শিখলো আরবে এসে।

প্রাণী হত্যা করে আগুনে পুড়িয়ে বা মাটির তলে পঁচিয়ে মাংস ভক্ষণে অভ্যস্থ ছিলো ওরা। মশলার ব্যবহারের কথা ভাবতেও পারতো না। এখন তারা শিখলো সভ্য ও রুচিশীল খাদ্যপ্রক্রিয়া। আরবরা তাদের শেখালেন আখরোট, তিল, তরমুজ ইত্যাদির ব্যবহার। কোনো রকম শরীর ঢাকতে পারলেই যারা খুশি ছিলো, তারা পরিচিত হলো মসলিন, দেমাস্ক, আতলাস, সাটিন ইত্যাদি মিহি কাপড়ের সাথে।

চতুর লেখক ফিলিপ কে হিট্রি ঐতিহাসিক এসব সত্য শুধু আলতো করে ছুঁয়ে গেছেন, উন্মোচিত করেননি। দায়সারা গোছের বক্তব্য দিয়েছেন। কিন্তু রবার্ট ব্রীফল্ট, সৈয়দ আমির আলী প্রমুখের কলমে এ সত্য স্পষ্টতা পেয়েছে। তবে হিট্রি যাতে সত্য থেকে ছিটকে না পড়েন, সে জন্যে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে বাধ্য হয়েছেন– "ক্রুসেডারদের সাংস্কৃতিক দিক আক্রান্ত মুসলমানদের সাংস্কৃতিক মানের চেয়ে অনেক নিঁচু ছিলো।"

"প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্য জগতই এই ক্রুসেড থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে।"

রবার্ট ব্রীফল্ট তার "দি ম্যাকিং অব হিউম্যানিটিতে লিখেন– "ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশের এমন কোনো স্তর নেই, যাতে আরবদের প্রভাব অনুপস্থিত।"

এই 'উপকারের' পরিমাণ কতো ব্যাপক এবং 'প্রভাবের' মাত্রা কতো গভীর, তার আন্দাজ পেতে সাহিত্যকে নমুনা হিসেবে হাজির করতে পারি। মুসলিমদের সংস্পর্শের ফলে শিল্প-সাহিত্যের যে কুঁড়ি তাদের মধ্যে জাগলো, সেটাই পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মহীরুহ হয়েছে। ধরা যাক ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় ইংল্যান্ডের কথা। চর্তুদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত তাদের প্রতিভার খাতাটি ছিলো একেবারেই সাদা।

১৩৩০ সাল থেকে ১৪০০ সাল কবি ল্যাঙ্গল্যান্ডের জীবন–কাল।

মহাকবি চসার তার সমসমায়িক ।১৩৪০ থেকে ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যকে যিনি কাব্যরসের দ্বারা জীবনীশক্তি দেন।

১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬১৬ পর্যন্ত মহাকবি, নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপীয়ার তার প্রতিভার প্লাবনে ইউরোপকে বিধৌত করেন।

এরপরেই ব্রিটেনের ইতিহাসে ১৬০৮ থেকে ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দ- কবি মিল্টনের যুগ।

১৭৭০ থেকে ১৮৫০ সাল কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থের জীবনকাল।

কবি শেলির জন্ম হয় ১৭৯২ সালে।

লর্ড বায়রন জন্মগ্রহণ করেন ১৭৮৮ সালে।

এদের কাব্যশক্তি ইংরেজি ভাষাকে নিয়ে গেলো শ্রেষ্ঠত্বের আসনে। আধুনিক সভ্যতার নবদিগন্ত খুলে দিলো। এরা বরিত হলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য প্রতিভা হিসেবে।

ইউরোপিয়ান লেখক দার্শনিক টমাস ম্যুরের কথা বলা যায়। কার্ল মার্কস তার দাস ক্যাপিটালিজমে ম্যুরের উল্লেখ করেছেন বারবার। ব্রিটেনের বর্বর শাসকদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আগ্নেয় তরবারি যেনো তার ইউটোপিয়া। তার জন্ম ১৪৭৮ সালে। দুনিয়ার দর্শনের ইতিহাসে ম্যুর এক স্বতন্ত্র অধ্যায়।

ইতিহাসে কার্লাইল হচ্ছেন এক মহাজন। ১৭৯৫ সালে তার জন্ম।

ঐতিহাসিক গীবনের জন্ম ১৭৩৭ সালে।

ঐতিহাসিক ম্যাকলের অভ্যুদয় ১৮০০ সালে।

বিশ্ব সভ্যতায় এদের প্রত্যেকেই শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছেন। গোটা দুনিয়া তাদেরকে এক নামেই চিনে। এদের পথ ধরেই অসংখ্য কবি-সাহিত্যিক-দার্শনিক প্লাবিত করেছেন ব্রিটেনকে।

দেখার বিষয় হলো– এই সব প্রতিভার উন্মেষ চতুর্দশ শতকের আগে নয়, পরে। ক্রুসেডের শেষে। এ সময়েই ব্রিটেনে প্রতিভার উত্থানের মৌসুম শুরু

হলো। এর আগে, সপ্তম থেকে ত্রয়োদশ শতক থাকলো প্রতিভাশূন্য মরুভূমি। কিন্তু কেন? তখন ব্রিটেনে কি শেক্সপীয়রের মত সাদা চামড়ার মানুষ ছিলেন না নিশ্চয় ছিলেন। সাদা চামড়ার মানুষ থাকলেও শিক্ষা-সভ্যতার পরিবেশ তখন ছিলো না। যা ছিলো, তা হলো অজ্ঞানতা ও অত্যাচারের আঁধার। ঘোর বর্বরতা। মুসলিম জাহানে শিক্ষা-সভ্যতা, সাহিত্য-সংস্কৃতির সংশ্রব পেয়ে পশ্চিমারা দেশে ফিরে গিয়ে ধীরে ধীরে জ্ঞান ও সভ্যতার নতুন পরিবেশ কায়েম করেন। এক শতাব্দীর ভেতরেই তারা হাতে নাতে এর ফলাফল পেতে শুরু করে।

ঐতিহাসিক এসব বাস্তবতা থেকে মুসলিম প্রাচ্য প্রতীচ্যকে নিজের ঋণজালে আবদ্ধ এবং তাদের সমৃদ্ধিকে নিজেদের অনুদান হিসেবে দেখতে ও দেখাতে পারতো। ইউরোপ প্রাচ্যকে নিয়ে প্রাচ্যবিদ্যা প্রবর্তনের আগেই ইউরোপকে নিয়ে প্রতীচ্যবিদ্যা প্রবর্তনের বিপুল উপকরণ ও অনিবার্যতা মুসলিম প্রাচ্যের হাতে ছিলো। কারণ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি ইতিবাচক দিক তাদের হাত হয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধকার সীমানায় প্রবেশ করেছে।

প্রতীচ্যের 'ইতিবাচক' কোন 'অর্জনটি' আরবদের থেকে গৃহিত নয়? মুসলিম জাহানে এসে ইউরোপীয়রা নিজেদের পোশাক ত্যাগ করে স্থানীয়দের আরামদায়ক পোশাক গ্রহণ করলো। নিজেদের দেহাবয়বে পরিবর্তন আনলো। রুচিসম্মত ও পুষ্টিকর খাদ্যের পরিচিতি অর্জন করলো। নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরীতে ইউরোপীয় রীতির পরিবর্তে আরব রীতি গ্রহণ করলো। ইউরোপে এরা মেঝেতে পাতা বিছিয়ে ঘুমাতো। অনেকেই মুসলমানদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে নিলো। নিজেদের ভাষার পরিবর্তে আরবী ভাষায় কথা বলতো।

ধীরে ধীরে তারা নিজেদেরকে পাল্টে নিলো। একাদশ ও দ্বাদশ শতকে ইসলামের উপর হামলে পড়া বহিরাগত দু'টি শক্তি মুসলিম জাহানের বিপুল ও গভীর বিনাশ সাধন করলেও নিজেরা ইসলামী সভ্যতার স্পর্শে বর্বরতা থেকে উত্তরণ লাভ করে। এরা হচ্ছে ক্রুসেডার ও তাতার। তাতারেরা ইসলামী সভ্যতার কাছে আত্মসমর্পণ করে নিজেরা আলোকপ্রাপ্ত হয়। ক্রুসেডারদের একটি অংশ মুসলমান হলেও মূল ও প্রধান অংশটি ইসলাম থেকে সভ্যতার যাবতীয় উপাদন আহরণ করেছে। কিন্তু জিইয়ে রেখেছে ইসলাম বিদ্বেষ। ঈমান ছাড়া ইসলামের সবকিছুই তারা গ্রহণ করেছে। নিজেরা শক্তিমান ও সম্ভ্রান্ত হয়েছে। সেই শক্তি ও শৌর্যকে কাজে লাগিয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে পূর্ণমাত্রায়।

তারা ইসলাম শিখতে শুরু করলো ইসলামের বিরোধিতার জন্যে। আরবী ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করলো অনেকেই। আরবীতে অনর্গল কথা বলতে পারতো

চরম ইসলাম বিদ্বেষী ক্রুসেডার নেতা রেজিন্যাল্ড। সে ইসলামের প্রতিটি দিককে বিকৃতি সহকারে ব্যাখ্যা করতো। ক্রুসেডের পাশাপাশি তাদের মধ্যে জারি ছিলো ইসলাম চর্চার নামে ইসলামের প্রাণশক্তি হত্যার ধারাবাহিকতা।

১১৪১ ও ৪৩ সালে সেন্ট পিটার ও রবার্ট অব কেটন ল্যাতিন ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। চূড়ান্ত বিদ্বেষের নজির সেই অনুবাদের পাতায় পাতায়। এ সময়েই ফ্যাজ এল ল্যাতিন ভাষায় আরবী গ্রন্থাবলির অনুবাদে এগিয়ে আসেন।ইসলামী গ্রন্থাবলীর ল্যাতিন অনুবাদে গঠিত হয় একটি পরিষদ। এর পরিচালক ছিলেন জিরার্ড। যিনি সতেরো বছরে ৯২টি আরবী গ্রন্থের অনুবাদ করেন। তাকে ইউরোপে আরব সভ্যতার পিতা বলা হয়। রেমন্ড একটি কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন। এতে আরবী ভাষা ও সংস্কৃতির পাশাপাশি ইমাম রাযী, আবুল কাসেম যুহরাবী, আবু রুশদ ও ইবনে সিনার গ্রন্থাবলি পড়ানো হতো। এর তত্ত্বাবধানে সবচে' সক্রিয় ছিলেন জিরার্ড। জিরার্ডের পথ ধরে পরবর্তিতে এগিয়ে আসেন বার্সেলোনার মাভা মোর্ত্তন। ইতালীর লিউনার্দো। ক্যাস্টাইলের দশম আলফালনো। পোল্যান্ডের জন পেকহ্যান। ল্যাতিন লেখক জুহানেস দ্যা লুনা। স্পেনিশ লেখক ক্রিমানার। হিব্রু লেখক জ্যাকব বিল মাহির প্রমুখ। প্রবলভাবে এগিয়ে আসেন ইংরেজ পণ্ডিত ওহিলাড। তিনি ইসলামী জ্ঞানের জন্য স্পেন ও মিসর সফর করেন। আরবী ভাষা থেকে ওকলিদাসের গ্রন্থ আল আরকান ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এর আগে পাশ্চাত্য জগত এ সম্পর্কে ছিলো অজ্ঞ।। দাশনিক প্লেটোর আল আকর আরবী থেকে অনুবাদ করে তিনি নতুন চ্যানেল খুলে দেন। তিনি অনুবাদ করেন বাতলামুসের গ্রন্থাবলি। এ প্রজন্মের শক্তিশালী পুরোধা হচ্ছেন মার্ক পোলো। ১২৫৪ সনে তার জন্ম হয়। ইসলাম বিদ্বেষে ইউরোপ তখন চরম উত্তপ্ত। বিদ্বেষের সেই উত্তাপকে তিনি ইসলাম চর্চায় প্রকটিত করেন। ১৩২৪ সালে মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কুরআন-হাদীস,আরবী ভাষা-সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে তার যথেচ্ছ মতামত প্রচার করে বেড়ান। নিজস্ব পন্থায় গবেষণা চালিয়ে যান।

ইউরোপের একটি শ্রেণি তখন মরণপণ যুদ্ধ করছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে। আরেকটি বিশেষ শ্রেণি মুসলমানদের ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, দর্শন ও ভাষাচর্চায় জীবনপাত করছিলো। ক্রুসেডারদের অসির আঘাত মুসলিম জনপদ উজাড় করেছে। এদের মসির আঘাতে রক্ত ঝরেছে ইসলামী জীবনব্যবস্থার। ক্রুসেডের আগে আমরা দেখি ফরাসী পাদ্রী জ্যারার্ডি ও ল্যাক ইসলামকে জানার জন্যে স্পেনে গেলেন। আশবিলিয়া ও কর্ডোভার জামেয়াসমূহে অধ্যয়ন করলেন। শিখলেন কুরআন-হাদীস, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান। স্পেন থেকে

পাঠ গ্রহণ করে পিরিনিজ পর্বতমালার ওপারে চলে যাবার পরে তারা হলেন অবশিষ্ট ইউরোপের সবচে বড় পণ্ডিত। সবচে' বরেণ্য গুণীজন। স্পেন থেকে জ্ঞান অর্জন করে পাদ্রী স্যালভেস্টর খ্রিস্টজগতের একচ্ছত্র গুরু হয়ে যান। ৯৯৯ সালে স্যালভেস্টর দুই উপাধি নিয়ে তিনি রোমের পোপ-এর আসনে আসীন হন। ১০০৩ সাল পর্যন্ত তার নেতৃত্বে পরিচালিত হয় খিস্টানদের ধর্মীয় দুনিয়া। তিনি অনুসারীদের কাছে এমন এক 'ইসলাম' পেশ করতেন, যার সাথে ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নেই।নবম ও অষ্টম শতকে বহু পাদ্রী ভ্রমণ করেন মুসলিম দুনিয়া। গ্রহণ করেন মুসলমানদের শিষ্যত্ব। পরে, খ্রিস্টান দুনিয়ায় তাদের আধিপত্য হয় প্রতিষ্ঠিত।

তাদের প্রয়াস রোমাঞ্চকর ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিশেষ কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করেনি। তাদের ইসলামচর্চা বিশেষ দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, এর সাথে যুক্ত হয়নি কোনো প্রজন্মের আবেগ। ক্রুসেড এ ধারায় যে মাত্রা দিলো, তা এককথায় নজিরবিহীন। প্রাচ্যতত্ত্ব পণ্ডিতি অধ্যয়নের বিষয়ে পরিণত হলো। সমাজের গভীর থেকে একটি ঢেউ উত্থিত হলো। বহুমাত্রিক প্রণোদনা যুক্ত হলো এর সাথে।

উন্নত জীবনের প্রয়োজন ছিলো তাদের সামনে। প্রয়োজন ছিলো উন্নত সভ্যতা থেকে পাথেয় সংগ্রহ। জীবনের বিশালতা ও গরিমা তারা আঁচ করতে পেরেছে ইতোমধ্যে। জ্ঞান ও শিল্পের উদ্ভাস তারা দেখেছে মুসলিম জাহানে। আগে তারা নিজেদের জীবনযাপন প্রণালীকে সর্বোত্তম ও সর্বোন্নত হিসেবে ভাবতো। ইউরোপের বাইরে মানুষ বসবাস করে, এটাও অনেকেই জানতো না। এখন তারা জীবন ও জগতকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে চাইছে। শুধু ইসলামের বিকৃতি নয়; বরং নিজেদের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্যেও ইসলাম জ্ঞান-বিজ্ঞান তাদের জন্যে অপরিহার্য ছিলো।

১২৬৯ সালে সিরিয়ার বিভিন্ন গবেষণাগারের আদলে মরিসিলিয়ায় উচ্চতর এক রিসার্চ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন রাজা আলফোনোস। ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু ক্রুসেডার ও তাদের সন্তানরা এতে এসে ভিড় করে। প্রতিষ্ঠানটিকে আন্তর্জাতিক মানে দাঁড় করবার জন্যে রাজকীয় মর্যাদায় আবু ইয়াকুব রাকুতিকে এর প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। এখানে প্রধানত হিস্পানী ভাষায় কুরআন-হাদীস ও ইসলামী সংস্কৃতির পাঠ দান হতো। সাথে সাথে তালমুদ ও বাইবেলের ক্লাস নেয়া হতো। এ প্রতিষ্ঠান বিশেষ চরিত্র নিয়ে প্রতিষ্ঠা পায়। বহু বিচক্ষণ ক্রুসেডার মুসলিম সভ্যতার বাহ্যিক উন্নতি ও অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা সম্পর্কে ছিলেন খুবই আগ্রহী। যাজক ও সামন্ত রাজাদের অনেকেই এ বিষয় বুঝবার ও বিশ্লেষণ

করবার প্রয়োজন অনুভব করেন। একে ভালোভাবে না বুঝা পর্যন্ত তারা পরবর্তী যুদ্ধকৌশল ও আক্রমণের প্রক্রিয়া নিয়ে ছিলেন দ্বিধান্বিত। আলফোনোসের এ সেন্টার তাদের চাহিদাকে আরো বাস্তব করে তুললো। বহুলোক এ বিষয়ে পাণ্ডিত্য নিয়ে ছড়িয়ে পড়লো। তাদের বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা ছিলো অন্যদের তুলনায় অগ্রগামী। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিলো বিস্তৃত। ইসলামকে ক্ষতবিক্ষত করার উৎসাহে তাদের অনেকেই পূর্ববর্তিদের চেয়ে ছিলো অগ্রগামী। তাদের সঞ্চয় ছিলো জীবনের অভিনব বিদ্যুৎ।লিউনার্দো লিখেন জ্যামিতির উপর আরবী গ্রন্থের ভাষ্য। কম্বানুস নিউবি অনুবাদ করেন বহুগ্রন্থ। ফেস্তলুন বুলুনি হাসান ইবনে হাইসামের মহাকাশ বিজ্ঞান পর্যালোচনা করে তা প্রচার করেন ইউরোপ।

যাজকতন্ত্র বিজ্ঞান প্রচারকে গ্রহণ করতে না পারলেও ইসলামচর্চাকে স্বাগত জানালো। রাজারা এর পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে এলেন। ১২৫০ সালে আজনুনাশ কাশকালী ফালকিরিহ অনুবাদ করেন। সিসিলির প্রথম রজার আরবী জ্ঞান চর্চার নির্দেশ দেন তার রাজ্যের পণ্ডিতদের প্রতি। রাজা দ্বিতীয় ফেডারিখ এর উপর আরোপ করেন মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব। ইবনে রুশদের পুত্রকে নিজের রাজসভার প্রধান পণ্ডিত হিসেবে সমাসীন করেন। ফ্রেডারিখের বন্ধু ছিলেন মহাকবি দান্তে। তার সাথে তিনি আলোচনা করতেন এ্যারিস্টটলের দর্শন ইত্যাদি নিয়ে। আলোচনার সূত্র ছিলো আরবী গ্রন্থাবলি। তার কাছে থেকে দান্তে জেনে নেন হুজুর সা. এর জীবন, মে'রাজের কাহিনী, মহাকাশ সম্পর্কিত কুরআন হাদীসের বর্ণনা ইত্যাদি। এ সময়েই ল্যাতিন ভাষায় অনূদিত হয় আবুল আলা মায়াররির গোফরান, ইবনুল আরাবীর জিন বিষয়ক গ্রন্থ। দান্তের ডিভাইন কমেডিতে মে'রাজের কাহিনীর ছায়া অবলম্বিত হয়েছে আর রয়েছে এসব গ্রন্থের সুস্পষ্ট প্রভাব। প্রবল ইসলাম বিদ্বেষ একদিকে, আর অপরদিকে ইসলাম থেকে দু'হাত পেতে গ্রহণ– শুধু দান্তের নয়, তৎকালীন ইউরোপের এ হচ্ছে স্বাভাবিক বাস্তবতা।

১৩১২' সালে ভিয়েনা চার্চ কার্ডন্সিল কর্তৃক আরবী, হিব্রু, সিরিয় বিষয়ে প্যারিস, অক্সফোর্ড, বুলোগনা, এভিগন ও স্যালমঙকায় একটি করে অনুষদ চালু করা হয়। ১৩২০ সালে ফেনামি গীর্জায় গোটা ইউরোপের খ্রিস্টান কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হলো। নিজেদের মধ্যকার অসংখ্য বাদানুবাদ পেছনে রেখে বিভিন্ন খ্রিস্টানগ্রুপ প্রাচ্যচর্চা আন্দোলনে একাত্মতা ঘোষণা করলো। জাতীয় প্রয়োজনে একে গতিময় করতে সচেষ্ট হলো। সিদ্ধান্ত হলো- পশ্চিমা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে

স্বতন্ত্র আরবী অনুষদ চালু করা হবে। আরব জ্ঞান-বিজ্ঞানকে নিজেদের প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে। এ উদ্যম ব্যাপক হয় ইতালি ও ফ্রান্সে। পিটার অব ইয়র্কের শাসনামল ছিল এক্ষেত্রে আদর্শ সময়। পিটার লেখাপড়া করেন ফ্রান্সের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় স্পেন প্রত্যাগত বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে। স্পেন থেকে ডিগ্রিপ্রাপ্তরা ছিলেন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সবচে' বরেণ্য। তারাই সেখানে শিক্ষাদান করতেন। পড়ানো হতো আরবী ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলি। মোস্তফা আসসাবায়ী গুস্তাব লিভানের উদ্ধৃতি দিয়ে সেসময়ের ইউরোপীয় জ্ঞান জগতের সাধারণ বিবরণ দিচ্ছেন–

'সাধারণ আরবী গ্রন্থ, বিশেষত জ্ঞান-বিজ্ঞান সংক্রান্ত গ্রন্থাবলির উপর ইউরোপীয় বিদ্যালয়সমূহ পুরোটাই ছিলো নির্ভরশীল। মুহালিয়া নামক এক পণ্ডিত লিখেছেন– রজার বেকন, লিউনার্দো দ্যা ভিঞ্চি, নোফেল কুনি, রেমুন লোন, সানফেমা, আলবার্ট শুধু আরবী গ্রন্থাবলির উপর নির্ভর করতেন। ম্যাসিও রেনাল্ড লিখেছেন– আলবার্ট দি গ্রেট ছিলেন ইবনে সিনার কাছে বিশেষ ঋণী। সানথুম দর্শনে ছিলেন ইবনে রুশদের ভাবশিষ্য।"

অনেকেই সরাসরি আরবী ভাষায় গ্রন্থ লিখতে শুরু করেন। বোকাশিও এর মতো ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণপুরুষও এতে আত্মনিয়োগ করেন। ইউরোপের প্রধান ভাষা ছিলো ল্যাতিন।

কিন্তু নতুন প্রজন্ম এর মধ্যে তৃপ্তি পাচ্ছিলো না। আরবী শেখা ও চর্চা ছিলো উন্নত রুচি ও প্রগতির প্রয়োজনে। সেটা পরিণত হয় সাধারণ প্রবণতায়। ডক্টর মোস্তফা আসসাবায়ী ঐতিহাসিক রোজির সূত্রে পশ্চিমা লেখক আলগারোর এক পত্র উল্লেখ করেন। যাতে তিনি লিখেন- বুদ্ধিদীপ্ত ও মেধাবীদের মানসলোকে আরবী সংগীত যাদু ছড়ায়। তারা ল্যাতিন ভাষাকে দেখে তাচ্ছিল্যের চোখে। অন্য সব ভাষা ছেড়ে প্রভাবশালীদের ভাষা শিখে। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত লোকেরা এতে বিস্মিত, মর্মাহত। তারা এ জন্যে যাতনা ব্যক্ত করেছেন। তারা বলছেন– খ্রিস্টান বন্ধুরা আরবী কবিতা ও কথাশিল্পে আসক্ত। তারা অধ্যয়ন করছেন কেবল মুসলিম দার্শনিক ও ফকিহদের। তাওরাত-বাইবেলের ভাষ্যগ্রন্থ এ ধর্মের লোকেরা ছাড়া কে পড়বে? কিন্তু এখন খুব কম লোকই এসব পাঠ করে। আধুনিক যুবকদের একক পছন্দ আরবী ভাষা। আরবী সাহিত্য। তারা আলো সংগ্রহ করে আরবদের গ্রন্থ থেকে। পাঠাগার সমৃদ্ধ করে চাড়াদামে কেনা আরবী

গ্রন্থ দ্বারা। সর্বত্রই আরবী গ্রন্থাবলির প্রশংসা। খ্রিস্টীয় সাহিত্য সম্পর্কে নাক কুঁচকানো। তরুণরা বলছে- পাঠযোগ্য নয় এই সব ছাইপাশ! আফসোস! খ্রিস্টানরা ভুলে যাচ্ছে নিজেদের ভাষা। এক হাজার জনে একজনও খুঁজে পাবেন না, যে নিজের বন্ধুকে চিঠি লেখে নিজের ভাষায়। গভীর আগ্রহ ও মনোযোগে তারা ঠিকই আরবী ভাষা চর্চা করে যাচ্ছে। আরবীতে তারা এতো উন্নত কবিতা লিখছে, যা কখনো কখনো আরবদের রচিত কবিতাকেও অতিক্রম করে।"

ইউরোপীয়দের এই আরবীচর্চা সবসময় নেতিবাচক ফলাফল এনেছে, এমন নয়। ইউরোপের লাভ হয়েছে ষোলো আনা। কিন্তু ইসলামের প্রসঙ্গে তাদের অভিব্যক্তি গড়পড়তায় বিপজ্জনক থেকেছে। ইউরোপ মুসলমানদের শিক্ষক হিসেবে নিয়েছে, কিন্তু ইসলামকে দেখেছে ভয়াল আপদ হিসেবে। মুসলিম বিজ্ঞানীদের থেকে সবকিছু গ্রহণ করেছে। তবে অস্বীকার করেছে তার মুসলিম সত্তা। এমনকি তাদের থেকে গ্রহণের কথা স্বীকারও করেনি।

তারা আরবী বিজ্ঞানগ্রন্থ অনুবাদে বৈজ্ঞানিকদের নাম এমনভাবে বিকৃত করেছে, যে তা হয়ে গেছে ল্যাতিন কিংবা হিব্রু। মূল অস্তিত্বই খতম করে দেয়া হয়েছে। সাধারণত জাদরেল মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের ক্ষেত্রেই এমন ঘটেছে। যাদের কেউ কেউ দু' শত এর অধিক বিজ্ঞানগ্রন্থ লিখেছেন। তাদের নামে ধুম্রজাল সৃষ্টি করায় পরিবর্তিতে সম্পাদনার সময় ইচ্ছে করেই বইসমূহকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের নামে বেনামী করা হয়।

কতোটা অস্বীকৃতিমূলক মানসিকতা তাদের মধ্যে ছিলো, তার আন্দাজ পেতে কিছু বৈজ্ঞানিকের নাম বিকৃতির তথ্য লক্ষ্য করুন। আল বাত্তানীকে রেথেন, রোয়েথেন, আল বাতেজনিয়াস ইত্যাদি নাম দিয়েছে। ইউসুফ আল ঘুরিকে জোসেফ টি প্রিজড, আল রাজীকে রাজম, আল খাসিবকে আল বুযাথের, আল কায়াবিসকে ক্যাবিটিয়াস, খাওয়ারিজমিকে গরিটাস, গরিজম। ইবনে সিনাকে এভিনিস, ইবনুল হাইসামকে আলোজেন, মারকালীকে মারজাকেল, ইবনে আবির রিজালকে আল বোরাছেন, জাবির ইবনে হাইয়ানকে জিবার, ইবনে বাজ্জাকে এডেমগেন্স, ইবনে রুশদকে এভেরুশ, এভরুন, আল বিতরুজীকে পিট্রাজিয়ান, ইবনে তুফায়েলকে বাথর, আবুল মাশারকে, বুঝশের, আল কিন্দিকে কিন্দাস, ফারগানীকে ফাগানেস, হোসাইন ইবনে ইসহাককে জোহাস নিটিউন নামের পর্দার নিচে ঢেকে দিয়েছে।

অথচ মুসলমনারা গ্রীক বিজ্ঞানের চর্চা করেন পাঁচ শত বছর। লিখেছেন হাজার হাজার গ্রন্থ। করেছেন অনুবাদ। কিন্তু গ্রীক বৈজ্ঞানিকদের নাম এমনভাবে বিকৃত করেননি, যাতে তার গ্রীক সত্তা হারিয়ে যায়। আর্কিমিডিস, টলেমি, ইউক্লিড, এরিস্টটল, প্রমুখ বৈজ্ঞানিক- দার্শনিকের নাম অক্ষত রেখেছেন। কারণ তাদের উদ্দেশ্য চিলো নিছক জ্ঞানচর্চা। অপরদিকে ইউরোপ জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে নিজেদের কল্পিত জাতীয় শত্রুদের গুরু বলতেই রাজি ছিলো না। পাছে লোকে যদি জেনে যায় নাক উঁচু ইউরোপীয়দের জ্ঞানগুরু ছিলেন মুসলিম ব্যক্তিত্ব। যে মুসলিম কথাটাই তাদের কাছে ঘোরতর অসহনীয়!

নিউপোল্ড উইস তার ইসলাম এ্যাট দ্যা ক্রস রোড গ্রন্থে এ দিকটি স্পষ্ট করে লিখেছেন– "নিশ্চয় রেনেসা বা বিজ্ঞান ও ইউরোপীয় শিল্পের পুণর্জাগরণ ইসলাম ও আরব উৎসের কাছে ঋণী। এটি পশ্চিমা ও পূর্বের মাঝে একটি বস্তুগত সংযোগ তৈরী করেছিলো। বাস্তবিকই ইউরোপ ইসলামী বিশ্বের কাছে ব্যাপক উপকৃত হয়েছিলো। কিন্তু তারা কখনো এই উপকারের কথা স্মরণ রাখেনি। কিংবা স্বীকৃতিও দেয়নি। তারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের মাত্রা কমিয়ে কোনোরূপ কৃতজ্ঞতাও দেখায়নি। বস্তুত দিন দিন তাদের এই ঘৃণার মাত্রা গভীর ও তীব্র হয়েছে। এবং এক সময় তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তাদের মধ্যে এই ঘৃণা জনপ্রিয়তা পেয়েছে।"

পরিশীলিতভাবে ঘৃণার এই প্রচারে কে গরহাজির? এডওয়ার্ড সাঈদ অরিয়েন্টলিজমে লিখেন– "দান্তের কবিতা, পিটার ও অন্যান্য প্রাচ্যতাত্ত্বিক, গুইবার্ট অব নজেন্ট ও বেদে থেকে রজার বেকন পর্যন্ত ইসলামবিরোধী তর্কশাস্ত্রবিদ ত্রিপোলির ইউলিয়াম মাউন্ট, সিয়নের বাচার্ড, লুথার, পোয়েম ডেল চিড-এ, চ্যান্সন ডি রোঁলায় এবং শেক্সপীয়রের ওথেলো (পৃথিবীর নির্যাতক) এ প্রাচ্য ও ইসলাম উপস্থিত হয়েছে বহিরাগতরূপে, যার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে ইউরোপে।""আমি মনে করি হুগো,গ্যাটে, নেরভাল, ফ্লবার্ত, ফিটজেরান্ডের মতো লেখকদের রচনার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে এ জাতীয় প্রাচ্যতাত্তিক লেখার একটি শ্রেণী ধরে নেয়া যথার্থ।"

সাহিত্যের প্রতিটি মাধ্যমে এ প্রবণতার ছাপ রয়ে গেছে। এমন কি রোমান্টিক রচনায়ও, ভ্রমণ সাহিত্যেও। এডওয়ার্ড সাঈদের পর্যবেক্ষণ–

"রোমান্টিক ও ভ্রমণ সাহিত্যের ভূমিকা খাটো করে দেখা অন্যায় হবে। এগুলো প্রাচ্যতাত্ত্বিকদের আরোপিত বিভিন্ন ভৌগলিক, সামাজিক ও জাতিগত

বিভাজনকে আরো জোরদার করেছে। এ রকম উপেক্ষা ভুল হবে। কার
ইসলামী প্রাচ্যের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ এবং প্রাচ্যতাত্ত্বি
ডিসকোর্স গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান আছে তার। এর মধ্যে আছে গ্যাটে
হুগো, ল্যামরাটিন, শ্যাতোব্রা, কিঙ্গলেইক, নেরভাল, ফ্লবেয়ার, লেইন, কার্টন
স্কট, বায়রন, ভিনি, ডিজরেইলি, জর্জ, এলিয়ট, গোতিয়েরের কাজ। শেষ উনি
শতক ও বিশ শতকের শুরু থেকে ডাফটি ব্যারেস, লটি, টি.ই, লরেন্স
ফরস্টারের নামযুক্ত করতে পারি আমরা।"

ইসলাম প্রশ্নে ইউরোপে 'জনপ্রিয় ঘৃণার' প্রাচ্যতাত্ত্বিক ডিসকোর্স গঠনে যে
নামগুলো উল্লেখিত হলো, এরাই ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পের প্রাণ। এদেরকে
বাদ দিলে তাদের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাস একেবারে নিঃস্ব হয়ে যাবে।
আধুনিক পৃথিবীর এই সব অতি জনপ্রিয় লেখক 'ইসলাম-ঘৃণা'র ভাষ্য রচনায়
তাদের পূর্বপুরুষের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রেখেছেন মাত্র!

বিতর্কিত এই ধারাবাহিকতা সম্পর্কে ওয়েইস লিখেন- "বাস্তবতা হচ্ছে
আধুনিক যুগের প্রথম ওরিয়েন্টালিস্ট ছিলো খ্রিস্টান মিশনারী। যারা মুসলিম
দেশগুলোতে কাজ করেছিলো। তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ইসলামী শিক্ষা ও
ইতিহাসকে বিকৃত করেছিলো দক্ষতার সাথে। ইউরোপীয়দের মধ্যে
মুসলমানদের সম্পর্কে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো।
মিশনারীদের প্রভাব থেকে ওরিয়েন্টালিস্ট গবেষণা মুক্ত হয়ে গেলেও তাদের এই
বিকৃত ধারণা অব্যাহত ছিলো। যদিও ওরিয়েন্টলিস্ট গবেষণাকে যে কোন ধর্মীয়
ও অজ্ঞতার কুসংস্কার থেকে মুক্ত দাবী করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসলামের
প্রতি ওরিয়েন্টালিস্টদের বৈরিতা তাদের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সহজাত
প্রবণতারই অংশ এবং এটি উদ্ভূত হয়েছে ক্রুসেডারদের যুদ্ধের প্রভাব থেকে।"

ওয়েইস যদিও বলেছেন ক্রুসেড থেকে এর উৎপত্তি, কিন্তু আমরা দেখি
ক্রুসেডের অনেক আগেই এই প্রবণতা নানা আবয়বে প্রকাশ পাচ্ছে। ক্রুসেডের
আগেও খ্রিস্টবাদ ইসলামের উচ্ছেদ কামনা করেছে। তাকে মেনে না নেয়াকে
নিজের টিকে থাকার উপলক্ষ হিসেবে ভেবেছে। এই ভাবনাস্রোত বহমান
থেকেছে প্রজন্মে প্রজন্মে। আমরা যদি এর উৎস তালাশ করি, তাহলে যেতে হবে
হুজুর সা. এর নবুওয়তের একেবারে ঊষালগ্নে। এ বক্তব্যের সমর্থন মিলে
প্রাচ্যবিদদের দিক থেকেও। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক অলবার্ট হোরানি
তার "ইসলাম ইন ইউরোপিয়ান ট্রুথ" শীর্ষক গবেষণাপত্রে লিখেন- সূচনা
থেকেই খ্রিস্টান ইউরোপের জন্য ইসলাম এক সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়।"

বস্তুত ইহুদী ও খ্রিস্টান বিশ্বের ইসলাম বিদ্বেষ তখন থেকেই শুরু হয়। ইহুদীরা চাইতো ইসরাইল বংশে শেষ নবীর আগমন হোক। খ্রিস্টানদের কামনা ছিলো অনুরূপ। তাদের ধর্মগ্রন্থে যে পারাক্লীতস – প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমন বার্তা বারবার ধ্বনিত হয়েছে, তারা ছিলো তারই প্রতীক্ষায়। এই প্রতীক্ষা ছিলো সেন্ট বর্নাবাসের জীবনে। সেন্ট জারোমের আশ্রমে। সেন্ট ম্যাকারিয়াসের মাত্রাহীন বৈরাগ্যে। স্যান্ট স্যাবাইনাসের আত্মনিগ্রহে। সিরিয়া থেকে হেজায, সেখান থেকে কনস্টানিন্টপোল- সর্বত্রই পুরোহিতরা প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমন মুহূর্তের অপেক্ষা করছিলেন। সেই অপেক্ষার নির্দশন দেখি সালমান ফার্সীর জ্ঞান সফরে। বুহায়রা পাদ্রীর বৃত্তান্তে। সেই অপেক্ষারই সাক্ষী মদীনার ইহুদী সমাজ।

অভ্যুদয়ের পরে দেখা গেলো, শেষ নবীর আগমন তাদের প্রত্যাশা মতো হয়নি। হয়েছে ইসমাইলী বংশধারায়। ইসরাইল বংশীয়রা নবুওয়াতকে নিজেদের গোত্রীয় বিশেষত্ব মনে করতো। তাদের সেই অহং ধুলিস্যাত হয়ে গেলো। শেষ নবীর অনুসারী হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হবার আকাঙ্খা তাই লুপ্ত হলো। উল্টো বরং হিংসা চাগিয়ে উঠলো। শত্রুতার তুফান শুরু হলো।

মদীনার খ্রিস্টান পাদ্রী আবু আমের হুজুর সা. এর বিরুদ্ধে আমরণ লড়ে যাবার ঘোষণা দিলো। তার সাথে যোগসাজস ছিলো ইহুদী ও মুনাফিকদের। মদীনায় বদর-উহুদসহ বহু যুদ্ধে সে ইসলামের বিরুদ্ধে লড়ে। এক পর্যায়ে চলে যায় সিরিয়ায়। সেখানে খ্রিস্টবাদের কেন্দ্র। চিন্তা-গবেষণা ও কৃৎকৌশলের কেন্দ্র। সেখান থেকেই তৈরী হলো ইসলাম বিনাশের চালচিত্র। সেটা সরাসরি আগ্রাসন নয়, চতুর প্রক্রিয়া। ইসলামকে ধ্বংস করতে হবে ইসলামের খোলস লাগিয়ে। মদীনায় একটি ঘাটি তৈরী করা হলো। নাম দেয়া হলো মসজিদ। সেখানে হুজুর সা. কে আমন্ত্রণ জানাবার কৌশল হাতে নেয়া হলো।

প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিরোধী ধারাটির পূর্বসূরীতা সেখান থেকেই শুরু। ওদের প্রকল্পে কয়েকটি দিক ছিলো। তৎকালীন পরাশক্তি রোমানদের ইন্ধন, ইহুদীদের সংযোগ, মুসলমান নামধারী মুনাফিক এবং গোড়ায় ছিলো খ্রিস্টান পাদ্রী। ওরা মসজিদ বানালো মুনাফিকদের দিয়ে। কুরআন যাকে বলছে– আল্লাহ ও তার রাসূলের সা. সাথে যুদ্ধরতদের ষড়যন্ত্র ঘাটি।' কিন্তু ওরা দাবি করলো সেটা মুসলমানদের উপকারের জন্য। শপথ করলো– "কল্যাণ ছাড়া আমাদের কোন উদ্দেশ্য নেই।" তারা এখানে নামায পড়বে। ইসলাম চর্চা করবে। বৃদ্ধ ও অসুস্থদের জন্য মসজিদটি এনে দেবে সহজতা। দূরবর্তী মসজিদে কুবায় যাবার

ক্লেশ থেকে মুক্তি। বাহ্যিক নজরে এসব তো ভালোই। কিন্তু ভেতরে ছিলো অন্য তৎপরতা। তারা এতোই সুক্ষ্মভাবে এগুচ্ছিলো যে কুরআনের আয়াত নাযিল না হওয়া পর্যন্ত হুজুর সা. এর কাছে তাদের ষড়যন্ত্র স্পষ্ট হয়নি। হুজুর সা. একদিকে খ্রিস্ট্রিয় রোমান সাম্রাজ্যবাদের মোকাবেলা করছেন তাবুকে, ঠিক সেই সময় গোপন এই প্রকল্পের আত্মপ্রকাশ। তাবুক যুদ্ধের আগে ষড়যন্ত্রের 'মসজিদ' নির্মিত হয়, তার সমাধি রচিত হয় যুদ্ধের পর পরই। খ্রিস্টবাদ একদিকে সাময়িক আগ্রাসন নিয়ে ধেয়ে এলো। অপরদিকে ইসলামের নাম করে ইসলাম বিনাশের প্রকল্প হাতে নিলো।

নিয়মতান্ত্রিকভাবে লিখিত অবয়বে ইসলামের বিরুদ্ধে জ্ঞানতাত্তিক আক্রমণ শুরু হয় জন এফ দামেশকীর হাত দিয়ে। ৬৭৬ সালে তার মৃত্যুর পর এ ধারা বিকাশ পেতে থাকে। পরে দেড় হাজার বছরের ধারাবাহিকতায় তা বারবার রূপ বদল করেছে। একেক সময় একেক আকারে জাহির হয়েছে। আধুনিক পৃথিবীতে তা অনেকটা পরিশোধিত অবয়বে উপস্থাপিত হয়। অনেকটা জ্ঞানতাত্ত্বিক আবরণে আচ্ছাদিত হয়।

প্রাচ্যবাদের স্বরূপে সেই আবরণ আমরা দেখি। যদিও প্রাচ্যবাদ মানেই ইসলাম চর্চা নয়। আবার প্রাচ্যবিদ মানেই ইসলাম বিদ্বেষী নয়, তবে ইসলাম ও মুসলিম জাহান তার মনোযোগের মূল কেন্দ্র। বিদ্বেষ ও শত্রুতা তার প্রধান প্রবণতা।

ওদের কথা আছে, ওরা বলতে পারে না। কাউকে বলে দিতে হয়।

-ব্লাক ম্যাকডোনাল্ড

প্রাচ্যবাদ : পরিচয় ও প্রকৃতি

প্রাচ্যবাদ কী?

প্রশ্নটির জবাব জটিল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষজ্ঞরা এর জবাব দিয়েছেন। এ থেকে বেরিয়ে এসেছে বিভিন্ন দিক। ভাবধারা। কয়েকটি দিক আমরা উপস্থাপন করবো–

ঃ প্রাচ্যবাদ হলো সাধারণভাবে ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহিত একরাশ তথ্যের একটি অর্কাইভ। অর্কাইভকে গড়ে নিয়েছে একরাশ মূল্যবোধ ও একগুচ্ছ ধারণা।

ঃ প্রাচ্যবাদ হলো প্রাচ্য সম্পর্কে সেই জ্ঞান, যা প্রাচ্যের সকল কিছুকে যাচাই, পর্যবেক্ষণ, অধ্যয়ন, বিচার, শৃঙ্খলাভুক্তকরণ ও পরিচালনার জন্য শ্রেণীকক্ষ, আদালত, কারাগার বা ম্যানুয়েল স্থাপন করে।

ঃ মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞানে অমুসলিমদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হচ্ছে প্রাচ্যবাদ। প্রাচ্যবিদ মানেই ইউরোপীয়, এমন নয়। তিনি প্রাচ্যের একজন হতে পারেন। বস্তুত মুসলিম নন, কিন্তু মুসলিমদের জ্ঞানরাজ্যে কর্তৃত্ব ফলাবার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিমাত্রই প্রাচ্যবিদ।

ঃ প্রাচ্যবাদ মানে প্রাচ্য সংক্রান্ত বিদ্যা। শব্দটি ব্যাপক ও বিশেষ দুই ধরনের অর্থ দিতে পারে। ব্যাপক অর্থে নিকট প্রাচ্য-মধ্যপ্রাচ্য-দূরপ্রাচ্য তথা প্রাচ্যের যে কোন স্থান, ভাষা, সাহিত্য, ধম ও সংস্কৃতি নিয়ে পশ্চিমা গবেষণা। বিশেষ অর্থে মুসলিম প্রাচ্য ও তার ভাষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, ধর্মতত্ত, সমাজ ও সভ্যতা নিয়ে পশ্চিমাদের বিদ্যাচর্চা।

ঃ প্রাচ্যবাদ মানে আরবজগত, সভ্যতা, ভাষা ও জীবনাচার সম্পর্কে বিশ্লেষণের বিশেষ জ্ঞান। এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, একাডেমিক গবেষক ও অধ্যাপকরা হলেন প্রাচ্যবিদ।

ঃ বিচ্ছিন্নভাবে প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে মুক্তপাঠ। প্রাচ্যের সাহিত্যিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির উদ্ঘাটন। মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্মাণে যার ভূমিকা অসীম। তাকে ধারণ ও বিচার করার কাজে নিয়োজিত জ্ঞানগত প্রচেষ্টার নাম হচ্ছে প্রাচ্যবাদ।

এইসব বিচার প্রাচ্যবাদকে একটি জ্ঞানগত প্রকল্প হিসেবে হাজির করে। কিন্তু তা কি কেবল জ্ঞানগত? কেবলই বিদ্যা-পাঠ? রাজনৈতিক নয়? অর্থনৈতিক নয়? বহু গবেষক সেদিককে প্রাধান্য দিয়েছেন। মূলস্রোত হিসেবে ভেবেছেন। সেই ভাবনা থেকে প্রাচ্যবাদের যে পরিচয় প্রকাশিত, তা হলো–

ঃ প্রাচ্যবাদ এক দ্বন্দ্বচর্চার ক্রমধারা। সৌহার্দের আড়ালে বিদ্বেষ চর্চা। যার সূচনা হয়েছে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্বের গর্ভ থেকে। বিশেষত ইসলাম ও পশ্চিমাবিশ্বের সংঘাতের ভেতর থেকে।

ঃ প্রাচ্যবাদ এক পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান। যা নতুন এক প্রাচ্যগঠন এবং তার উপর পশ্চিমা আধিপত্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে।

ঃ প্রাচ্যকে পাঠ, ব্যাখ্যা, পুনর্গঠন ও তার উপর প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ ক্ষমতা খাটানোর বিশেষ প্রকল্পের নাম প্রাচ্যবাদ।

ঃ এটা হচ্ছে জ্ঞানের পোশাক পরা লুটমার ও শোষণের বিশেষ প্রক্রিয়া। যা চর্চা করে পাশ্চাত্য, চর্চিত হয় প্রাচ্যের উপর।

ঃ প্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল ও জাতির সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং তাদের বস্তু ও অবস্তুগত সমৃদ্ধি ও ঐতিহ্যের উপাদান আহরণের পশ্চিমা প্রচেষ্টা। যা প্রধানত জ্ঞানতাত্তিক উপায়ে ক্রিয়াশীল। ভারতীয়, পারসিক, জাপানি আরব ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠির জীবন ও জগতের প্রতি যার বাহুবিস্তার।

প্রাচ্যবাদের বিশ্লেষণে এতো সব বাক তৈরি হয়েছে মূলত বিশ্লেষকদের রাজনৈতিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। বিশ্ববরেণ্য প্রাচ্যবিদ এডওয়ার্ড সাঈদ তার ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থে একে দেখিয়েছেন চিন্তা ও চর্চার এক ইউরোপীয় কাঠামো হিসেবে, যার পেছনে রয়েছে বহু প্রজন্মের বিনিয়োগ। বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা এমন এক প্রক্রিয়ায় রূপ নিয়েছে, যা পশ্চিমা চেতনায় প্রাচ্যকে সিঞ্চন করার এক স্বীকৃত ছাকনিতে পরিণত হয়েছে। তার মতে 'প্রাচ্যকে হেয়করণ, দমন ও শাসন করার সাংস্কৃতিক তৎপরতা ও মনোভাব' হলো প্রাচ্যবাদ।

প্রাচ্যবাদ বিশেষজ্ঞ আলী ইবনে ইবরাহীম আন নামলাহ তার দিরাসাতুল ইস্তেশরাক গ্রন্থে প্রাচ্যবাদের ধর্মীয় দিক স্পষ্ট করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন মুসলিম বা অমুসলিম বিশ্বে বসবাস করে যে সব বিশেষজ্ঞ ইসলাম চর্চা করেছেন, -তারাই প্রাচ্যতাত্তিক। তার মুখের ভাষা আরবী হোক বা অনারবী। তার জন্ম প্রাচ্যে হোক বা প্রতীচ্যে। যেমন স্যামুয়েল এক জ্যামির। আরবীভাষী ছিলেন। বসবাস করতেন মিসরে; কিন্তু প্রাচ্যবিদ হিসেবে তিনি ইউরোপেও বরেণ্য। তার বিখ্যাত বই হলো দি মুসলিম ওয়ার্ল্ড। রবার্ট এল গাল্লিকের বসবাস ছিলো পাকিস্তানে। তার বিখ্যাত বই হলো 'মুহাম্মদ দি এডুকেটর।'

বস্তুত যেভাবেই বিচার করা হোক, এক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রণোদনা এক ঐতিহাসিক বাস্তবতা। এ থেকেই শুরু এবং এটাই তার কেন্দ্রমর্ম। ওরিয়েন্টালিজম বিশেষজ্ঞ ডক্টর মুহাম্মদ হাসান জামানীর চিন্তাও অনুরূপ। প্রাচ্যবিদদের প্রধান প্রবণতা যে ধর্মীয়, এটা স্পষ্ট করেছেন এশিয়ার মহান চিন্তাবিদ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী। তিনি লিখেন– 'তাদের বড় উদ্দেশ্য ছিলো খ্রিস্টধর্মের প্রচার-প্রসার এবং ইসলামের এমন ছবি অংকন করা, যাতে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য এমনিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আর আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী ও নতুন প্রজন্মের মধ্যে তৈরী হয় খ্রিস্টধর্মে প্রবল আগ্রহ। সাধারণত এরা এক বিশ্বাসী খিস্ট্রধর্মের প্রচারক। (ইসলামী মামালিকউ মে মাগরিবিয়ত কা কাশমাকাশ)

নদভীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা যায় প্রাচ্যবিশারদ রুডপার্টের বক্তব্যে। তিনি বলেন– "প্রাচ্যবিদদের প্রতি পাখির চোখে তাকালে দেখা যাবে খ্রিস্টধর্মের শক্তি সঞ্চার ও ইসলামকে দুর্বল করার কাজ তারা করে চলেন। (ইস্তেশরাক ওয়াল মুস্তাশরেকিন -হুসন সানওয়ী)

ডক্টর আহমদ গাযী জানাচ্ছেন– "ওরিয়েন্টালিস্ট হচ্ছেন ঐ সব খ্রিস্টান, যারা দৃশ্যত গবেষণায় লিপ্ত। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা গভীরভাবে তলিয়ে দেখলে স্পষ্ট হয় ওরা লালন করছে ক্রুসেডীয় উত্তরাধিকার। রাজশক্তির সাথে ওদের গাটছাড়া। আজ থেকে অর্ধশতক আগে লেবাননের স্কলার ডক্টর ওমর ফারুক তার গভীর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাভিত্তিক গ্রন্থ– আল ইলাকাতু বাইনাল ইস্তে'মার ওয়াত তাবশীর' এ প্রমাণ করেন পশ্চিমা শাসকদের মদদ নিয়ে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কাজ করছে প্রাচ্যতাত্তিকরা। প্রাচ্যবিদ হরগ্রোনজি তার 'মুহাম্মেডানিজম' গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করেছেন। মুসলমানদের গুলিয়ে ফেলার এ সাধারণিকরণে আমরা যদি একমত হতে পারতাম, তাহলে মুসলিম দুনিয়ার শত শত চিন্তাবিদকে ওরিয়েন্টালিস্ট সাব্যস্থ করতে হতো। এতে পরিভাষাটি স্থানচ্যুত হয়ে যেতো এবং প্রভূ ও ভৃত্য একাকার হয়ে যেতো। অতএব যে সব মুসলিম চিন্তাবিদ প্রাচ্যবিদদের মতো বলেন, লেখেন, ভাবেন, তাদেরকে প্রাচ্যবিদ প্রভাবিত বলতে পারি। পাচ্যবিদ বলতে পারি না। যদিও এদের অনেকের চিন্তা ও রচনাবলির প্রভাবে মুসলিম জাহানে ঝড়ো বাতাস কম প্রবাহিত হয়নি। তাদের অনেকের বিপজ্জনক কার্যক্রম পরিণতির দিক থেকে অনেক সময় বহু প্রাচ্যবিদের চেয়েও ভয়াবহ প্রমাণিত হয়েছে। এটা হয়েছে মূলত প্রাচ্যবিদদের চিন্তাধারার প্রভাবে। এ প্রভাবের মাত্রা ও প্রাবল্য সম্পর্কে ধারণা পাবো সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর কাছে।

তিনি লিখেন– বর্তমান মুসলিম বিশ্বের শাসক ও চালকশ্রেণীর মাথার ভেতর ইসলামের গৌরবময় অতীত সম্পর্কে মন্দ ধারণা, ইসলামের বর্তমান সম্পর্কে অসন্তুষ্টি আর ভবিষ্যত সম্পর্কে নৈরাশ্য সৃষ্টির মূলে আছে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব। ইসলাম, নবী কারীম সা. ও ইসলামের উৎসসমূহ সম্পর্কে সন্দেহ ও দ্বিধা সৃষ্টির গোড়ায়ও মূলত সেই প্রভাব। ধর্মের নবরূপায়ন ও ইসলামী আইনের সংস্কারে তাদেরকে প্রস্তুত করাসহ এমনতরো বহু বহু ক্ষেত্রে পশ্চিমা প্রাচ্যবিদদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রভাব কার্যকর। এই প্রাচ্যবিদরা ইসলাম সংক্রান্ত পুস্তকাদি পাঠে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাদেরকে সাধারণত

ওরিয়েন্টালিস্ট বলা হয়। তারা জ্ঞানের প্রসারতা, গবেষণার গভীরতা এবং প্রাচ্যের বিষয়বস্তুর গভীর অভিজ্ঞতা অর্জনের দ্বারা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক মহলে অর্জন করেছেন শ্রদ্ধা ও সম্মান। ইসলামী বিভিন্ন বিষয়ে তাদের গবেষণা ও মতামতকে খোদ প্রাচ্যে মনে করা হয় সর্বোচ্চ বক্তব্য হিসেবে। মীমাংসিত সত্য হিসেবে। (ইসলামী মামলিকঁউ মে মাগরিবিয়ত কা কাশমাকাশ)

নদভী বর্ণিত 'জ্ঞানের প্রসারতা' 'গবেষণার গভীরতা' ও 'বিষয়বস্তুর প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা' প্রাচ্যবিদদের বিশেষ বৈশিষ্ট। এ কাজে তারা জীবনপাত করেছেন এবং একে মিশন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। ফলে বিদ্বেষ বা বিকৃতি উচ্চনাদে উচ্চকিত হয়নি। উদ্দেশ্যের এই গোপন জায়গাটি পাণ্ডিত্য দিয়ে তারা ঢেকে রাখতে চেয়েছেন এবং অনেকটা সফল হয়েছেন। ফলে প্রাচ্যবিদ্যা একটি জ্ঞানতাত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারছে। জ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। সময় যতো যাচ্ছে পশ্চিমা মস্তিষ্ক শাসনের স্বাভাবিক চাহিদা এর শাস্ত্রীয় গুরুত্বকে আরো গভীরতা দিচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ শাস্ত্রকে অনিবার্য হিসেবে নিচ্ছে। সে 'জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাকেন্দ্রীক চিন্তাধারা' (এডওয়ার্ড সাঈদের ভাষায়) বলে নিজেকে উপস্থাপন করছে। এবং "যিনি" প্রাচ্যবিষয়ে জ্ঞান চর্চা ও গবেষণা করেন" (এডওয়ার্ড সাঈদের ভাষায়) তাকেই প্রাচ্যবিদ বলে পরিচয় দিচ্ছে। ভদ্র আবরণে প্রাচ্যের ধর্ম, সমাজ, শিল্প-সংস্কৃতি, সভ্যতা, ইতিহাস, ইত্যাদি বিষয়ে দয়া করে চর্চা ও অধ্যবসায়ে মেধা নিয়োগের ভাব দেখাচ্ছে। সরল অর্থে শ্রদ্ধা ও সবিস্ময়ে তাদের জ্ঞানরাজ্যকে প্রাচ্যের মহোত্তম ধনাগার হিসেবে দেখা হয়েছে। নিছক জ্ঞান সাধক হিসেবেই তাদেরকে বিচার করে তাদের চিন্তাশাসনকে প্রশ্নাতীত আনুগত্যে অনেকেই গ্রহণ করে ধন্য হতে চেয়েছেন। ডক্টর ইসমাইল আলী মুহাম্মদের মতো পণ্ডিত তার 'আল ইস্তেশরাক বাইনাল হাকিকাতি ওয়াত তাদলীল' গ্রন্থে প্রাচ্যবিদদের বহু সমালোচনা করলেও তাদের যাবতীয় প্রয়াসকে জ্ঞানগত প্রণোদনা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মরিয়ম জামিলা ১৯৮০ সালে প্রকাশিত তার ইসলাম এন্ড ওরিয়েন্টালিজম গ্রন্থে তাকে দেখিয়েছেন একটি অধ্যয়ন প্রক্রিয়া হিসেবে। চিহ্নিত করেছেন এর আড়ালের আবেগকেও। তাতে স্পষ্ট হয় খ্রিস্টান লেখকগণ জেনে বুঝে রাসূল সা. সম্পর্কে জনগণকে খুব বেশি বিভ্রান্ত করেছে। তারা ইসলামী শিক্ষাকে অসার প্রমাণ করার, কুরআনের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন

করার এবং হুজুর সা. এর পূত-পবিত্র ও আদর্শ জীবনকে কলুষিত করার লক্ষ্যে ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করেছে। খ্রিস্টবাদী প্রাচ্যবিদদের এ পন্থা অনুসরণ করেছেন বহু ইহুদী-হিন্দু-বৌদ্ধ পণ্ডিত। ডক্টর হাসান জামানীর মতে প্রাচ্যবিদ শুধু খ্রিস্টান বা ইহুদী নন, হিন্দু-বৌদ্ধও হতে পারেন। প্রাচ্যবিদ্যার পুরোধাদের মধ্যে আছেন ইহুদী পণ্ডিত গোল্ড যিহার, শাখত প্রমূখ। কেউ কেউ বলেন, হিন্দু সংস্কারক দেবানন্দ সরস্বতী, রাজা রামমোহন রায় প্রাচ্যবিদদের অন্তর্ভুক্ত। খ্যাতিমান বিশেষজ্ঞ মালিক বিন নবী আরো অগ্রসর হয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রাচ্যবিদদের উপস্থিতি দেখেছেন। তিনি বলেন– প্রাচ্যবিদ্যা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য হলো পশ্চিমা পণ্ডিতবর্গ ছাড়াও বহু আরব পণ্ডিত, যারা ইসলামী চিন্তা ও সংস্কৃতির উপর তীর নিক্ষেপ করেন। যেমন আহমদ হাসান যাইয়াত, মুহাম্মদ আব্দুল গণী, ডক্টর আব্দুর রহিম সাবেহ প্রমুখ।

শেখ ওয়ালী খান মুজাফফর তার ইস্তেশরাক ওয়াল মুস্তাশরেকীন গ্রন্থে মালিক বিন নবীকে উদ্ধৃতি করে মুসলিম প্রাচ্যবিদদের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। কিন্তু প্রাচ্যবাদের ইতিহাস এ সাধারণিকরণকে প্রশ্রয় দেয় না। শব্দটি শুরু থেকে প্রযোজ্য হচ্ছে বিশেষ ভাবধারার খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে। এ.জে. আরবেরির মতে ওরিয়েন্টলিস্ট' এর প্রথম ব্যবহার হয় ১৬৩৮ সালে। প্রযোজ্য হয় গ্রীক গির্জার এক পাদ্রীর ক্ষেত্রে। ম্যাক্সিম রটেশন এর মতে ১৭৯৯ সালে ফরাসি গির্জায় শব্দটির ব্যবহার হয়। ১৭৭৯ সালে ব্রিটেনের পাদ্রি লেগ ভেগের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ঘটে। আলী ইবনে ইবরাহীমের মতে ১৭৬৬ সালে ল্যাতিন এনসাইক্লোপোডিয়ায় শব্দটির প্রয়োগ হয় পাদ্রি জালিনুসের ক্ষেত্রে। ১৭৭০ ও ৮০ সালে বিশেষ কিছু প্রাজ্ঞজনের ক্ষেত্রে শব্দটির প্রয়োগ বিস্তৃত হয়। ১৬৯০ সালে প্রাচ্যের কয়েকটি ভাষা শিখে প্রাচ্যবিদ নামে বিখ্যাত হন স্যামুয়েল ক্লার্ক। প্রাচ্যবিশেষজ্ঞ পশ্চিমা ইহুদীদের ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। ১৮৩৮ সালে ইংরেজীতে শব্দটির প্রথম ব্যবহার ঘটে প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ প্রতীচ্যবাসীর ক্ষেত্রে। ১৮৩৮ সালে একই অর্থে শব্দটি প্রথম ব্যহৃত হয় ফরাসি একাডেমির অভিধানে। ১৮১২ সালে শব্দটি স্থান পায় অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে, প্রায় একই অর্থে। সেই থেকে আজ অবধি শব্দটি অর্থের এই এলাকা অতিক্রম করেনি। প্রাচ্যবাদের পথপরিক্রমা হাজার বছরের হলেও ১৬৩৮ সালের আগ পর্যন্ত তার গতিশীলতা বজায় থেকেছে বিশেষ কোনো নাম ছাড়া। তখনও এ ধারার পুষ্টিবিধান করেছেন খ্রিস্টান পাদ্রীরা। সঙ্গে থেকেছেন কোনো কোনো ইহুদি।

এতে জ্ঞানতাত্ত্বিক ভাবাবেগ ছিলো। কিন্তু গোড়ায় ছিলো ধর্মীয় প্রণোদনা। এর পাশাপাশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও সক্রিয় ছিলো। ফিলিপ কে হিট্টি ধর্মীয় প্রেক্ষিতকে আড়াল করে 'রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক' কারণকে সামনে নিয়ে এসেছেন। প্রাচ্যবিদকে কিছুটা নির্বিষ করতে চেয়েছেন। আসল বিষয়কে ধামাচাপা দিয়ে আসল উদ্দেশ্য লুকাতে চেয়েছেন। 'ইসলাম : এ ওয়ে অব লাইফ' গ্রন্থে তিনি লিখেন– 'মধ্যযুগে খ্রিস্টানরা হযরত মুহাম্মদকে ভুল বুঝেছিলো। এ কারণে তার বিষয়ে অশুভ ধারণা রাখতো। .... ইতিহাসের দৃষ্টিতে এর পেছনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণই ছিলো অন্যতম। (হিট্টির কথায় মনে হয় 'ভুল বুঝা' অতীতের বিষয়। এখনকার নয়। "অশুভ ধারণা' রাখা হতো, এখন রাখা হয় না। অথচ অতীতের এই ধারা বর্তমানেও গতিমান।)

হরগ্রোনজি তার 'মুহাম্মেডানিজম' গ্রন্থে জানাচ্ছেন– এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের হোতা ছিলো ধর্মীয় নেতা ও পাদ্রীরা। খ্রিস্টান জগতের সামনে নিজেদের অপকর্ম, পাপাচার, জোরজুলুম ও সীমাহীন বিলাসিতা যাতে প্রকাশ না হয় এবং জনগণের লক্ষ্য তাদের পরিবর্তে মুসলমানদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া সম্ভব হয়, এ জন্যে তারা ঐ পথ বেছে নেয়। রাজনৈতিক কারণেও তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে উঠে-পড়ে লাগে এবং জনগণকে সর্বদা ক্ষেপিয়ে রাখার চেষ্টা করে। শাসকবর্গ পে..দের অনুচরদের সহায়তায় ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের শিকড় মজবুত করে রাখে। আর এই ইসলাম বিদ্বেষের আড়ালে তারা ভ্রান্ত খ্রিস্টবাদ ও দেশপ্রেমে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেও তাদের আসল মতলব ছিলো নিজেদের ক্ষমতা নিশ্চিত করা এবং জনগণের ধন-সম্পদ লুটপাট করে সম্পদের পাহাড় জমানো। মুসলমানদের ক্ষমতা ও প্রভাবকে তারা নিজেদের কর্তৃত্বের জন্যে সবচে' বড় হুমকি মনে করতো। সাধারণ খ্রিস্টানদের নির্মল মনকে মিথ্যা প্রচারে ওরা বিষিয়ে ফেলতো।"

আমেরিকান গবেষক ক্যারেথ ক্রাগ ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত তার "দি কল অব দি মিনারেট" গ্রন্থে লিখেন– ক্রুসেডে খ্রিস্টানদের ঐতিহাসিক পরাজয় তিক্ত স্মৃতি হয়ে তাদেরকে পোড়াচ্ছিলো। পরবর্তিতে তুর্কি অটোমানদের সাথে চলমান বৈরীতা খ্রিস্টান জগতকে করে দেয় বিষময়। ফলে ইসলাম ও তার নবীর বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চলতেই থাকে। একের পর এক।"

আলী ইবনে ইবরাহীম আন নামলা তার মাসাদিরুল মা'লুমাত আনিল ইস্তিশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকীন গ্রন্থে লিখেন– "প্রাচ্যবিদ্যার দ্বিতীয় লক্ষ্য হলো–

মুসলিম রাষ্ট্র ও তাদের সংস্কৃতি, আকিদা-বিশ্বাস, সাহিত্য, গল্প-কাহিনী ইত্যাদি জানা। যাতে সে সব দেশকে আধিপত্যের বলয়ে রাখা যায়। জনগণকে প্রভাবিত করা যায়।" এ উদ্দেশ্য খোলাসা হয় সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভীর ভাষ্যে। তিনি জানাচ্ছেন- "প্রাচ্যে প্রতীচ্যের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার অগ্রবর্তি বাহিনী হলো প্রাচ্যবিদগণ। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকে জ্ঞানগত সহায়তা ও উপকরণ সরবরাহ এদের কাজ। তারা প্রাচ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও দেশের নীতি-প্রথা, স্বভাব, মনস্তত্ত্ব, জীবনযাপন প্রণালী, ভাষা ও সাহিত্য এমনকি আবেগ, উদ্যম, মানসিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে যথাযথ ও বিস্তারিত তথ্য সরবরাহ করে। যাতে প্রতীচ্যের দেশসমূহ পশ্চিমারা সহজেই শাসন করতে পারে। এবং প্রাচ্যের সেই প্রকৃতি, আন্দোলন, বিশ্বাস ও চিন্তাকে তারা হত্যা করে ফেলে, যা পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের জন্যে মাথাব্যথার কারণ। দুর্ভাবনার উপলক্ষ। তারা এমন মানসিকতা ও পরিবেশ তৈরির প্রয়াস চালান, যা প্রতিষ্ঠিত হলে সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের বিরোধিতার কথা কেউ চিন্তাও করবে না। উল্টো বরং তাদের সভ্যতাকে শ্রেষ্ঠ হিসেবে ভাববে। তাদের কথিত 'সেবা'-কে শ্রদ্ধা করবে। নিজেদের দেশের সংস্কার ও প্রগতির প্রয়োজনে পশ্চিমাদের আনুগত্যের এমন আবেগ সৃষ্টি হবে, যাতে দখলদার পশ্চিমা সরকার চলে যাবার পরও সে দেশে তাদের চিন্তা ও সভ্যতার শাসন অব্যাহত থাকে। এ কারণেই পশ্চিমা শাসকবর্গ তাদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা খুবই উপলব্ধি করে। সর্বোচ্চ মাত্রায় তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। (ইসলামী মামালিকউঁ মে মাগরিবিয়ত কা কাশমাকাশ)

প্রাচ্যের সাথে পশ্চাত্যের সম্পর্ক বরাবরই সংঘাতময়। প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবী বিভক্ত দুই শিবিরে। রোমান বনাম পারসিক দ্বন্ধ, রোমান বনাম মুসলমান লড়াই, ক্রুসেডার বনাম মুসলমান যুদ্ধ, উসমানী সালতানাত বনাম ইউরোপ সংঘাত... এভাবেই চলছে। বর্তমানে এক শিবিরে ইউরোপ-আমেরিকা, আরেক বলয়ে মুসলিম এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তিকামী জনগণ। এই দ্বন্দ্বের গভীর থেকে উঠে আসা প্রবল ও প্রভাবক এক প্রবাহের নাম প্রাচ্যবাদ। ডক্টর ফয়সল বিন খালিদ দ্বন্দ্বের এই পরিক্রমকে সামনে রেখে "ইস্তেশরাক আল মুস্তালাহ ওয়াদ দালাইল" গ্রন্থে লিখেন- "ইস্তেশরাক তথা প্রাচ্যবাদ মানে পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচ্যকে কামনা করা। অর্থাৎ এমন এক প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্ক, যার কর্তা হলো পাশ্চাত্য।" এর মানে পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ, চিন্তাধারা ও সংস্কৃতি হবে প্রাচ্যের কর্তা। চালক। প্রাচ্য হবে তাদের শাসিত অঞ্চল। জনগণ

হবে তাদের প্রজা। প্রাচ্যের গৌরব স্বীকৃত হবে একজন প্রজার গৌরব হিসেবে। অধিনস্তের গৌরব হিসেবে। পাশ্চাত্যের এই মানসিকতা নতুন নয়। তারা বরাবরই নিজেদের শাসক এবং প্রাচ্যকে শাসিত হবার যোগ্য বলে ভেবেছে। এই ভাবনাই গ্রীক বীর আলেকজান্ডারকে প্রণোদিত করে প্রাচ্য দখলে। তিনি যখন প্রাচ্যের জনগণকে গ্রীকদের সাথে তুলনা করেন, তাদেরকে দেখেন 'দাস প্রকৃতির মানুষ' হিসেবে। "প্রাচ্যের দাস প্রকৃতির অসংখ্য অধিবাসীদের চেয়ে অধিক সুবিধাজনক অবস্থায় ছিলো তারা। প্রাচ্যের ওসব অধিবাসী স্বৈরাচারি শাসকের ভয়ে ছিলো ভীত। তাদের মাঝে অভাব ছিলো শৃঙ্খলার।" (জে. এম. বওয়ারা : দি গ্রিক এক্সপেরিয়েন্স)

এডওয়ার্ড সাঈদ তার ওরিয়েন্টালিজমে বিশদভাবে জানাচ্ছেন– "এখানে পশ্চিমের মানুষ আছে, আর আছে প্রাচ্যবাসী। প্রথমোক্তরা আধিপত্য করবে। সেই আধিপত্যের শিকার হতে হবে অবশ্যই দ্বিতীয়োক্তদের। যা সচরাচর বুঝায় তারা তাদের ভূমি দখল করে নিতে দেবে। তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে। তারা তাদের রক্ত ও সম্পদ তুলে দেবে কোনো না কোনো পশ্চিমা শক্তির হাতে। ওই ক্রোমার ও বেলফোর, অচিরেই আমরা দেখবো, মানবতাকে নগ্ন করে এমন নিষ্ঠুর সাংস্কৃতিক ও জাতিগত সত্তায় নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, যা তাদের অনৈতিকতার ইঙ্গিত নয় মোটেও।" তিনি ১৯০৮ সালের জানুয়ারীর 'এডিনবার্গ রিভিউ'-এ প্রকাশিত ক্রোমারের একটি লেখা কাটাছেড়া করেন। যাতে ক্রোমার প্রাচ্যের মানুষকে চিত্রিত করেন "শাসিত জাতি' হিসেবে।

যে মানসিকতা আলেকজান্ডারে, তা ঔপনিবেশিক তাত্তিক ক্রোমারেও! দূর অতীতের এস্কিলাইসের নাটক 'দ্য পার্সিয়ানে' প্রাচ্যকে হাজির করা হয়েছে 'সমুদ্রের ওপারের শত্রু' হিসেবে। 'অন্য এক পৃথিবী' হিসেবে। যে পৃথিবী ইউরোপের কাছে পরাজিত। যে কথা বলছে জেরেসেক্সেসের বৃদ্ধা পারস্য রাণীর মুখ দিয়ে। সে বিলাপ করছে। শোক-সংগীত গাইছে। কারণ সে পরাজিত।

আর জর্জ আরওয়লের চোখে প্রাচ্যের জনগণ, (মুসলিম মিসর) যাদেরকে মানুষ বলে বিশ্বাস করা কঠিন। অবশ্যই তারা 'অন্য এক পৃথিবীর' বাসিন্দা। দেখুন সেই পৃথিবীর চিত্র–

'আপনি যখন দুই লাখ অধিবাসীর এরকম শহরের ভেতর দিয়ে হাঁটবেন, যাদের মধ্যে অন্তত ২০ হাজার লোকের দাঁড়ানোর জন্যে এক টুকরো তেনা ছাড়া আর কিছুই নেই। যখন আপনি দেখবেন মানুষেরা কীভাবে বেঁচে থাকে, এবং

তার চেয়ে বেশি করে, কত সহজে তারা মারা যায়, তখন বিশ্বাস করা কঠি
আপনি সত্যি সত্যিই মানুষের মাঝখান দিয়ে হাঁটছেন। প্রকৃতপক্ষে স
ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য এই বাস্তবতার উপর প্রতিষ্ঠিত। লোকগুলোর মুখ বাদামি
অন্যদিকে ওরা সংখ্যায় অনেক। ওরা কি আপনার মতোই রক্ত মাংসের
অধিকারী? ওদের এমনকি কোনো নাম আছে? অথবা ওরা কি মৌমাছি ব
কোরাল পতঙ্গের মতো স্বতন্ত্র, অবিভাজিত বাদামী বস্তু? এরা মাটি থেকে অ
নেয়, কয়েক বছর ঘাম ঝরায় ও উপোস থাকে। অতঃপর আবার নামহীন
পাহাড়ের কবরখানায় ডুবে যায়। কেউ লক্ষ্য করেও না যে, ওরা চলে গেছে।
এমনকি কবরটিও অচিরেই মিশে যায় মাটিতেই।"

অতএব এই 'অমানুষ'দের মানুষ বানাবার জন্যে তাদের দেশ দখল করতে
হবে। ১৮৭৬ সালের সেপ্টেম্বরে ব্রাসেলস-এর ভূগোল সম্মেলনে বেলজিয়ামের
রাজা লিউপোল্ড সেই দখলদারীর প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন– 'এখন পর্যন্ত
পৃথিবীর যে সব এলাকায় আমাদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি, সেগুলোকে সভ্যতার
জন্যে খুলে দেয়া এবং যে অন্ধকার জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তা দূর
করা হচ্ছে এমন এক ক্রুসেড, যা এ শতাব্দীর অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন। (এ
হিস্ট্রি অব দি বেলজিয়ান কঙ্গো : জর্জ মার্টেল) কী দেখলাম! রাজা লিউপোল্ড
পররাজ্য গ্রাসের অভিপ্রায়কে 'শতাব্দীর অগ্রগতির জন্যে' প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ
বলে ঘোষণা করেছেন। যার যুক্তি তৈরি করে দিচ্ছেন এস্কিলাইস-ক্রোমার-
অরওয়েলরা। পশ্চিমা আগ্রাসী রাজনীতিকে এভাবেই তেল সরবরাহ করে
প্রাচ্যবাদ।

রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে সমান্তরালে রয়েছে অর্থনৈতিক দিক। যার জন্যে
প্রাচ্যের জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে তাদের অবগতি জরুরী ছিলো। অষ্টম শতক
থেকে নিয়ে পৃথিবীতে শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির মতো বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও
আন্তর্জাতিক ভাষা ছিলো আরবী। উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যদ্রব্য তৈরী হতো মুসলিম
জাহানেই। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিলো মুসলিম নগরসমূহ।
ইউরোপকে তাই সেখানে হাত পাততে হতো। আমরা এক্ষেত্রে মুসলিম স্পেনের
উল্লেখকে প্রশস্ত মনে করবো। ফিলিপ কে. হিট্টির বয়ানে তার কিছু দিক
আভাসিত। তিনি লিখেন– "চামড়া পাকা করা ও চামড়ার উপর হরফ লেখার
ব্যাপারটি আন্দালুসিয়া থেকে মরক্কোতে যায়। সেখান থেকে আমদানি করা হয়
ফ্রান্স ও ইউরোপে। পশমী ও রেশমী কাপড় তৈরী হতো আন্দালুসিয়ার কর্ডোভা,

মালাগা, আলমেরিয়া সহ অন্যান্য স্থানে। গুটিপোকার চাষ প্রথমে শুরু হয় চীনে। মুসলমানরা একে ইউরোপে নিয়ে আসেন। এর চাষ ও বাণিজ্যে ইউরোপ অর্জন করে বিশাল সাফল্য। আলমেরিয়াতে তৈরী হতো কাঁচ ও পিতলের দ্রব্যাদি। পেটারনায় ছিলো মৃৎশিল্পের কেন্দ্র। জায়েন ও আল গরিব বিখ্যাত ছিলো সোনারূপার খনির জন্য। কর্ডোভা বিখ্যাত ছিলো লৌহ ও সীসার খনির জন্য। মালাগা প্রসিদ্ধ ছিলো রুবির জন্যে। দামেশকের মতো টলেডো ছিলো তরবারি তৈরিতে বিশ্ববিখ্যাত। ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতবদ্রব্যে স্বর্ণ-রৌপ্যের কাজ ও ফুল তুলার কাজটি দামেশক থেকে স্পেনে আমদানি হয়। এ শিল্প সমৃদ্ধ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপে। .... মুসলিম স্পেনের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য তাদের ব্যবহারের পরেও উদ্বৃত্ত থাকতো। সেভিল নদীর তীরে ছিলো একটা বৃহৎ বন্দর। এখান থেকে কার্পাস জলপাই ও তেল রফতানি হতো। এখানে আমদানি হতো মিসরের কাপড়, দাসদাসী এবং ইউরোপ-এশিয়া থেকে গায়িকা-বালিকা। মালাগা ও জায়েম থেকে রফতানি হতো জাজিম ও চিনি।" হিট্রি আরো অগ্রসর হয়ে লিখেন– "প্রাচ্যের কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্য বাজারজাত করার জন্যেই ইউরোপীয় বাজারের পত্তন হয়। ক্রুসেডার ও তীর্থযাত্রীদের চলাচলের প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এতোটাই প্রসার লাভ করে যে রোমান শাসনের পর আর এমনটি দেখা যায়নি। .... নতুন এই পরিস্থিতির কারণে মুদ্রার ব্যাপক উদ্ভাবন ও দ্রুত পরিচালনা জরুরী হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই প্রচার ক্রেডিট মুদ্রার প্রচলন হয়। ইউরোপের জেনোয়া ও পিসায় ব্যাংক স্থাপন করতে হয়। লেভান্টে তার শাখা খোলা হয়। টেম্পলারগণ হুন্ডির ব্যবসা শুরু করেন। (দি এ্যারাব এ শর্ট হিস্ট্রি)

তাহলে দেখা যাচ্ছে মুসলিম প্রাচ্যের প্রভাবে ইউরোপীয় বাণিজ্যের ভীত গড়ে উঠে। তাদের বাজারের সুচনা হয়। ব্যাংকের সুচনা হয়। ক্রেডিট মুদ্রার সুচনা হয়। কৃষি ও শিল্পপণ্যের জন্যে তারা নির্ভরশীল ছিলো মুসলিম বিশ্বের উপর। এ প্রেক্ষাপটে মুসলিম প্রাচ্যের ভাষা ও সংস্কৃতি না জানলে তাদের চলছিলো না।

সে সময় বাণিজ্যিক চুক্তিপত্র সম্পাদিত হতো আরবী ভাষায়। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের পারস্পরিক বাণিজ্যে তো বটেই, এমনকি পাশ্চাত্যের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও। ১২৬৫ সালে টুন্স ও ইতালির ব্যবসায়ীদের মধ্যে যে বিখ্যাত চুক্তি সম্পাদিত হয়, তা লিখিত হয় আরবী ভাষায়। এই সব বাস্তবতার কারণে অর্থনৈতিক প্রয়োজন বরাবরই প্রাচ্যবিদ্যাকে উৎসাহিত করতো।

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী চলমান আরেকটি দিক খোলাসা করেছেন- 'ইসলাম এন্ড ওয়েস্ট' গ্রন্থে তার ভাষ্য- প্রাচ্যবিদদের একটি উদ্দেশ্য অর্থনৈতিকও বটে। অনেক বিজ্ঞজন একে সফল ব্যবসা হিসেবে দেখেন। ক প্রকাশক এ সম্পর্কিত গ্রন্থাবলি খুবই আগ্রহে ছাপেন। কারণ এশিয়া-ইউরোপে এগুলোর চাহিদা বিশাল। প্রতীচ্যে বরেণ্য ব্যক্তিরা এ ক্ষেত্রে উৎসাহ যোগান, পৃষ্ঠপোষকতা করেন। খুবই দ্রুততার সাথে এ সম্পর্কিত গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকায়। কারণ এতে আর্থিক লাভ প্রচুর। বাণিজ্যিক উন্নতি নিশ্চিত।"

বেনজামিন ডিজরাইলির সেই প্রবাদপ্রতীম উক্তি ইউরোপে এখনো চরম বাস্তব। তিনি বলেছিলেন- 'প্রাচ্য হলো উন্নতির এক পেশা।'

"প্রাচ্যদেশীয় আকাশ ও আয়োনীয় আকাশ প্রতি ভোরে পরস্পরকে পবিত্র প্রেমের চুম্বন এঁকে দেয়; কিন্তু পৃথিবী এখানে মৃত, কারণ মানুষ তাকে হত্যা করেছে এবং ইশ্বর ছেড়ে দিয়েছেন তাদের সঙ্গ"।

—ল্যামারটিন

বহুরূপ, বহু স্রোত

১৯৪৫ সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মর্ডান ট্রেন্ড ইন ইসলাম' শিরোনামে বক্তৃতা প্রদান করেন প্রাচ্যবিদ হ্যামিল্টন এ.আর গিব। শুরুতেই তিনি বলেন– "আরব সভ্যতার ছাত্ররা অবিরাম একটি তীব্র সংঘাতময় অবস্থার মুখোমুখি হচ্ছে। এ সংঘাত নিহিত আছে আরবী সাহিত্যের কোনো কোনো শাখায়। যাতে কল্পনাশক্তির ক্ষমতা প্রদর্শিত হয়েছে। যুক্তির বিন্যাসও প্রকাশিত হয়েছে। আর এতে যথার্থের প্রবণতাও দেখা গেছে। এসব বিষয় উদ্ভাবনেও তা যুক্ত। মিথ্যা নয়, মুসলমানদের মধ্যে বড় মাপের বহু দার্শনিক আছেন। বিরল ব্যতিক্রম হিসেবে যাদের কয়েকজন আরব। বাইরের জগত কিংবা ভিতরের চিন্তার ধরণ- কোনো ক্ষেত্রেই আরবমন বিচ্ছিন্নতার আবেগ সামলাতে পারে না। এবং দৃশ্যমান ঘটনার স্বতন্ত্র দিক পরিহার করতে পারে না। আমার মতে এর কারণ হচ্ছে প্রাচ্যের অধিবাসীদের 'আইন সম্পর্কে সচেতনতার অভাব।' এটাই হচ্ছে এর

প্রধান নিয়ামক। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ড যাকে প্রাচ্যবাসীদের চরিত্রগত বি...
বলে ভেবেছেন।

এ থেকেই যৌক্তিক ও নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির প্রতি মুসলমানদের অনী...
কারণ স্পষ্ট হয়। বিষয়টি পাশ্চাত্যের ছাত্রদের কাছে অত্যন্ত দুরূহ। (যু...
ছাত্ররা তা ব্যাখ্যা না করা পর্যন্ত) .... যৌক্তিক চিন্তাপদ্ধতি বর্জন ও
উপযোগবাদকে প্রত্যাখান ওদের সত্তার সাথে অবিচ্ছিন্ন। এক থেকে আরেক
পৃথক করা অসম্ভব। এর উৎস মুসলমান ধর্মবিশারদদের চিন্তায় নয়। বরং ত
নিহিত আছে আরব কল্পনার ক্ষুদ্রতা ও স্বাতন্ত্রে।"

বক্তৃতার একটি অংশ মাত্র। যাকে প্রাচ্যবিদদের বাকরীতির নজির হিসে...
দেখা যেতে পারে। গিবের শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন ইসলামী ফ্যাকাল্টির ছাত্র
এবং বহু মুসলিম। গিব এক তীব্র সংঘাতের তরঙ্গে তাদেরকে প্রথমেই ফে...
দিলেন। অবশ্য তাদের কাছে পাঠ গ্রহণকারী প্রতিটি মুসলিম সংঘাতের অর্থ
হারিয়ে যেতে বাধ্য। নিশ্চয় এদের মধ্যে আরোপিত সংঘাত কাজ করছিল।
'আরবী সাহিত্যের কোনো কোনো শাখা' -যাতে কুরআন-হাদীস, ফেকাহ,
কবিতা, কথাশিল্প- সব কিছুকেই তারা একাকার করে দেন। স্পষ্ট না করে
তাদের বাকরীতির সাথে পরিচিতদের কাছে তারা স্পষ্ট ইঙ্গিত পৌঁছে দেন।
তারা ঠিকই কোনো কোনো শাখার মধ্যে কুরআন-হাদীসকে মনে মনে অন্তর্ভু...
করে নেন। এতে কাজ করেছে "কল্পনাশক্তির ক্ষমতা' ও 'যুক্তির বিন্যাস'! আর
তাতে 'যথার্থের প্রবণতাও আছে! -এই সাহিত্যের গোড়ায় আছে আরব মন। য
পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন এবং ঘটনার বাহ্যিকতায় তুষ্ট। আইন সম্পর্কে বরাবর
আসচেতন।

গিবের আক্রমন কোথায়- এখন পর্যন্ত তা অস্পষ্ট। তিনি আরব মনের
দুর্বলতাই ব্যাখ্যা করছিলেন। এখন তীরটা সোজা করে বলে দিলেন- 'যৌক্তিক
ও নিয়মতান্ত্রিক চিন্তাপদ্ধতির প্রতি মুসলমানদের অনীহার' কারণ এই সাহিত্য।
অর্থাৎ তা এমন সাহিত্য যা অনারব মুসলমানদের মনকেও শাসন করে। নিশ্চ...
তা আরব কবিতা বা গল্পগাথা নয়। নিশ্চয়ই তা ধর্মীয় সাহিত্য। গিব এবার তীর
ছুঁড়লেন- যৌক্তিক চিন্তা পদ্ধতি বর্জন' ও 'উপযোগবাদ পরিহার' যাদের সত্তায়
নিহিত- তাদের সাহিত্যের দায়ভার তিনি ধর্মবিশারদ সত্তার উপর চাপাতে চান
না। চাপান কল্পনা সত্তার উপর। যা ক্ষুদ্র ও স্বতন্ত্র।

এর মানে ধর্মবিশারদরা এ সাহিত্য তৈরীতে নিজেদের ক্ষুদ্র কল্পনা ও
যুক্তিবর্জিত মানসিকতার ব্যবহার করেছেন। আবার কোথাও কোথাও যুক্তির
প্রয়োগও আছে। ছাত্ররা যুক্তির বিন্যাস দেখে এ কে পরিহার করতে পারে না।

আবার এর ভাঁজে ভাঁজে যুক্তিহীনতা ও ক্ষুদ্রতা লক্ষ্য করে একে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে তারা 'একটি তীব্র সংঘাতময় পরিস্থিতির' মুখোমুখি। কিন্তু যা তিনি বলেননি, কিন্তু তার বক্তব্যের অনিবার্য উপসংহার, তা হলো- স্থায়ী অক্ষমতার কারণে ইসলাম শুরু থেকেই খুঁত যুক্ত হয়ে আছে। যে মুসলিম মানস উপযোগহীন হাত দিয়ে একে উদ্ভাবন করেছে, সে তো যুক্তিহীন। যুক্তিশীল ও উপযোগবাদী মানসিকতার জন্য তার প্রায়োগিকতা কোথায়?

মুসলিম ছাত্ররা পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যায়ে ইসলাম অধ্যয়ন করে গভীর সংশয়বাদী হয়ে কেন ফিরে আসে? কেন আরবী সাহিত্য বা ইসলামের ইতিহাসের ছাত্ররা ইসলামের প্রতি কম আস্থাশীল? কেন আধুনিক আরবদের বিশাল এক অংশ ইসলামকে অধ্যয়ন করে কেবল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হিসেবে? কেন ইসলামের প্রয়োগিক প্রতিষ্ঠা পশ্চিমাধারায় শিক্ষিত মুসলমানদের প্রতিরোধের সম্মুখীন? কেন মুসলিম জাহানে ইসলাম জীবন সমস্যার সমাধান হিসেবে উপেক্ষিত? এমন অসংখ্য প্রশ্নের জবাব পেতে 'গিবদের' এমনতরো রচনা, বক্তৃতা ও পাঠদানের প্রভাব ও প্রতিফল আমাদের উদঘাটন করতেই হবে। তাদের ভাবধারার প্রতি আস্থাশীল মাত্রই ইসলামের প্রতি আস্থা হারাবে। মুসলিম বিশ্বে গিব জনপ্রিয়। তাকে উদার প্রাচ্যবিদ বলে দেখানো হয়েছে। তিনি ইসলামকে সরাসরি কটাক্ষ কম করেছেন। পরাজিত মানসিকতার মুসলিমরা এমনতরো প্রাচ্যবিদদের বক্তব্যের বিভিন্ন অংশকে ইসলামের পক্ষে স্বীকৃতি হিসেবে ব্যবহার করে আপ্লুত হন। অথচ বিশ্বাসী মুসলিমের জন্যে তার মূল সুরটাই প্রাণঘাতি।

একজন আরব জাতিয়তাবাদী স্বাভাবিকভাবে তালাশ করেন আরবকে মহিমান্বিত করে প্রাচ্যবিদরা কিছু বলেছেন কী না! অথচ আরবকে স্থান দেয়া হয়েছে সভ্যতার সীমানার বাইরে। "আরবদের ধরে নেয়া হয়েছে উটের পিঠে সাওয়াররূপে- সন্ত্রাসী মনোভাবাপন্ন, লম্বা নাক, ধর্মত্যাগী, যাদের অবাঞ্ছিত সম্পদ সভ্যতার মুখে একটি বিরাট বাধার মতো।" (ওরিয়েন্টালিজম : এডওয়ার্ড সাঈদ)

একজন সেক্যুলার মুসলিম অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে তার ধর্মীয় প্রয়োজনের উপরে স্থান দেন। তিনি ইসলামকে প্রাচ্যদিদের চোখ দিয়ে গৃহপালিত ধর্ম হিসেবে দেখতে অভ্যস্থ। জীবনকে উপভোগ ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তার মৌলিক অম্বেষা। কিন্তু প্রাচ্যবিদ তাকেও বঞ্চিত করেন।

'এখানে সব সময় এই অনুমান ঘাপটি মেরে থাকে যে যদিও পশ্চিমা ভোক্তারা সংখ্যায় কম, তবু তারা পৃথিবীর সম্পদের উৎসসমূহের বেশির ভাগের মালিক হবে। অথবা ব্যয় করবে। কেন? কারণ সে আসল মানুষ। প্রাচ্যজনের মতো নয়। .... মধ্যবিত্ত শ্রেণির একদল সাদা পশ্চিমা মনে করে অশ্বেতাঙ্গ জগৎকে

কেবল পরিচালনা করা নয়, এর মালিকানা অর্জনও তাদের এক রকম মানবিক স্বাধীনতা। কারণ সংজ্ঞা অনুযায়ী 'এ' (প্রাচ্যজন) ঠিক 'আমাদের' মতো একই মানুষ নয় (ওরিয়েন্টালিজম : এডওয়ার্ড সাঈদ)

একজন আধুনিক মুসলিম পশ্চিম থেকে শেখা 'মানবতাবাদী" ধারণাকে সব সময় মহোত্তম হিসেবে দেখেন। ইসলামের যতটুকু এ ধারণার সাথে মিলে তা নিয়ে গর্ব করেন। তার কাছে ইসলামের প্রায়োগিকতা এই ভাবধারার গর্ভে নিহিত। উদার মানবতাবাদই তার সবচে বড় অভিপ্সা। প্রাচ্যবাদ তার পুঁজি কেড়ে নিতে চায়। তাকে প্রতারিত করে। মানবতাবাদীরা প্রায়ই বিভাগ-বন্টিত বিষয়ে তাদের গবেষণা পরিচালনা করেন। তারা প্রাচ্যতত্ত্বের মতো বিষয় পর্যবেক্ষণ করেননি। তা থেকে শিক্ষাও গ্রহণ করেননি। যার নিরবচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষা হলো গোটা পৃথিবীর প্রভূ হওয়া।

এডওয়ার্ড সাঈদ জানাচ্ছেন– " .... বিপুল বিস্তৃত আকাঙ্খা সত্ত্বেও 'ইতিহাস-সাহিত্য-কলা' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানিক নিরাপত্তা পর্দার পাশাপাশি প্রাচ্যতও ও পার্থিব ঐতিহাসিক পরিস্থিতির সাথে জড়িত। এই পরিস্থিতিকে বাগাড়ম্বরপূর্ণ বিজ্ঞানবাদ ও যুক্তিবাদের দোহাই দিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টাও আছে।"

"আমাদের পরিস্কারভাবে দেখতে হবে প্রাচ্যতও তার পরিধি, অভিজ্ঞতা ও কাঠামো দ্বারা কোন কোন মানবিক মূল্যবোধ চিরতরে মুখে দিয়ে গেছে।"

অথচ কৌতুককর ব্যাপার হলো আরব জাতীয়বাদের উদগাতা এই প্রাচ্যবাদ। মুসলিম মানসে অর্থদাসত্বের বিস্তার প্রয়াসী এই প্রাচ্যবাদ এবং পশ্চিমা মানবতাবাদী ধারণাকে উপাস্য বানাতে উদগ্রীব এই প্রাচ্যবাদ। প্রত্যেক পথ দিয়ে সে মানুষকে পথে নামিয়েছে এবং সবাইকে প্রবঞ্চিত করেছে।

তার প্রবঞ্চনা নিজের অনুকারী শিক্ষিত মুসলিমদের ক্ষতিগ্রস্থ করলো সবচে বেশি। অন্ধ, পাশ্চাত্যভক্ত, পরজীবি একটি শ্রেণি হিসেবে তাদেরকে তৈরি করলো। সর্বপ্রকার প্রচারণার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উৎকর্ষের এই যুগে ইসলামকে অনুপযোগী বলে ঘোষণা দিতে তাদেরকে সাহস যোগালো। সজ্ঞানে অবচেতনে তাদেরকে ইসলাম বিদ্বেষী নীল নকশার সহায়ক ভূমিকায় নামিয়ে দিলো। তারা ইউরোপের বস্তুবাদ, জড়বাদ, বিবর্তনবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে গ্রহণ করলো ইসলামের বিকল্প হিসেবে। পাশ্চাত্যানুকরণ ও পাশ্চাত্যায়নের স্রোতে নিমজ্জিত হয়ে আল কুরআনের প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যার বিরোধিতা করলো। হাদীস ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগিতার বুনিয়াদে আঘাত শুরু করলো। তাকলীদের অসারতা উচ্চকণ্ঠে প্রচার করে সার্বজনীন ইজতেহাদের প্রবক্তা সেজে গেলো। ইসলামী আইন ও জীবন ব্যবস্থাকে

পাশ্চাত্যের মানদণ্ডে গ্রহণ করার আওয়াজ তুললো। ইসলামী সংস্কৃতির আচারনিষ্ঠ সকল উপাদানকে তারা অপাঙক্তেয় সাব্যস্থ করলো। তার বিদায় ঘন্টা বাজাবার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলো। ইসলামকে তারা অতীতের বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করলো এবং এর অনুবর্তিতাকে একান্ত ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার বিষয় বাব্যস্থ করলো। ফলে বৃহত্তর মুসলিম জীবন থেকে তারা বিচ্ছিন্ন হলো। তাদের তৎপরতা গণদৃষ্টিতে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত হলো।

ইসলামের অস্তিত্বকে ওরা মেনে নিতে প্রস্তুত কী-না, সেই সন্দেহ দানা বাঁধলো। মুসলিম জাহানে ওরা ঘরের শত্রু হিসেবে এক ধরনের 'অপরাধীর' জীবন যাপনে বাধ্য হলো। যদিও তারা সেই অপরাধকে প্রগতিশীল সৃজনশীলতা হিসেবে ভাবতে চেয়েছে। তারা নিজেদের রচনা, সাহিত্য জ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা দ্বীনী আকিদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছে। ইসলামী ব্যক্তিত্বদের চরিত্র হনন করতে চেয়েছে। ইসলামী মূল্যবোধসমূহকে সংশয়ক্লিষ্ট করতে চেয়েছে। মুসলিম সামাজিক রীতি ও আচার ব্যবহারকে চর্চার অযোগ্য প্রমাণ করতে চেয়েছে। এমনকি তারা দ্বীন ছেড়ে দিয়েছে নতুনত্বের আকাঙ্খায় অথবা প্রতীচ্যের আনুগত্যপ্রিয়তায়। কেউ কেউ এ পথে যায় রাতারাতি বিখ্যাত হবার জন্যে কিংবা বিশেষ মানসিকতার তরুণ-তরুণীদের কাছে প্রিয় হবার জন্যে।

এদের প্রতিভা শেষ পর্যন্ত অবক্ষয়ের নজির হয়ে দাঁড়ায়। মুসলিম বিশ্বে যে সব অসুখ ছিলো না, সেগুলোর বিস্তার ও প্রসারে তাদের সামর্থ্য ব্যবহৃত হয়। তারা নিজেকে কেবলই প্রতারিত করে এবং আজীবন যা রটিয়ে বেড়ায়, তা প্রাচ্যবিদদের চৈন্তিক বর্জ্য ছাড়া কিছুই নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক দেওলিয়াত্বের প্রাবল্যে তারা নিজেদের আত্মপরিচয় হারায়। বিকলাঙ্গ মানসিকতা তাদের উপর জেঁকে বসে এবং আরো বেশি বিভ্রান্তির মধ্যে পরিত্রাণ তালাশ করে। তারা মূলত প্রাচ্যবাদের পকেট থেকে বেরিয়ে আসা ঝনঝন শব্দ সৃষ্টিকারী অচল মুদ্রা ছাড়া আর কিছুই নয়।

প্রাচ্যবিদ্যা তাহলে কি পুরোটাই দুষ্ট? তার কোনো ইতিবাচক অর্জন নেই?

হ্যাঁ, আছে। মরিয়ম জামিলার স্বাক্ষ্য- পাশ্চাত্যের কিছু সংখ্যক উল্লেখযোগ্য পণ্ডিত ইসলাম সম্পর্কিত অধ্যয়নে তাদের জীবন উৎসর্গ করেছেন। শুধু ইসলামের প্রতি আন্তরিক আগ্রহের কারণে। তাদের পরিশ্রমের ফলেই কি প্রাচীন ইসলামী পাণ্ডুলিপিতে থাকা অতি মূল্যবান জ্ঞান হারিয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে যায়নি? অথবা এগুলো আমরা ভুলে যেতাম না? কিংবা থেকে যেতো না আমাদের কাছে অস্পষ্ট? র‍্যানল্ড নিকলস ও আর্থার আরচেরির মতো ইংলিশ ওরিয়েন্টালিস্টরা ধ্রুপদ ইসলামী সাহিত্য অনুবাদে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন

এবং প্রথমবারের মতো এগুলো ইউরোপীয় সাধারণ পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেন।" [ইসলাম এন্ড ওরিয়েন্টালিজম]

স্বীকার করা উচিত জ্ঞান চাহিদা ও গবেষণার আগ্রহে ইসলামী অধ্যয়নকারী প্রাচ্যবিদ কম নয়। প্রাচ্যঅধ্যয়নও এর জ্ঞানসম্পদ, ভাবসম্পদকে আত্মস্থ করণে চূড়ান্ত সাধনা নিয়োজিত করেছেন অনেকেই। এজন্যে মুসলিম দেশসমূহ সফর করেছেন। ইসলাম চর্চাকে পেশা ও নেশায় পরিণত করেছেন। তাদের প্রচেষ্টায় ইসলামী জ্ঞান সম্পদের বহু সঞ্চয় পুণরোজ্জীবিত হয়েছে। ইতিহাসের বহু দলীল জীবন পেয়েছে। তাবাকাতে ইবনে সা'দ, তারিখে তবরী, ইবনুল আসিরের তারিখুল কামিল, বালাজুরির ফুতুহুল বুলদান, আল বিরুনীর কিতাবুল হিন্দ ইত্যাদি গ্রন্থ ছিলো নিখুজঁ। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ইউরোপ থেকে তারা এসব গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বৃহৎ আকারের বহু আরবী গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। যাতে শ্রম, নিষ্ঠা ও সময় নিয়োজিত করার কথা ছিলো আরব স্কলারদের।

এই শ্রেণির বহু ব্যক্তিত্ব নিজেদের স্বগোত্রীয় প্রাচ্যবিদদের বাড়াবাড়ি ও প্রতিহিংসার বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন। এদের মধ্যে আছেন উইনিয়াম ড্রেপার, স্ট্যানলি লেনপুলের মতো খ্যাতিমান প্রাচ্যবিদ। আছেন এডওয়ার্ড এ ফ্রীম্যান, ক্যাশন ডি পারসির্ডল, রেহার্ড সাইমন, জোহান ডি রিসক, এ্যনি মেরি শিমেল, ক্যারণ আমর্স্ট্রং প্রমূখ। এদেরকে আমরা ভারসাম্যপূর্ণ প্রাচ্যবিদ হিসেবে দেখি। তাদের অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব গোস্তাব ফ্লোগল। যার আমর গ্রন্থ 'আল মু'জামুল ফিহরিস্ত লি আল ফাজিল কুরআন। তার সাথে আছেন ম্যারি শিমেল, টমাস রিচার্ড, মিশেল, হুতকা প্রমুখ। এই শ্রেণিতে শামিল হয়েছেন কোনো কোনো প্রাদ্রীও! যেমন বিশপ বয়েড কার্পেন্টার। তিনি ধর্মান্ধ প্রাচ্যবিদদের মিথ্যাচারকে প্রত্যাখান করেছেন।" দি পার্মানেন্ট এলিমেন্ট ইন রিলিজিওন" গ্রন্থে লিখেন- "অপ্রপ্রচারের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মাদ সা. এর যে ঘৃণ্য অবয়ব তুলে ধরা হয়েছে, এর ফলে অসংখ্য লোক ভ্রান্তিতে পতিত হয়েছেন। তার ভেবেছেন তিনি এমন ভয়ানক মানুষ, যার ক্ষেত্রে সকল খারাপ বিষয় প্রযোজ্য হতে পারে। তবে আক্রোশের ধেয়ে আসা কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝা সরে যাচ্ছে। আকাশ সাফ হয়ে যাচ্ছে। ফলে আমরা ইসলামের প্রচারককে দেখতে পাচ্ছি আলোর উজ্জলতায়।"

জন জোসেফ লক ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত তার 'আততুরুক' গ্রন্থে লিখেন "আমরা এখনো মনে করি ইসলাম বর্বরতার সমার্থক। অথচ আমরাই খ্রিস্টবাদের কলঙ্ক। খ্রিস্টান হবার আড়ালে আমরা নিজেদের নিপীড়নের কালো ইতিহাসকে চাই লুকিয়ে রাখতে। সততার উপর বিরাজমান খ্রিস্টানদের দায়িত্ব

হলো অখ্রিস্টানী সব তৎপরতা প্রত্যাখান করা। হযরত মুহাম্মাদ সা. এর শিক্ষানীতির উপর এমন অপবাধ আরোপ গর্হিত, অন্যায়। গোলামীর শৃঙ্খলে আবদ্ধ পৃথিবীর শ্বাস যখন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিলো, তখন ইসলামী বিশ্বে ছিলো সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা।"

এই শ্রেণির প্রাচ্যবিদরা ইসলামকে কীভাবে দেখেছেন? তারা ইসলামকে মুসলমানের চোখে দেখছেন বলে যে কথা প্রচলিত, তা অতিসরল। তারা ইসলামকে দেখেছেন আয়নায় প্রতিবিম্বিত সূর্যের মতো। আয়নার সূর্য আসল সূর্য নয়। কিন্তু সে আলোকময়, তা স্পষ্ট। দর্শক তখন সূর্যকে "আন্ধকার পিণ্ড" বলতে পারে না। কেউ যদি বলে, তাহলে সে প্রতিবাদ করে। কিন্তু নিজে যখন সূর্যের বর্ণনা দেবে, যথার্থ বর্ণনা দিতে ব্যর্থ হবে।

এডওয়ার্ড এ ফ্রীমেনের ভাষ্য শুনুন। হুজুর সা. এর প্রশংসায় তিনি লিখেছেন– "হযরত মুহাম্মদ সা. ছিলেন সংবিধান রচনাকারী আরবীয় এক মহান ব্যক্তি। তৎকালে বিশ্বব্যাপী বিপ্লব ঘটানো এবং পরবর্তি সকল যুগে প্রভাব বিস্তার করা তার ভাগ্যে লিখে দেয়া হয়েছিলো।" [দি হিস্ট্রি এন্ড কনকুয়েস্ট অব দি স্যারাসিন্স]

প্রশংসার এই ধারাটি বিপজ্জনক। এখানে পাঠকের মুসলিম সত্তা হোচট খেতে বাধ্য। তিনি সচেতন হলে টের পাবেন কথাগুলো তার ঈমানকে চোখ ঠাওরাচ্ছে। আর ফ্রীম্যান তার বিশ্বাসের বাইরের সীমানায় মুখ ঘষছেন। তার কাছে হযরত মুহাম্মাদ সা. "আরবীয় এক মহান ব্যক্তি।" অথচ তিনি সমস্ত মানবতার প্রতি প্রেরিত আল্লাহর রাসূল সা.। তার কাছে তিনি 'সংবিধান রচনাকারী'। অথচ তিনি কিছুই লিখতে পারতেন না। তাঁর অবতীর্ণ বিধি-বিধান সবই আল্লাহর ওহী!

ফ্রীমেনের চোখে 'তৎকালীন যুগে' ইসলামের ভূমিকা বিপ্লবাত্মক আর পরবর্তি যুগে 'প্রভাবক'। অথচ ইসলাম সকল যুগেই বিপ্লবাত্মক। সকল প্রেক্ষাপটে তার ভূমিকা সকল মাত্রায় প্রসারিত। সকল প্রয়োজনে সুনিশ্চিত। যেখানে বিপ্লব চাই, বিপ্লবী, যেখানে প্রভাবই যথেষ্ট, প্রভাবক।

ভুলে যাচ্ছি না- এই সব প্রাচ্যবিদ খ্রিস্টান। আমাদের মতো তাদের ভাবতেই হবে- এমনটি আশা করতে পারি না। সীমাবদ্ধতার আওতায় অবস্থান করে নিজেদের কাজে নিষ্ঠার স্বাক্ষর তারা রেখেছেন, দায়িত্বশীলতার প্রমাণও রেখেছেন কিছুটা, সেজন্যে শুভেচ্ছার জমিতে তাদের নাম আমরা রোপন করে রাখলাম।

এদের পাশাপাশি আছেন আরেকদল প্রাচ্যবিদ, যারা আরবী না জেনেও কুরআন-হাদীস ও সীরাত চর্চা করেছেন। যেমন এডওয়ার্ড গীবন। তিনি তার রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস গ্রন্থের পঞ্চাশতম অধ্যায়ে ইসলাম সম্পর্কে ভিত্তিহীন কথাবার্তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ দলে আছেন জন ডেভেনপোর্ট। তার বিখ্যাত গ্রন্থ "এ্যান এপোলজি ফর মুহাম্মদ এন্ড দি কুরআন'। দি প্রোফেট অব ইসলাম গ্রন্থের লেখক জন অস্টিন। "স্টাডিজ ইন মুহাম্মদ" এর লেখক জন জে. পল। দি এ্যাওয়াকিং অব এশিয়া"র লেখক হাইন্ডম্যান। আছেন ল্যামারটিনের মতো খ্যাতিমান কিংবা মরিস গোডফ্রয় এর মতো চতুর প্রাচ্যবিদ।

এই শ্রেণিটি অন্য প্রাচ্যবিদদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেছেন। ভ্রান্তির উপর আরো ভ্রান্তির আস্তরণ তৈরী করেছেন। পুরনো আবর্জনা ছড়ানো ছাড়া এদের তেমন কোনো অবদান নেই।

বিপরীতে আছেন আরেকদল প্রাচ্যবিদ, যারা ইসলাম সম্পর্কে গভীরভাবে জেনেছেন। আরবী ভাষা-সাহিত্য ও কুরআন-হাদীসে ব্যাপক পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। কিন্তু সকল বিদ্যাবত্তা ব্যবহার করেছেন উদ্দেশ্যমূলকভাবে। এই শ্রেণির প্রধান হচ্ছেন ইগনায গোল্ডযিহার, স্প্রেঙগার, স্যার উইলিয়াম ম্যুর, আর্নেস্ট রেমান, ডুজি, কজিন ডি পার্সিবাল, মারগোলিয়থ, জর্জ সেল, এজে আরবেরী, আলফ্রেড গিয়োম, ফিলিপ কে হিট্টি, টমাস ডব্লিউ আর্নল্ড প্রমুখ।

এরা অসাধারণ শক্তিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করেছেন। অবিচারকে চেয়েছেন লুকিয়ে রাখতে। বিদ্বেষকে পরিস্কার হতে দিতেন না। সরাসরি আক্রমণে যেতেন না। পাঠক এদের প্রতি সহজে বিরক্ত হন না। একটি স্বাভাবিকতার পরিমণ্ডলে তারা চৈন্তিক রিরংসা উদযাপন করেন। যারা এক্ষেত্রে রাখ-ঢাক করতেন না, তাদের তুলনায় এরা ইসলামের জন্যে ক্ষতিকর।

যারা নিজেদের বিদ্বেষকে সরাসরি প্রকাশ করতেন, তাদের অগ্রগামী হলেন হামফর্স ডিসক, আলেকজান্ডার রস, ক্যামোন, জেন বার্ট, রবার্ট অব কেটন, লুইস মারচি, রিচার্ড সি মার্টিন প্রমুখ।

প্রাচ্যবিদদের যে গৌণ অংশটি দায়িত্বশীল, তাদের কথা স্বীকার করেও আমরা বলতে বাধ্য হই, সাধারণত প্রাচ্যবিদরা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে প্রাচ্যবিদ্যা, বিশেষত ইসলাম চর্চা করেছেন। ফরাসী প্রাচ্যবিদ সেলস্টর সহ অনেকেই সে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। সহজ করে বললে তা হলো গীর্জার প্রকল্প বাস্তবায়ন। সায়্যিদ সবাহ উদ্দীস আবদুর রহমান তার ইসলাম ও মুস্তাশরিকীন (দারুল মুসান্নেফিন, শিবলী একাডেমী, আজমগড়) গ্রন্থে প্রাচ্যবিদদের এমন এক শ্রেণিকে চিহ্নিত করেছেন, গীর্জা যাদেরকে খ্রিস্টিয় প্রকল্প বাস্তবায়নে কাজে

লাগায়। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পরেন। এবং ইসলামের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে মুসলমান হয়ে যান। এ স্তরের এক প্রাচ্যবিদ নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক করার জন্যে নাসির উদ্দীন নাম ধারণ করেন। পরে সীরাতের উপর চমৎকার এক গ্রন্থ লিখেন। আরেক প্রাচ্যবিদ জার্মানুস নিজের নাম রাখেন আবদুল করিম। তিনি ভারতে সক্রিয় ছিলেন। ইসলাম সংক্রান্ত বই লিখেন ১৫০টি। তাদের পরিবর্তিত অবস্থায় রচিত গ্রন্থাবলিতে দেখা যায় সত্যের প্রতি গভীর অঙ্গীকার। তারা যখন উদ্দেশ্য প্রসূতভাবে কাজ করেছেন, তখন দেখা গেছে রচনায় ভিন্ন রূপ।

অন্যসব প্রাচ্যবিদের মতো তারা সারাক্ষণ তালাশ করেছেন কোথাও দুর্বলতা পাওয়া যায় কী না? কোথাও প্রতিষ্ঠিত সত্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায় কী না? কোথায় ভিন্নমাত্রিক ব্যাখ্যার অস্ত্র দিয়ে সুগঠিত কাঠামো ওলটপালট করা যায় কী না?

প্রাচ্যবিদদের মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গি সর্বক্ষেত্রে কার্যকর ছিলো কী না, -বিশ্লেষকরা তা খুজেছেন। কাজের গতি- প্রকৃতির ভিত্তিতে প্রাচ্যবিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক. ব্যাপক দুই. বিশেষ।

ব্যাপক প্রাচ্যবিদ্যা বলতে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রাচ্যের বিভিন্ন জনগোষ্ঠি, তাদের দেশ, ভাষা ও সভ্যতা নিয়ে পশ্চিমা জ্ঞানচর্চা। বিশেষত ভারত, জাপান, চীন ইত্যাদি দেশ ও জাতি নিয়ে তাদের গবেষণা চর্চা। এর চরিত্র মূলত একাডেমিক ও রাজনৈতিক। এর পরিধি গোটা প্রাচ্য। আরবীতে প্রাচ্যবাদকে বলা হয় ইস্তেশরাক। ا - س - ت যুক্ত ক্রিয়াপদ মূলত উক্ত ক্রিয়ার কামনা নির্দেশ করে। ফলে ইস্তেশরাক শব্দের অর্থ দাঁড়ায়- প্রাচ্যকে কামনা করা। শব্দটির ভেতরে অনেক মর্ম জায়গা করে নিয়েছে। প্রাচ্যভ্রমণ, প্রাচ্যবিষয়ক অধ্যয়ন, গবেষণা, পাঠদান, পাঠগ্রহণ থেকে নিয়ে প্রাচ্যে উপনিবেশ তৈরী, দখলদারী ও যুদ্ধ-সংঘাত, সবই ইস্তেশরাক। এটা নিছক কোন শব্দ নয়, পরিভাষা।

ইবনুল মনযুর আফ্রিকী লিখেন, শরক শব্দের অর্থ আলো ও সূর্য। বাবে ইস্তেফআলের ওজনে যখন একে আনা হয়, তখন ا - س - ت বাড়িয়ে ইস্তেশরাক হয়ে যায়। প্রাচ্য যেহেতু আলোর উদয়স্থল, সূর্যোদয়ের মহাদেশ, অতএব, শরক দ্বারা প্রাচ্য বুঝানো হয়। ঠিক তেমনি ইংরেজি Orientalism এর অর্থ যে কোন জিনিসের পূর্ব। এর উৎস– ওরিয়ন শব্দটি সূর্যোদয় ও আলো নির্দেশ করে। Orient শব্দটি পূর্ব অর্থ দেয়। যদি ও East অর্থও পূর্ব, কিন্তু তা ব্যাপকভাবে যে কোন জিনিসের পূর্ব দিক বুঝায়। আর Orient শব্দের ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইউরোপ ও রোম সাগরের পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে হয়। যা

সূর্যোদয়ের মহাদেশ। প্রাচ্য। অতএব লক্ষ্য ঠিক করেই প্রাচ্যবাদকে ইংরেজীতে Orientalism বলা হয়। যা নির্দিষ্ট এক ভূগোলকে চিহ্নিত করে।

কিন্তু ডক্টর ফয়সাল বিন খালিদ প্রশ্ন তুলেছেন– দিকনির্ভর কোনো ভূগোলের নিজস্ব অস্তিত্ব আছে কি? কারণ নির্ধারকের অবস্থান অনুযায়ী তা নির্ধারিত হয়। জার্মানে অবস্থিত একজনের কাছে যেটা প্রাচ্য, জাপানে অবস্থানকারীর কাছে সেটা প্রাচ্য নয়। অতএব, ফয়সালের প্রস্তাব 'পরিভাষাটির বিচার করতে হবে ঐতিহাসিকভাবে'। ঐতিহাসিকভাবে প্রাচ্য চর্চায় ইহুদী ও খ্রিস্টধর্ম প্রধান গুরুত্বের দাবিদার। কারণ ধর্ম দু'টির উদ্ভব প্রতীচ্যের নয়, প্রাচ্যে। ভবিষ্যতের সবকিছু প্রাচ্যে ঘটবে- জানায় ধর্ম দু'টি। কিন্তু প্রাচ্যবিদরা একে কখনো মনোযোগের বিষয় মনে করেননি। তারা তাদের দৃষ্টি ও শ্রম নিবদ্ধ রেখেছেন অন্যান্য ধর্ম, বিশেষত ইসলামের প্রতি। যখনই ইহুদী বা খ্রিস্টধর্ম উচ্চারিত হয়েছে, মাহাত্ম ও প্রভাব দেখানোর প্রয়োজনে হয়েছে।

এর মানে পরিভাষাটির বিচার ঐতিহাসিকভাবেও করা যাচ্ছে না নিরঙ্কুশভাবে। বরং ইতিহাসের বিশেষ এক প্রবাহ, খ্রিস্ট ও ইহুদী ধর্মানুসারী পশ্চিমাদের চোখে প্রা[illegible] অপরাপর ধর্ম ও জাতিকে অবলোকনের যে ইতিহাস সেটাই মুখ্য হয়ে উঠেছে।

প্রাচ্যবাদের বিশেষ ধারাটি আরব ও ইসলামকেন্দ্রিক। প্রাচ্যবিদরা যা কিছু লিখেছেন, এর নব্বই ভাগ মূলত এই ধারাভূক্ত। তারা সর্বাধিক মনোযোগ দিয়েছেন প্রাচ্যের এই বিশেষ অংশের প্রতি। এ নিয়ে তারা গবেষণার যে বিশাল জগত সৃষ্টি করেছেন, সেটাই মূলত প্রশ্নবিদ্ধ। বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত। ডক্টর ফয়সাল বিন খালিদ তার আল ইস্তেশরাক : ইস্তেলাহ ওয়াদ দালায়ীল গ্রন্থে লিখেন– "এই বিশেষ ধারার গ্রন্থাবলি পড়লে দেখা যায় নিছক জ্ঞানের আগ্রহ বা অন্য কোনো সদিচ্ছা নিয়ে কাজটি তারা করেননি। শুরুতেই নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। বর্তমানে ইসলাম সম্পর্কে অধিকাংশ ভুল, বিকৃত ও ধ্বংসাত্মক ধারণার জন্ম এই প্রাচ্যবিদ্যার উদরে।"

সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নাদাবী তাদের কাজের ধরণ ব্যাখ্যা করেছেন- "তারা তাদের সকল যোগ্যতাকে যৌক্তিক ও অযৌক্তিকভাবে ব্যয় করেন দুর্বলতা তালাশে এবং তাকে ভয়ালরূপে উপস্থাপনে। তারা দেখেন অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে, দেখান দুরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা। সরিষাকে পর্বত বানানো তাদের কাছে নগণ্য। এ কাজে তারা এতো চতুর, কৌশলী ও ধৈর্যশীল- যার উদাহরণ পাওয়া কঠিন। প্রথমেই তারা একটি উদ্দেশ্য ঠিক করে নেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখেন যে- একে প্রমাণিত করতে হবে। তারপর লক্ষ্য হাসিলের উপকরণ জোগাড়ে নেমে

পড়েন। সর্বপ্রকার ভালো-মন্দ-ধর্মে-ইতিহাসে, কবিতায়-গল্পে; কৃত্রিম-অকৃত্রিম উৎস হতে উপকরণ জড়ো করেন। যা কিছু তাদের লক্ষ্যকে সুগম করবে। উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়তা করবে। হোক সেগুলো অশুদ্ধ, মনদ হোক দূর্বল, হোক সন্দেহযুক্ত কিংবা একেবারেই মূল্যহীন। এগুলো উপস্থাপন করেন বড় দীপ্তি ও দীপ্রতার সাথে। এগুলো বিন্যাসিত করেন এবং কল্পিত বিষয়ে পূর্ণ এক কাঠামো তৈরী করেন। যার পূর্ব অস্তিত্ব কেবল তাদের পরিকল্পনায় বিরাজমান।

তারা প্রায়ই একটি মন্দ দিক বর্ণনা করেন। তাকে মস্তিষ্কে গেঁথে দেয়ার জন্যে উদারতার সাথে আলোচ্য বিষয় বা ব্যক্তির দশটি ভালো দিক বর্ণনা করেন। পাঠক যাতে তার বিচারক্ষমতা, মানসিক প্রশস্ততা এবং নিরপেক্ষতা অনুমান করে নেয়। আর এর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এমন এক মন্দ দিককে গ্রহণ করে নেয়, যা দশটি ভালো দিকের বিনাশ নিশ্চিত করে।

তারা কোনো ব্যক্তিত্ব বা দাওয়াতের পরিবেশে, ঐতিহাসিক চিত্রে, প্রাকৃতিক দৃশ্যে, স্বাভাবিক কাজ ও উদ্দেশ্যের দৃশ্যাবলি এতো সুন্দর ও বিজ্ঞ কলমে অঙ্কন করেন, তা নিরেট কাল্পনিক হলেও পাঠকমন একে গ্রহণ করে নেয়। ফলে তারা ঐ ব্যক্তিত্ব ও দাওয়াতকে সেই পরিবেশের স্বাভাবিক পরিণাম ও অনিবার্য ফলাফল হিসেবে বুঝে এবং ভাবে। তার শ্রেষ্ঠত্ব, পবিত্রতা এবং অপর কোনো অবিনশ্বর সত্তার সাথে তার সংযোগ ও সম্পর্ক অস্বীকৃতির ধারণা পেশ করে। সাধারণত প্রাচ্যবিদরা তাদের রচনায় বিষের পরিমাণ 'পরিমিত' মাত্রায় রাখেন। এ থেকে কম যাতে না হয়, খেয়াল রাখেন। আবার এত বেশি যেনো না হয়, যা পাঠকের মনে ঘৃণা, বিরক্তি ও সন্দেহ সৃষ্টি করবে। এমতাবস্থায় তাদের রচনাবলি খুবই বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত। একজন মধ্যম পর্যায়ের শিক্ষিত লোকের জন্যে এই বিষের প্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়া দুস্কর হয়ে যায়। এবং বলতে গেলে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।"

"প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থাবলি ও প্রবন্ধরাজীতে এতো সন্দিগ্ধ তথ্য পাওয়া যায়, যা ইসলাম সম্পর্কে প্রশস্ত ও গভীর জ্ঞান থেকে বঞ্চিত যে কোন বুদ্ধিমান ও অনুভূতি সম্পন্ন মানুষকে ইসলাম থেকে একেবারে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে যথেষ্ট।" (ইসলামী মামালিকউ মে মাগরিবিয়াত কা কাশমাকাশ)

ডক্টর মোস্তফা আস সাবায়ী তার 'আসসুন্নাতু ওয়া মাকানাতুহা ফিত তাশরিঈল ইসলাম' গ্রন্থে তাদের কাজের বৈশিষ্ট চিহ্নিত করেন।

এক. তারা চায়, ইসলামের একান্ত মৌলিক বিষয়সমূহে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার সৃষ্টি।

দুই. তারা চেষ্টা করে, মুসলিম নেতৃত্ব, সর্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব, উলামা ও শাসকদের সম্পর্কে নৈতিবাচক ভাবধারা তৈরীর।

তিন. তারা অঙ্কণ করে, ইসলামী সোনালী যুগে মুসলমানদের আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার কাল্পনিক চিত্র। অন্যান্য যুগের মুসলিম সমাজকেও ইচ্ছেমতো চিত্রিত করে। সে দিকে তাকালে গোলযোগ আর বিশৃঙ্খলা ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। এ সব যুগের মহাত্মাদের ব্যক্তিত্বকে অপচরিত্রে উপস্থাপন করে বিশ্বস্ততার বুনিয়াদ ধ্বসিয়ে দিতে চায়।

চার. তারা বিচার করে ইসলামী সমাজকে ইউরোপীয় সমাজ ও প্রকৃতির আলোকে। এ বিচারের ভিত্তিতে দাঁড় করায় আজগুবি সব ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

পাঁচ. তারা সুযোগ খুজে কুরআন-হাদীসের অর্থ পাল্টে দেয়ার জন্যে। যেখানে সুযোগ নেই, সেখানে আয়াত হাদীসে শব্দ বাড়ায়-কমায়। ভ্রান্তিপূর্ণ এলাকায় নিয়ে যায় অর্থকে

ছয়. তারা হঠকারিতা করে সূত্র অবলম্বনে। যথাস্থান থেকে দলীল না নিয়ে এক বিষয়ের দলীল অন্য বিষয়ে প্রয়োগ করে। যথাযত উৎসে বর্ণিত দলীল এড়িয়ে যায়। সাহিত্যের বই থেকে উদ্বৃতি এনে বিচার করে হাদীসকে। ইতিহাসগ্রন্থের উদ্বৃতি এনে বিশ্লেষণ করে ফেকাহকে।

যে কোন বিচারে এসব তৎপরতা অন্যায্য ও বুদ্ধিবৃত্তিক অপরাধ। যে কোন শাস্ত্রের নির্ধারিত নীতিমালা ও পরিভাষা অবলম্বন করে বিশ্লেষণই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত ও গ্রহণযোগ্য পন্থা। অন্য ক্ষেত্রে এ পন্থা অবলম্বন করলেও ইসলাম প্রশ্নে তারা এ নীতির ধার ধারেনি। তারা বরং ইসলামী সমাজকে ভেতর থেকে পাল্টে দিতে চেয়েছে। এবং মুসলিম তরুণদের সব পথ ধরে বিদ্রোহের উস্কানী দিয়েছে। ইসলামের ধর্মীয় চিন্তাধারাকে হাস্যকর বিষয়ে পরিণতি করতে চেয়েছে। মূল্যবোধসমূহকে তাচ্ছিল্য করার সকল পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। ইসলামী শিক্ষার এমন ব্যাখ্যা দাড় করিয়েছে, যা তাকে নিছক বাতুলতা হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসলামী সংস্কৃতিকে এমনভাবে চিত্রিত করেছে, যা অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত। যা গোটা সংস্কৃতিকে মধ্যযুগীয় আচরণ হিসেবে অভিহিত করে। তারা নানা প্রক্রিয়ায় চেয়েছে ইসলামের সাথে তাদের পাঠকদের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাক। পাঠকরা তাদের ধর্মের সত্যতায় সন্ধিগ্ধ হয়ে যাক। তারা বুঝুক তাদের ধর্ম জীবনের অগ্রগামীতার সহায়ক নয়। উন্নয়নের যাত্রাসঙ্গী নয়। যুগের অনুকূল নয়। প্রগতির সহযোগি নয়। এমনকি মানবস্বভাবের সহযাত্রী নয়।

তারা আরো অগ্রসর হয়ে মুসলিম জাতির শক্তি ও সম্ভাবনার কেন্দ্রভূমি চিহ্নিত করেছে এবং সেখানে বিপর্যয় ঘটাতে প্রয়াসী হয়েছে। জার্মান প্রাচ্যবিদ পোল

শ্যামটের জবানীতে প্রকাশ হয়ে গেছে সেই সূত্র। তিনি বলেন– তিনটি বিষয় হচ্ছে মুসলমানদের শক্তি ও সম্ভাবনার প্রাণ। প্রথমতঃ ইসলাম :- তার আকিদা ও চারিত্রিক নীতিমালা। তা থেকে উদ্ভূত সংস্কৃতি। বিভিন্ন বংশ, বর্ণ, গোত্র ও প্রথার সাথে সম্পর্কিত মানুষকে ঐব্যবদ্ধ করার অপরিমেয় ক্ষমতা। এর ফলে তৈরী হওয়া মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য।

দ্বিতীয়তঃ মুসলিম দেশসমূহের প্রাকৃতিক উপাদান :- যা পৃথিবীর বৃহৎ এক শক্তিকেন্দ্র। বিপুল সম্ভাবনা, মান ও পরিমাণে যা যে কোন জাতির প্রাকৃতিক উপাদানকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম।

তৃতীয়তঃ মুসলমানদের ক্রমবর্ধর্বমান সংখ্যা শক্তি :- যা খ্রিস্টিয় জনসংখ্যার কাছাকাছি যা বর্ধিষ্ণু। অপ্রতিরোধ্য। বিশেষত ইউরোপ আমেরিকায়। নওমুসলিমদের সংখ্যা সত্যিই আশঙ্কাজনক।

পোল শ্যামট লিখেন– "যদি এই তিন শক্তি একত্রিত হয় যায়, সব বিরোধ পেছনে ফেলে মুসলিমরা ভাই ভাই হয়ে যায়, নিজেদের প্রাকৃতিক উপকরণসমূহকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে শুরু করে, মুসলিম জনসংখ্যার বর্ধিষ্ণুতাকে ধরে রাখতে পারে, তাহলে ইসলাম এমন এক ভয়ানক শক্তিতে পরিণত হবে, যা ইউরোপের ধ্বংসের কারণ হবে। গোটা বিশ্বের নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে চলে যাবার আশংকা তৈরী হবে। (আল ইস্তেশরাক : সায়্যিদ মুহাম্মদ শহীদ)

বিশেষ পর্যায়ের প্রাচ্যবাদ এখন মুসলিম বিশ্বের এই তিন শক্তিকে হত্যা করার বৌদ্ধিক কাচামাল সরবরাহ করছে। ইসলাম যাতে আসল অবয়বে টিকে থাকতে না পারে, মুসলিমরা যাতে ঐক্যবদ্ধ হতে না পারে, এবং মুসলিমদের সংখ্যাশক্তি যাতে প্রাণহীন পরিসংখ্যানে পরিণত হয়- সে জন্যে জ্ঞান ও শাস্ত্র চর্চার আড়ালে তারা তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচ্যবাদের ঐতিহাসিক পরিক্রমায় এ এক ধ্বংসাত্মক পর্যায়। যেখানে সাম্প্রদায়িকতা, সাম্রাজ্যবাদী লুটমার ও হিংসামত্ত ক্রুসেডীয় মানসিকতার পুরনো খাসলতকে বিশ্বায়ন ও সভ্যতার সংঘাতের মোড়কে উপস্থাপন করছে প্রাচ্যবাদ। আর এর ফাক দিয়ে মুসলিম দুনিয়ার সকল ইতিবাচক সামর্থকে ধ্বংশ করার যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। আফগান, ইরাকসহ বহু সংখ্যক বর্বর যুদ্ধ ও গণহত্যার পেছনে তার বুদ্ধিবৃত্তিক প্ররোচনা সক্রিয় ছিলো।

এডওয়ার্ড সাঈদের ওরিয়েন্টালিজম প্রাচ্যবাদকে যে ঝাঁকুনি দেয়, তা সামলে নেয়ার আগে ভাগে তার মধ্যে নিহিত অমানবিক চিন্তা কাঠামোর গ্রন্থিগুলো খুলে যেতে থাকে। আধুনিক শিক্ষিত একশ্রেণীর সচেতন নিষ্ঠাবান মুসলিম তার গায়ে

চাপানো সবগুলো ভাওতার পর্দা খুলে ফেলেন। ঐতিহ্যবাদী আদের চিন্তানায়করা তাকে পূর্ব থেকেই প্রকৃত অবয়বে প্রত্যক্ষ করছিলেন। করাচ্ছিলেন। সহসা প্রাচ্যবাদ দেখলো ধরা পড়ে যাচ্ছে। অতএব পরিস্থিতির প্রয়োজনে সে নিজেকে কখনো এরিয়া স্টাডিজ, কখনো মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা ইত্যাদি মুখোশে উপস্থাপন করছে। বহু প্রাচ্যবিদ এখন নিজেকে ওরিয়েন্টালিস্ট পরিচয়ে উপস্থাপণে বিব্রতবোধ করেন। মধ্যপ্রাচ্য গবেষক হিসেবে ভাবতে স্বস্তি পান। পশ্চিমা মিডিয়া তাদেরকে মিডল ইস্ট স্প্যাশালিস্ট হিসেবে প্রচার করতে লাগলো। এখন চলছে তাদের পুরনো দেহে নতুন পোশাক চড়াবার তোড়জোড়।

বিশেষজ্ঞদের উদ্ধৃতি নিয়ে সায়্যিদ সবাহ উদ্দীন আবদুর রহমান প্রাচ্যবিদদের অনেকগুলো পর্যায়ে চিহ্নিত করেন। প্রথম পর্যায় হচ্ছে সাধারণ ও স্বাভাবিক। পশ্চিমা পণ্ডিতরা বাণিজ্যিক সম্পর্কের সূত্রে প্রাচ্যে প্রবেশ করেন। ইসলাম সম্পর্কে তখন কোনো অবগতি ছিলো না। এ পর্যায়ের সূত্রপাত হয় খ্রিস্টিয় ছয় শতকে শুরু করেন হেরোডটাস নামক এক ঐতিহাসিক। পাশ্চাত্য ইতিহাসের জনক বলা হয় তাকে। তিনি ভ্রমণ করেন ইরাক, সিরিয়া, মিসর ও আরব উপদ্বীপ। স্বীয় ভ্রমণ বৃত্তান্তে এই সব দেশের চিত্র, বাণিজ্য প্রক্রিয়া, প্রথাগত বিষয়াবলি, সাধারণ মানুষের জীবনযাপন ইত্যাদি নিয়ে গভীর আলোচনা করেন। খ্রিস্টিয় পনেরো শতকে তার সফরনামা প্রকাশিত হয় বড় আকারের গ্রন্থরূপে। তার রচনায় প্রাচ্যবিদদের বহু প্রবণতা, মানসিকতা ও ভাবধারার উৎস নিহত আছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে : এ পর্যায়ে প্রাচ্যবিদরা ইসলাম সম্পর্কে জেনে গেছেন। হুজুর সা. ইসলামের দাওয়াত পৌছে দিয়েছেন সকল ধর্ম, মতাদর্শ ও দেশের সীমানায়। ফলে ইহুদী-খ্রিস্টানরা দলগত ও ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম অঞ্চলে প্রবেশ করেন। উদ্দেশ্য দ্বীন ও নবীকে যাচাই করা। এদের কেউ কেউ ইসলাম কবূল করে নেন। কেউ কেউ দেশে ফিরে ইসলাম এর বিবরণ পেশ করতেন। তাদের পণ্ডিত ও রাজন্যবর্গকে অবগতি দিতেন। এ পর্যায়ের প্রাচ্যবিদরা সাধারণত ইসলামের তথ্যাবলী পেশ করতেন। বড় জোর নিজের মতামত উপস্থাপন করতেন। ফলে কেউ মুসলমান হতেন। কেউ একে প্রত্যাখান করতেন। এ পর্যায়ের সূচনা হুজুর সা. এর নবুওয়ত প্রাপ্তির পর থেকে।

তৃতীয় পর্যায় : এ পর্যায়ের শুরু খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে। এই স্তরে প্রাচ্যবিদরা ইসলামের সমালোচনা শুরু করেন। বিভ্রান্তিকর মর্ম বর্ণনা শুরু হয়ে যায়। বিকৃতির প্রবণতা ও দেখা দেয়। এ পর্বের প্রধান পুরুষ ইউহান্না দামেশকী। অষ্টম শতকে বনু উমাইয়ার দরবারে কর্মচারি ছিলো সে। সে হচ্ছে প্রথম

খ্রিস্টান, যে পরিকল্পিতভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে চিন্তাপদ্ধতি প্রবর্তন করে। রূপরেখা দাঁড় করায়। গ্রন্থ রচনা করে। তার রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ হলো মুহাওয়ারাতু মায়াল মুসলিমীন (মুসলমানদের সাথে সংলাপ) ইরশাদাতুন নাসারা ইলা জাদলিল মুসালিমীন। (মুসলিম বিরোধি বিতর্কে খ্রিস্টানদের দিকনির্দেশ) আরেক ব্যক্তি হলো সেউফাস উবযানসি। সে লিখে হুজুর সা. এর বিকৃত জীবনী। দাবী করে তিনি সা. নবী নন। ইসলামের শিক্ষাগুলো অর্জন করেছেন সিরিয়ার খ্রিস্টানদের কাছ থেকে। এ পর্যায়ে প্রাচ্যবাদ অসহিষ্ণু, কপট ও মিথ্যাচারি হয়ে উঠে।

চতুর্থ পর্যায় : এ পর্যায়ে প্রাচ্যবাদ জটিল এলাকায় প্রবেশ করে। ইউরোপ ও মুসলিম দ্বন্দ্বের উত্তাপে তপ্ত হয়। গবেষকদের পর্যবেক্ষণ- পয়লা পাঁচ শতকে ইসলামের দাওয়াতে প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমানে সাড়া দিয়েছে। ইসলামে প্রবেশ করেছে বিপুল মাত্রায়। ইসলামী আকিদার বলিষ্ঠ দলিল তাদের সামনে উপস্থাপিত হচ্ছিলো। জীবনের চাহিদা ও সামাজিক সকল প্রয়োজনে ইসলামের অপরিহার্যতা তাদেরকে বুঝানো হচ্ছিলো। হুজুর সা. এর সত্যিকার অনুসারীদের দৃষ্টান্ত চোখের সামনে ছিলো। খ্রিস্টানরা কোথাও আতংকবোধ করছিলো না।

কিন্তু মুসলিম বিজয় যখন স্পেন অধিকার করলো, পোপ ও গীর্জার পুরোহিতদের প্রভুত্বের পৃথিবী সংকোচিত হলো। তারা আতংকিত হলো। ইসলামকে নিজেদের কর্তৃত্বের প্রধান প্রতিপক্ষ হিসেবে ভাবলো। অতএব শুরু করলো যাচ্ছে তাই বিরোধিতা। ইসলাম সম্পর্কে বিরূপ অভিমত।

কিন্তু ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানগত দৈন্যের কারণে তাদের বিরোধিতা এক ধরনের প্রলাপে পর্যবসিত হয়। এতে তারা সুবিধা করতে না পেরে অস্ত্রের লড়াই জোরদার করে। তারাই তৈরী করে দশম শতকের ক্রুসেড। তারাই স্পেন থেকে মুসলিম সভ্যতাকে নির্বাসিত করে ইসলামী সভ্যতার অগ্রযাত্রা আপাতত থামায়। খ্রিস্টবিশ্বকে উম্মাদ করে তুলে উত্তেজনায়। দুইশত বছরেও ক্রুসেডকে থামতে দেযনি তারা। বরং তার অভিমুখ আফ্রিকায় ইসলামী জনপদসমূহের প্রতি ধাবিত হয় সেখানে খুলে দেয় আরেক যুদ্ধফ্রন্ট। এ যুদ্ধ ছিলো ভয়াবহও সর্বাত্মক। এ যুদ্ধ সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত আছে। এর অন্যতম হলো ডক্টর মামদূহ হুসাইনের "আল হরবুস সলিবিয়্যা ফি সিমালি আফ্রিকিয়্যা" ও "আল ইস্তেশরাক।"

পঞ্চম পর্যায় : ক্রুসেডের পরে। অস্ত্র ও যুদ্ধ দিয়ে ইসলামকে হারানো গেলো না। ক্রুসেডারও তাদের বংশধররা ইসলাম নিয়ে নবউদ্যমে শুরু করলো গবেষণা। এগিয়ে এলো ফরাসী পাদ্রী পিটার। বাল্যকালেই তাকে ধর্মের জন্যে ওয়াকফ করে দেয়া হয়। ১৭ বছর বয়সে চরমপন্থী পাদ্রী হকস এর কাছে

খ্রিস্টিয় পূণর্জন্ম গ্রহণ করে। গ্রহণ করে অধ্যাত্মিক দীক্ষা। বহু বছর এতে থাকে নিয়োজিত। ৩০ বছর বয়সে প্রধান হয় ফ্রান্সের ক্যালোনি গীর্জার। সেখানে কুরআন, হাদীস চর্চার নতুন উদ্যম সৃষ্টি হলো। বহু গ্রন্থ রচিত হলো। যা চরম বিকৃত ও বিদ্বেষবিষাক্ত। এ উদ্যম ছড়ালো গীর্জায় গীর্জায় খ্রিস্টিয় জগত শক্তি নিয়োজিত করলো জ্ঞানগত যুদ্ধে।

ষষ্ঠ পর্যায় :- এখন ওরা ইসলামী জ্ঞান ও সভ্যতাকে ইউরোপীয়করণ শুরু করলো। খ্রিস্ট্রিয় ত্রয়োদশ শতকে এ ধারা প্রানাবেগ পেলো। অন্ধকার থেকে গা ঝাড়া দিয়ে ওরা জাগতে থাকলো। সর্বপ্রথম জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন-ইতিহাস, ইউরোপে নিয়ে যেতে থাকলো। মুসলিম জাহানে খ্রিস্টান পণ্ডিতরা আসতে থাকলো দলে দলে। বিভিন্ন মুসলিম দেশের লাইব্রেরীসমূহে তারা জীবনপাত করতে লাগলো। অসংখ্য গ্রন্থ অনুবাদ করলো। ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতির একটি গ্রন্থও বাদ রাখলো না। মুসলিম গ্রন্থাগারসমূহে তখন মুসলিমদের সংখ্যা কমছিলো। কিন্তু অপরিচিত বিদেশী "মেহমানদের" আনাগোনা বাড়ছিলো। সেখান থেকে প্রাচ্যবিদ্যা প্রাজ্ঞ হতে থাকলো। স্পেনের গ্রন্থাগারসমূহ থেকে ফরাসী প্রাচ্যবিদ্যা দুগ্ধপোষ্য শিশুর মতো পান করতে লাগলো। স্পেন থেকেই ফরাসী শিল্প-সাহিত্য ও সমৃদ্ধির ভ্রূণ নির্মিত হলো। সেখান থেকে ব্রিটেন জার্মানী পর্যন্ত নবজীবনের ডাক ছড়িয়ে পড়লো। বরাবর মুসলিমদের গ্রন্থাগারসমূহ ফরাসী ও ফ্রাঙ্করা ব্যবহার করতে থাকলো। রাশিয়ায় প্রাচ্যবিদ্যা ভিত্তিপ্রাপ্ত হলো শাহ আব্বাস কবিরের লাইব্রেরী থেকে। ওয়েসলি বিলাদম্যুর স্বীকার করেছেন– কবির সে দেশে উন্নতির এমন শিখরে ছিলেন, যার কোনো তুলনা হয় না। তার উন্নতি ছিলো সর্বব্যাপ্ত। তার জ্ঞান-গরিমার নিদর্শন আজও ছড়িয়ে আছে রুশ জীবনে।

সপ্তম পর্যায় : এ পর্যায়ে গণজীবনে ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার প্রসার ও আত্মস্থকরণ শুরু হলো। এগিয়ে এলেন ইতালীর বতিস্তুতা। বিচ্ছিন্ন আরবী অক্ষরগুলোকে বিন্যসিত করে ছাপাখানা দাঁড় করালো। অনবরত প্রকাশ হতে থাকলো আরবী গ্রন্থাবলি। চতুর্দশ শতকে এ প্রক্রিয়া স্রোতাবেগ পেলো। এ সময়ে উত্থান ঘটে চরম ইসলাম বিদ্বেষী লুডভিকো ডি ভার্থিমার। ১৪৭০ সালে তার জন্ম হয়। সে আরবী জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যাদু বলে প্রচার করলেও ইসলামকে বিকৃত করার জন্যে তা শেখার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করতো। এ পর্যায়ে ব্রিটেনেও ছাপাখানা দেখা যাচ্ছে। সেখান থেকে মূলত ইসলাম বিষয়ক গ্রন্থাবলি প্রকাশ হচ্ছে। সেগুলো পাঠ করছে খ্রিস্টান ইউরোপ। এসব গ্রন্থ নির্বাচিত। অধিকাংশই অগ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম নবভীর ফসলুল খেতাব। এরপর গীর্জা

ইসলামের ব্যাখ্যা দেবে। সেখানে ইসলাম নিয়ে নিরন্তন গবেষণা হবে। ইসলামী গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি দিয়ে পাদ্রীরা কথা বলবে। আরবী থেকে অনূদিত গ্রন্থাবলির ভূমিকা লেখবে পাদ্রীরা। ভূমিকায় একবার গ্রন্থটিকে হত্যা করবে। অনুবাদে থাকবে বিকৃতি ও পরিবর্তন। টিকা লেখা হবে চরম হাস্যকরভাবে।

মুসলমানদের কল্যাণকর গ্রন্থাবলি দ্বারা তারা নিজেদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন পূর্নগঠন করবে। কৌশলগত উপকার অর্জন করবে। ধর্মীয় বিষয়াবলিকে ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করে মুসলিম জীবনে বিরোধ উস্কে দিতে চাইবে। কুরআনের কেরাত, ফিকহী মাযহাব, সুফিবাদী তরিকা ইত্যাদি নিয়ে ইন্ধন যোগাবে। ধর্মীয় গ্রন্থাবলির বিপরীতমুখী ভাষ্যসমূহকে বিশালাকারে উপস্থাপন করবে। চাইবে এসব নিয়ে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করুক। আলেম ছদ্মবেশে তাদের বহু গুপ্তচর মুসলিম বিশ্বে অনুপ্রবেশ করতে থাকবে। এরা প্রশিক্ষিত ও আরবী ভাষায় বিদগ্ধ। নানা কৌশলে এরা গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় আসন আধিকার করবে। এ সব চিন্তাধারা মুসলিম জীবনে ছড়াতে থাকবে। মুসলিম মানসের ধর্মীয় প্রেরণাকে সংকীর্ণ ফেরকাবাযীর বৃত্তে আবদ্ধ করে দেবে। ধর্মের এমন ব্যাখ্যা পেশ করবে, যা তাদেরকে চৈন্তিক স্থবিরতা, মানসিক নিশ্চয়তা ও কর্মহীন পরজীবিতার দিকে ঠেলে দেয়। তারপর এক সময় আসবে, দেখা যাবে মুসলমনরা সময়ের কর্তব্য ভুলে যাচ্ছে। বৃহৎ দায়িত্বকে অবজ্ঞা করে ক্ষুদ্র বিষয় নিয়ে মেতে আছে। জাতীয় নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধির ভাবনাকে পেছনে ফেলে ঝগড়া করছে টুপির ডিজাইন নিয়ে।

অষ্টম পর্যায় : এবার প্রাচ্যবাদ প্রতিষ্ঠানিকরূপ পেলো। ক্যামব্রিজ, অক্সফোর্ড, ভিয়েনা, প্যারিস ইত্যাদিতে তা শাস্ত্রীয় কাঠামো অর্জন করলো। এখন নেতৃত্বে আছেন পণ্ডিতবর্গ, অধ্যাপকবৃন্দ ও বিশেষজ্ঞগণ। এখন তা ভৌগলিক সাংস্কৃতিক ভাষাতাত্তিক ও জাতিগত অধ্যয়ন ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। ধাপে ধাপে দেখা যাবে পণ্ডিতী বিশেষীকরণ। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ততক্ষণে ভারত দখল করে নিয়েছে। ফরাসীরা দখল করে নেবে সাইপ্রাস। ১৮৩০ সাল থেকে নিয়ে ৭০ বছর নিজেদের হাতে রাখবে। ইতালীর হাতে চলে যাবে লিবিয়া। এ সময়ে ইউরোপীয়রা স্রোতের মতো মুসলিম বিশ্বে প্রবেশ করে। প্রতিষ্ঠা করে তাদের ভাষাও সংস্কৃতির কর্তত্ব। মুসলিম বিশ্ব প্রাণশক্তি হারিয়েছে আগেই। তাদের হাতেই এখন সব কিছু। মুসলমানদের শিক্ষার প্রয়োজন পূরণে তাদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে। এমনকি ইসলামী শিক্ষার জন্যেও। ভারতের কথাই ধরুন। ব্রিটিশদের কাছে মুসলমানরা আবেদন করলেন একটি মাদ্রাসার জন্যে। কলকাতায় তৈরী হলো আলিয়া মাদ্রাসা।। এতে কী শেখানো হবে, তারা

নির্ধারণ করে দিলো। কীভাবে শেখানো হবে, তারা স্থির করে দিলো। প্রতিষ্ঠানটি তৈরী হলো মুসলমানদের ধর্মীয় প্রয়োজনে (যদিও ফার্সী জানা কেরানী তৈরীর উদ্দেশ্যে ছিলো ব্রিটিশদের) কিন্তু এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন একজন প্রাচ্যবিদ। ডক্টর স্প্রেংগার। তারপর মুসলিম ছাত্রদের ইসলাম শেখানোর জন্যে একে একে অধ্যক্ষ হলেন– ২. উইলিয়াম (১৮৭০) ৩. জে. স্যাটক্লিকে (১৮৭৩) ৪. এইচ. এম ব্রকম্যান (১৮৭৩) ৫. এ.ই. গাফ (১৮৭৮ ৬. এফ. আর হোর্নেল (১৮৮১) ৭. এইচ প্রথেরো (১৮৯০) ৮. এ এফ হোর্নেল (১৮৯১) ৯. এফ.জে রো (১৮৯১) ১০. এ. এফ হোর্নেল (১৮৯২) ১১. এফ জে রো (১৮৯৫) ১২. এ এফ হোর্নেল (১৮৯৭) ১৩. এফ.জে রো (১৮৯৮ ১৪. এফ.সি হল (১৮৯৯) ১৫. অরাল স্ট্যাইন (১৮৯৯) ১৬. এইচ. স্টার্ক (১৯০০) ১৭. কর্নেল জি এস এ (১৯০০) ১৮. এইচ এ স্টার্ক (১৯০১) ১৯. ডেনিসন রাস (১৯০৩) ২০. এইচ. ই স্টেপেল্টন (১৯০৩) ২১. ডেনিসর রাস (১৯০৪) ২২. এম. চীফম্যান (১৯০৭) ২৩. ডেনিসন রাস (১৯০৮) ২৪. এ ইচ হারলি (১৯১১) ২৫. জে. এম. ব্রটামলি (১৯২৩) ২৬. এ এইচ হার্টি (১৯২৫)

মিসর লিবিয়া, মরক্কো, সুদানসহ মুসলিম জাহানে প্রাচ্যবাদ আবির্ভূত হলো মুসলিমদের শিক্ষকরূপে। কখনো সে ইসলামের পাঠদাতা, কখনো গবেষক। কখনো গ্রন্থকার, কখনো বিশ্লেষক। তাদের বিশ্লেষণ বরিত হলো, বিশেষ মুসলিম মহলে। আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণিকে তারা নিজেদের আওতায় নিতে চাইলো। প্রথাগত মূলধারার ইসলামী চিন্তাবিদদের গোড়া, প্রতিক্রিয়াশীল পরান্নভোগী হিসেবে চিত্রিত করা হলো। মুল্লা শব্দকে তাচ্ছিল্যের অর্থে ব্যবহার করা হলো। দেশে দেশে তাদের শাগরেদ ও অনুসারীদের বাহিনী তৈরী হলো। দাসত্বের মানসিকতা মুসলিম জাহানে চেপে বসলো। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দাস্যবৃত্তি গভীর প্রভাব ফেললো। পশ্চিমা শিক্ষা-সংস্কৃতিকে জীবন ও মনে সমাসীন করে এক শ্রেণির মুসলিম তাদের হাতে বিন্যসিত ইসলামের মধ্যে আধুনিক ইসলাম আবিস্কার করলো। তাদের রচনা, চিন্তা-চেতনা ও অনুভব-অনুভাবকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিলো। এর প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠার নিবেদিত হলো।

এক্ষেত্রে বাধা ছিলো শত আঘাতে জর্জরিত ইসলামী শিক্ষাধারার অবশিষ্ট এবং জীবনের সর্বস্ব দিয়ে তার গতিরক্ষায় নিবেদিত উলামা সমাজ। তাদেরকে ওরা বিনাবাক্যে বর্জন করলো। তাদের বিরুদ্ধে রণধ্বনি উচ্চারণ করলো। তাদেরকে ইসলামের দখলদার আখ্যায়িত করলো। বুদ্ধিবৃত্তিক রণাঙ্গণে বারবার তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করলো। বিপুল নিনাদে উচ্চরিত এই চ্যালেঞ্জ খুব কমই উপযুক্ত জবাবের মুখোমুখি হয়েছে। ফলে তার ধারাবাহিকতা তৈরী হলো এবং জ্ঞান ও চিন্তার নানা দিগন্তে এর প্রতিধ্বনি শোনা গেলো। এক পর্যায়ে তারা নিজেদের

বিজয়ী বলে ধরে নিলো। কিন্তু সহসা তাদের বিজয় ভাবনা আহত হয়েছে কোনো না কোনো আলেম চিন্তানায়কের প্রত্যাঘাতে। কিন্তু এর প্রভাবকে নস্যাত করে দেয়ার অজস্র উপাদান তাদের ছিলো। বিশেষত বিপরীত দিক থেকে সংগঠিত সংকীর্ণ, হঠকারী ও অপরিণামদর্শী বিভিন্ন তৎপরতা তাদেরকে শক্তি যোগিয়েছে।

শক্তি প্রদর্শনের ময়দানকে তারা আবারো প্রকম্পিত করেছে।

এ পর্যায়ের প্রাচ্যবিদ্যাকে আমরা দেখি উদ্ধত, দুঃসাহসী রূপে। প্রাচ্যবাদ এ সময় তার শক্তিমত্তা প্রদর্শন করে। অন্য সময়কে ছাড়িয়ে যায়। হাত বাড়ায় সব কিছুর দিকে। প্রদর্শন করে প্রবল প্রতাপ। জার্মান প্রাচ্যবিদ ফিডক এর কথাই ধরা যাক। ১৮৬১ সালে তার মৃত্যু হয়। বন ইউনির্ভার্সিটির অধ্যাপক ছিলেন তিনি। জার্মান ভাষায় অনুবাদ করেন দিওয়ানে হামাসা, ইবনুল নাদীমের যুবদাতুত তালেবীন ফি তারিখি হালব, ইবনে আরবাশার কাফফাতুল খুলাফা। আরবী ও ল্যাতিন ভাষায় লিখেন বিশাল অভিধান। এ হচ্ছে তার কাজের সামান্যমাত্র। গেস্টাপ ফ্লুজেলের মৃত্যু হয় ১৮৭০ সালে। বহুগ্রন্থ অনুবাদ করেন তিনি। যার মধ্যে আছে কাশফুজ জুনুন, ইবনুল নাদীমের ফিহরিস্ত, ইমাম সা'লাবীর মুনীসুল ওহীদ, কুতলুবগার তাবকাতুল হানাফিয়্যাহ।

বহু প্রাচ্যবিদ একেক শাস্ত্রকে গ্রহণ করেন আপন মাধ্যমে হিসেবে। ১৮৭০ সালে চার্লস হেমিল্টন হেদায়ার অনুবাদ করে ফেকাহ নিয়ে কাটাচেরা শুরু করেন। তারপর প্রবলভাবে এগিয়ে আসেন জোসেফ শাখত। তাফসীর ও হাদীসকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কাজে বিশেষভাবে লেগে যান নলডেকি, এ.জে উইনসিংক প্রমুখ। স্প্রেঙগার, উইলিয়াম ম্যুর, মারগোলিয়থ প্রমুখ সীরাতকে করেন ক্ষত-বিক্ষত। অসংখ্য সহগামী সহ তাদের প্রতিটি অংশ বিপুল রচনা ও গবেষণাস্রোত তৈরী করেন। তাদের চিন্তাপ্রবাহে অবগাহন করতে উদগ্রীব ছিলেন নবশিক্ষিত অসংখ্য মুসলিম।

নবম পর্যায় : এখন আর কোনো রাখ-ঢাক নেই। উনবিংশ শতক। ইসলাম শেষ হয়েও হচ্ছে না। কোত্থেকে জেগে উঠে বিদ্রোহী দাবানলের মতো। তার পিপড়ে সারির মতো জনগণ মরেও মরছে না। তাদের হাড্ডিসার অস্তিত্বের কঙ্কাল থেকে উচ্চারিত হচ্ছে স্বাধীনতা! স্বাধীনতা!! ঔপনিবেশিক পৃথিবীতে এই একটি মাত্র আপদ– 'ইসলাম!' একটি মাত্র জটিলতা– 'মুসলমান।'

পশ্চিমা শাসনের পৃথিবীতে প্রাচ্যবিদরা তখন মহাপণ্ডিত। একেক মহাত্মা। তুচ্ছ নেটিভদের ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে 'দয়া করে' তারা গবেষণা করেন। জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির শীর্ষমঞ্চে তাদের গর্বিত আসন। প্রাচ্যবাদ পরিগ্রহ করেছে বৈশ্বিক

রূপ। কিন্তু প্রাচ্যবিদরা ঘোষণা দিচ্ছেন– তাদের আসল আগ্রহ ইসলাম। আমেরিকান প্রাচ্যবিদ জন এস্পোজি বলে দেন– "নয়া প্রাচ্যবিদ্যা, যা বৈশ্বিক রূপ নিয়েছে, তা ইসলাম চর্চায় একীভূত। একটি আরেকটিকে ছাড়তে চায় না। পুরনো প্রাচ্যবাদদ থেকে এ আলাদা। আমি চাইনা লোকেরা আমাকে প্রাচ্যবিদ হিসেবে জানুক। বরং তারা আমাকে ইসলামী বিশেষজ্ঞ হিসেবে দেখলেই খুশি হই। (ইসলাম আওর মুস্তাশরেকীন : সাবাহ)

জন এস্পোজি, রেইস্কা, উইংসং গোস্তাব ফ্লোগাল, জোহন ফক, জন ডিউন, হেনরি গিবন, আগাস্তাস চাপনি সহ বিপুল সংখ্যক প্রাচ্যবিদ তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। পুরনো জ্ঞানগুচ্ছকে আরো স্পষ্ট, অনুপুঙ্খ, অনিবার্য ও স্বতন্ত্র করে তুলা হয়েছে। প্রাচ্যবিদদের স্ববিবেচিত পর্যবেক্ষণের দিকে 'পৃথিবী হাঁ করে তাকিয়ে আছে?' প্রাচ্যতও তখন এক "সাংস্কৃতিক যন্ত্র।" এক আগ্রাসন কিংবা এক 'প্রভূত্তের অভিধান।' সবল হাতে ভাঙছে এবং গড়ছে। বিচ্ছিন্ন করছে এবং জোড়া লাগাচ্ছে। পরিচালনা করছে এবং হাকিয়ে নিচ্ছে। পিতা সাজছে এবং প্রভূ সাজছে। বন্দি করছে এবং দণ্ড ঘোষণা করছে। সবই করছে কিংবা করছে না। কারণ সব কিছু করাচ্ছে কিন্তু দায়িত্ব নিচ্ছে না। উপনিবেশবাদের প্রয়োজনে ১৮০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে শুধু নিকটপ্রাচ্য নিয়ে ষাট হাজার গ্রন্থ রচিত হলো। (ওরিয়েন্টালিজম, এডওয়ার্ড সাঈদ) মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম আফ্রিকা নিয়ে এই সংখ্যা ছিলো লাখেরও অধিক (আল ইস্তেশরাক : হাসান জামানী) এই সব রচনা ভ্রমণবৃত্তান্ত, মনস্তত্ব, ইতিহাস, লোকগাঁথা, নৃতত্ত, দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল বা বিজ্ঞান- যে বিষয়কে উপজীব্য করেই রচিত হোক, তার অভিমুখ কোনো না কোনো ভাবেই ধাবিত রয়েছে ইসলামের দিকে। ইসলামকে বিব্রত করেছে, আহত করেছে। মুসলিম বিবেককে জখম করেছে।

সেটা কীভাবে? ধরুন ভ্রমণ সাহিত্যের কথা। ল্যামারটিন আরব ভ্রমণ করলেন। তিনি এর বৃত্তান্ত লিখলেন। স্বভাবতই এতে আরবের নানামাত্রিক বর্ণনা আসবে। তিনি বর্ণনা দিচ্ছেন– "আরবভূমি প্রতিভা জন্মানোর স্থান। এখানে সব কিছুই অঙকুর ছাড়ে। প্রতিটি সাদামাটা বা উন্মাদ মানুষই তার পালা এলে নবী বনে যেতে পারে।"

এভাবেই প্রাচ্যবিদ্যা তার সকল দিগন্তে ইসলামের বিশ্বাসকে আঘাত করার সুযোগ খুজেছে। কারণ ইসলাম তার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ। সে উপনিবেশিক রাজত্বকে মেনে নিতে রাজী নয়। অতএব তাকে দমিয়ে রাখতে হবে। সকল পন্থায় আঘাত করতে হবে। তার অনুসারীদের মধ্যে জাগ্রত করতে হবে নিকৃষ্টতার বোধ।

দশম পর্যায় :- উপনিবেশবাদ অবসিত হলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তি পৃথিবী দেখলো স্নায়ুযুদ্ধের কাল। অতিদেহী কম্যুনিজম পুঁজিবাদী বলয়ের সাথে ধস্তাধস্তি করছিলো। আফগানিস্তান গ্রাস করতে গিয়ে হজম করতে পারলো না। মুজাহিদদের হাতে মার খেয়ে কিছু দিনের মধ্যেই তাসের ঘরের মতো তছনছ হয়ে গেলো। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ পুরনো প্রতিপক্ষের অবসানে ইসলামকে দেখলো নতুন প্রতিপক্ষ হিসেবে। পশ্চিমা বিশ্বে ছড়ানো হলো ভয়াবহ ইসলাম ফোভিয়া। পুরনো ইসলাম ভীতি সয়লাব করে ফেলে পশ্চিমা গণমাধ্যাম ও গণমানস। এরই মধ্যে ইহুদী তাত্তিক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন পেশ করেন এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী থিউরি- দি ক্ল্যাশ অব সেভিলাইজেশন। ১৯৯৩ সালে ফরেন এ্যাফেয়ার্স পত্রিকার সামার সংখ্যায় তা প্রকাশিত হয়। সেখানে কনফ্যুসিয় সভ্যতার সাথে ইসলামকে পশ্চিমা সভ্যতার আসল শত্রু বলে অভিহিত করেন। ঘোষণা করেন- "সামরিক দিক থেকে পাশ্চাত্য ও ইসলামের মধ্যে শত শত বছরের পুরনো দ্বন্দ্ব হ্রাস পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই বরং তা আরো বেশি প্রবল আকার ধারণ করবে।" তারপর তাই ঘটলো। নাইন-ইলিভেনের দুনিয়া কাঁপানো ট্রাজেডি সংগঠিত হলো। প্রেসিডেন্ট বুশ ইসলামের বিরুদ্ধে ঘোষণা করলেন, "অপারেশন ইনফিনিটি জাস্টিজ।" ন্যায়ের জন্য 'অন্তহীন যুদ্ধ' (প্রাচ্যবিদ্যা পশ্চিমের সব কিছুকেই ন্যায় হিসেবে দেখায়।) কোনো প্রমাণ ছাড়াই কথিত 'আরব সন্ত্রাসীদের' বিরুদ্ধে ঘোষিত হলো যুদ্ধ। যে যুদ্ধকে তিনি ক্রুসেড বলে অভিহিত করেছিলেন। পরে শব্দটি সংশোধন করেন। অন্তহীন যুদ্ধের প্রথম শিকার আফগানিস্তান। তারপর ইরাক। এরপর নানান প্রক্রিয়ায় বধ্যভূমিতে পরিণত করা হলো লিবিয়ার বহু জনপদ। মিসর, সিরিয়া পাকিস্তানে মুসলমানদের গণকবর ভয়ানকহারে বাড়তে থাকলো। আর ফিলিস্তিন তো যায়নবাদ-সামাজ্যবাদের বুলডোজারের তলে নিস্পেষিত হচ্ছেই নির্বিরাম। প্রাচ্যবিদ্যা এ প্রেক্ষাপটে সাম্রাজ্যবাদের প্রাচ্যনীতির সাথে একাকার হয়ে গেলো। ইসলাম আতংককে সে দিলো বিশ্ববিস্তারী রূপ। কামনা করলো ইসলাম বিদ্বেষের বিশ্বায়ন। সচেষ্ট হলো ইসলামের দানবীয় চিত্রণে। সর্বপ্রকার মিডিয়াকে গ্রহণ করলো অবলম্বন হিসেবে। সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করলো ইসলামকে সন্ত্রাস হিসেবে চিহ্নিত করতে।

সাম্রাজ্যবাদের সকল প্রতিষ্ঠান একই শোরগোলে দুনিয়া কাঁপিয়ে তুললো। অসংখ্য তাত্তিক তত্তের খোলাস ছেড়ে প্রোপাগাণ্ডার ফেরিওয়ালা রূপে হাজির হলেন। রাজনীতিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, অভিনেতা, গোয়েন্দা, কূটনীতিক- সকলের কণ্ঠে তুলে দেয়া হলো একই তারস্বর। হান্টিংটন থেকে নিয়ে ড্যানিয়েল

পাইপ, প্যাট রবার্টসন থেকে নিয়ে সিলভি বারলোসকুনি, নিক গ্রিনিক থেকে নিয়ে পিয়া জারেগার্দ সকলেই সোচ্চার ইসলামের বিরুদ্ধে, কুরআনের বিরুদ্ধে, মুক্তিকামী মানুষের জিহাদের বিরুদ্ধে, ইসলামী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, এমনকি মুসলিম নারীদের হিযাবের বিরুদ্ধে। কুরআন পোড়ানোর দিন ঘোষণা, নবীয়ে কারীমের সা. কার্টুন ছাপানো ইত্যাদি এরই অংশ বিশেষ। এখন ইসলাম পাশ্চাত্যের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইসলাম চর্চা নিছক প্রাচ্যবাদী প্রবণতা নয়। প্রত্যেকেই ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী। প্রাচ্যবাদ এ প্রেক্ষাপটে ইসলাম চর্চার নেতিবাদী স্রোতকে আরো বেগবান করছে। বিদ্বেষ বিষাক্ত প্রোপাগাণ্ডায় পরিস্থিতিকে দুর্বিষহ করে তুলছে। ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমের যাবতীয় অনাচারকে তাত্তিক বৈধতা দিচ্ছে। পৃথিবীকে বিভক্ত করছে 'আমরা' ও 'ওরা'য়। 'আমরা বরাবরই সত্য, সভ্যতা, শান্তি। 'ওরা' মানেই মিথ্যা, বর্বরতা, সন্ত্রাস।

অতএব খ্রিস্টবাদী নেতা পামেলা গেলার গঠন করেছেন স্টপ দ্যা ইসলামইজেশন অব আমেরিকা। যা খোলাখুলি প্রচার করছে ইসলাম কোনো ধর্ম নয়, এ হচ্ছে বর্বরদের আশ্রয়স্থল। তরুণদের প্রতি সংগঠনটির আহ্বান- সভ্যতা ও প্রগতির প্রয়োজনে এসো এমন এক পৃথিবীর জন্য লড়ি, যেখানে হয় নিরাপদভাবে আমরা থাকবো। নতুবা থাকবে ইসলাম নামের দৈত্যটি। সি.আই.এর সাবেক প্রধান মি. গ্রাহাম লিখে ফেললেন তার আসল প্রবন্ধ- দি ওয়ার্ল্ড উইদাউট ইসলাম। অর্থাৎ এমন পৃথিবী, যেখানে ইসলাম থাকবে না।

ইউরোপ বিরক্ত হলে হোক, শুনে ইসলামের নাম
সংকটে স্বনির্ভরতা– এই সেই রুহের পয়গাম।

– আল্লামা ইকবাল

প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ

"পৃথিবীতে কোনটি বিজয়ী হবে? সভ্যতার শত্রু এক ধর্ম (ইসলাম)? যে মূর্খতা দাসপ্রথা, স্বেচ্ছাচারিতার অনুকূলে কাজ করে। নাকি বিজয়ী হবে সেই ধর্ম- যা মানুষকে আধুনিকতায় সচেতন করেছে, প্রাচীন সাধকের প্রতিভা দিয়েছে এবং মুছে দিয়েছে মৌলিক দাসত্ব?" ফরাসী লেখক স্যাঁতোব্রার এ প্রশ্নে পশ্চিমা মনস্তত্ত্বের গভীর এক আবেগ ভাষা পেয়েছে।

শ্যাঁতোব্রার আওয়াজ শুনার আগে আমরা পেরিয়ে এসেছি দেড় হাজার বছরের লড়াই। সেই সব রণাঙ্গন, যেখানে খ্রিস্টিয় পাশ্চাত্য ইসলামের মুখোমুখি। দেখেছি প্রশ্ন যেখানে ইসলামের, সেখানে পাশ্চাত্য মুখ থুবড়ে পড়েছে ব্যর্থতায়। প্রশ্ন যেখানে মুসলিমের, সেখানে মুসলমানদের রক্ত ঝরেছে, লাশ পড়েছে, কিন্তু পরাজয় ঘটেনি। পরাজয় ঘটতে দেয় নি ইসলাম।

শ্যাঁতোব্রারা ইসলামের যে পরিচয় দেন, তা তাদের নিরুপায় আক্রোশের শেষ চিৎকার। ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের অন্তহীন ব্যর্থতার হতাশা থেকেই এর উদ্ভব। আক্রোশ তাদেরকে করেছে বিবেচনাহীন। হতাশা তাদেরকে করেছে ভীতসন্ত্রস্থ। ফলে বিষয় হিসেবে ইসলাম যখনই হাজির হচ্ছে, বোধ-বিবেচনার পোশাক খুলে নিজেরাই নিজেদের দিগম্বর করে দিচ্ছে। ভীতির প্রাবল্যে যা বলছে, হয়ে উঠছে নির্বোধ প্রলাপ। যা নিজেই নিজের অসারতার সবচে বড় প্রমাণ। ইসলাম আপন বিদ্বেষীদের এভাবেই লাঞ্ছিত করে।

কিন্তু কেন? কেন ইসলামে তাদের এতো ভয়? এতো হতাশা? এতো বিদ্বেষ?

এর উৎস নিহিত আছে ইসলামের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে। জ্ঞানের প্রেরণায়, স্বাধীনতার নিশ্চয়তায় ও নীতিশাসিত জীবনের নির্দেশনায়, বিপুল মাহাত্মে। জীবনীশক্তির অনন্যতায়। খ্রিস্টবাদ যার সামনে নিঃস্ব ও নিস্প্রাণ। যার পাদ্রীরা জ্ঞানের প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে। ঘোষণা করে 'মুর্খতা ধ্যানের জনক।' গোটা ইউরোপকে পরিণত করে দাসপ্রথার অরণ্যে। যখন ইসলাম মানুষকে সর্বপ্রকার দাসত্ব থেকে মুক্তির বাতায়ন খুলে দিচ্ছে। খ্রিস্টানদের স্বেচ্ছচারিতা মানবতার অভিশাপ ডেকে এনেছে। মধ্যযুগকে করেছে বর্বরতার লীলাক্ষেত্র। আধুনিক পৃথিবীকে করেছে ধ্বংস ও পাশবিকতায় প্রকম্পিত। যার বিবরণ দিতে গিয়ে ড্রেপারকে লিখতে হচ্ছে বিশালগ্রন্থ। রবার্ট ব্রীফল্ট সহ অসংখ্য ঐতিহাসিক যা স্বীকার করছেন বারবার। ইসলাম যদি জীবনাদর্শ হিসেবে দুর্বল হতো, তার বিধি ব্যবস্থা যদি অনন্য না হতো, তার বলিষ্টতা ও ব্যাপকতা যদি অতুলনীয় না হতো, তাহলে তাকে ইসলামের বিরুদ্ধে এতো বিশাল কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়তে হতো না।

ইসলাম যদি হতো সাময়িক কোনো বিপ্লব, তাহলে সময় ফুরালে সে নিজেই ফুরিয়ে যেতো। শতাব্দীর পর শতাব্দী তার সাথে লড়াই হতো না। আজকের পৃথিবীতে ইসলাম যদি পরাশক্তির বিরুদ্ধে আরেক পরাশক্তি না হতো, তাহলে তাকে সকল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু বানাতে হতো না।

খ্রিস্টবাদী প্রতীচ্যের জন্যে ইসলাম বিপজ্জনক, তার পূর্ণতার কারণে। তাদের দারিদ্রের বিপরীতে আপন সমৃদ্ধির কারনে। তাদের বিকৃতির বিপরীতে আপন মৌলিকত্বের কারণে। তাদের অন্ধত্বের বিপরীতে আপন উজ্জ্বলতার কারণে। আপন সত্যতা, সভ্যতা, যথার্থতা ও নৈতিক সমৃদ্ধির কারণে। বিকল্প প্রতীচ্যের ভাণ্ডারে নেই। অথচ সে বরাবরই চেয়েছে ভালো-মন্দ, সভ্যতা, সংস্কৃতির ব্যাপারে তার মানদণ্ড পরিণত হোক সকল জাতির মানদণ্ডে। কিন্তু তার খায়েশের বিপরীতে দাঁড়িয়ে আছে দৃঢ়তর, অখণ্ড এক সমৃদ্ধ জীবনের মূলনীতি

অতএব, ইসলাম এমন কিছু যাকে ভয় পেতে হবে অথবা তার জীবনীশক্তি শেষ করে দিতে হবে। দ্বিতীয়টিই পাশ্চাত্য করতে চায়। আর সেই 'চাওয়ার' বহুমাত্রিক ভাষ্যের নাম প্রাচ্যবাদ। যার সাথে যুক্ত আছে অনুদান, পুরস্কার, পদবিন্যাস, ইনস্টিডিউট, সেন্টার, ফ্যাকাল্টিজ, ডিপার্টমেন্ট। এর মাথার উপর আছে বহুজাতিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, তেল কোম্পানী, ধর্মীয় মিশন, সেনাবাহিনী, পররাষ্ট্র বিভাগ, গোয়েন্দা সংস্থা আর প্রবল পরাক্রান্ত মিডিয়া। সকলেই যার যার জায়গায় ইসলাম প্রশ্নে এমনই চিন্তার চর্চা করছে, যা শেষ পর্যন্ত গিয়ে মিলিত হয় শ্যাতোব্রার বক্তব্যের সাথে!

অতএব অবাক হবার কিছু নয়, যখন সিনেমা-টেলিভিশনে মুসলিম প্রতিমূর্তি লম্পট, রক্তপিপাসু রূপে হাজির হয়। তার জন্যে বরাদ্দ থাকে কিছু ভূমিকা, যা কামুকের, ডাকাতের, বিশ্বাসঘাতকের, খুনির। সে অবশ্যই 'মুর্খতা, দাসত্ব ও স্বেচ্ছাচারিতার অনুকুলে কাজ করে।' বুঝাবার চেষ্টা চলে– এই হচ্ছে ইসলাম!

এই বোধ নিয়ে বৃদ্ধরা মরে এবং শিশুরা বড় হয়। এই হিংসাকে শিক্ষা হিসেবে বিদ্যালয়ে শেখানো হয় কিশোরদের। ঘৃণা জাগানো হয় মুসলমানদের সবকিছু এমনকি ভাষার প্রতিও! ১৯৭৫ সালে কলম্বিয়ার মাধ্যমিক কলেজের আরবী কোর্স গাইডে লেখা হয়– "এ ভাষার প্রতিটি শব্দই সন্ত্রাসের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যুক্ত। ভাষাটিতে প্রতিফলিত আরবমন অপরিবর্তনীয়ভাবে বাকসর্বস্ব।" শুধু কী তাই হারপার ম্যাগাজিনে এমিট টাইরিল লিখেন– 'আরবরা মৌলিকভাবে খুনি। এদের জিন প্রজন্মক্রমে বহন করে আনে সন্ত্রাস ও প্রতারণা।'

"তাদের ব্যাপারে সবচে ভালো আচরণ হলো তাদের জড়ো করা, রশি লাগানো এবং গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করা। সেজন্যে তাদের একটা নূন্যতম যোগ্যতা থাকা দরকার।" ভন গ্রুনেভমের মতে "সে যোগ্যতা মুসলিমদের সরবরাহ করেছে গ্রীক দর্শন।" কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ তো ইসলামকেই গ্রীক দর্শনের প্রতিফলন সাব্যস্থ করে বসেছে। তাদের সাহস যোগিয়েছে ইতিহাসের সেই ঘটনা, যখন মুসলিম শাসক গ্রীক দর্শনকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

আসলে সেই শাসক খাল কেটে ডেকে এনেছিলেন বিপর্যয়। এ দর্শন মুসলিম দুনিয়ার আদর্শিক কোনো কল্যাণ রচনা করেনি। অসংখ্য রোগের প্রদুর্ভাব ঘটিয়েছিলো। অসংখ্য জরা ও ক্ষত সৃষ্টি করেছিলো। অগণিত জীবাণু ও জটিলতার জন্ম দিয়েছিলো। আসলে এ ছিলো পশ্চিমা এক অসুখ। ইসলামের সুস্থতাকে বিপন্ন করার জন্যে যা অভিযানে বের হয়েছিলো। এসব অসুখ মুসলিম জাহানে প্রবেশের আগে ইসলামী জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিটি শাখা যৌবনের বলিষ্টতা

অর্জন করেছে। জাগতিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রেও মুসলিম দুনিয়া সর্বোচ্চ স্তর স্পর্শ করেছে।

গ্রীক দর্শন মুসলিম সভ্যতার ইতিহাসে জ্ঞান ও বিতর্কের কিছু পৃষ্ঠামাত্র সংযোজন করেছে। যার সাথে মুসলিম হিসেবে কোনো মুসলমানের উন্নয়নের সম্পর্ক নেই। কিন্তু পশ্চিমা চশমা বরাবরই এগুলোকে মুসলিম গৌরবের জীয়নকাঠি হিসেবে দেখিয়েছে। এর চর্চাকে দেখিয়েছে ইসলামের শ্রেষ্ঠ অর্জন হিসেবে। কিছু দার্শনিকের নাম ও কাজের উল্লেখ করে বলতে চেয়েছে পৃথিবীতে ইসলামের অবদান এটাই যে মুসলমানরা গ্রীক দর্শনের চর্চা করেছিলেন। তা আত্মস্থ করেছিলেন এবং পরবর্তিতে ইউরোপে পৌছে দিয়েছিলেন। সন্দেহ নেই, দুনিয়ায় জ্ঞানের ইতিহাসে এটা মুসলমান সূচিত অবিস্মরণীয় বিপ্লব। যার ফলে ইউরোপ অন্ধকার থেকে জীবন পেয়েছে। অজ্ঞতা থেকে উত্তরণ পেয়েছে। সভ্যতার ছোঁয়ায় ধন্য হয়েছে। স্পেনের মুসলমানদের শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজপথে এগিয়ে যেতে পেরেছে। যে রাজপথ তাদেরকে নিয়ে গেছে রেনেসা ও রিফর্মেশনের দিকে। বস্তুগত সভ্যতার উন্নত আসনে।

মুসলিম জাহানে গ্রীক দর্শন যুগান্তকারী বহু আবিস্কারকে সাহায্য করেছে। বিশ্বকাঁপানো বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের জন্ম সহজ করেছে। দুনিয়া মাতানো বহু তত্ত্ব ও সূত্রের উদ্ভাবন সুগম করেছে। কিন্তু এসবের পেছনে প্রেরণা ও ভূমিকা হিসেবে ইসলামী শিক্ষাই মূল ভূমিকা উদযাপন করেছে। গ্রীক দর্শন কিছু অভিজ্ঞতা হাজির করেছে মাত্র।

কিন্তু এ দর্শনের প্রতিটি অপঘাত ইসলামের রূপান্তর চেয়েছে। বিশ্বাস ও আকিদাকে চেয়েছে বানের পানিতে ভাসিয়ে নিতে। ফলে মুসলিম জাহানে প্রবেশের পর থেকে সচেতন মুসলিম মনকে বিরক্ত ও বিব্রত করেছে। তার প্রত্যয়ের সীমানায় অবাঞ্চিত উৎপাত করেছে। তার দিকে ঠেলে দিয়েছে জীবন নাশক বহু আপদ। যা একটি ধর্মের বিনাশের জন্যে যথেষ্ট হতে পারতো। যদি সে ধর্ম ওহীর ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও গতিশীল না হতো।

গ্রীক দর্শনের গ্রন্থাবলি মুসলিম জাহানে প্রেরণের পেছনে এমনই এক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছিলো। এ দর্শনকে আমন্ত্রণ করেন খলীফা মামুনূর রশীদ। তিনি ছিলেন দর্শন অন্তঃপ্রাণ। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখলেন, এরিস্টোটলকে। রাজাসনে বসা। তাকে প্রশ্ন করলেন– দুনিয়ায় ভালো বস্তু কী? দার্শনিক বললেন– জ্ঞান যাকে ভালো বলে। উপদেশ চাইলেন। এরিস্টোটল বললেন– একত্ববাদ ও সৎসংসর্গ মূল পূঁজি। একে হারাবেন না। এ সাক্ষাৎ মামুনকে

করলো আরো দর্শনপ্রেমি। রোম সম্রাটের কাছে পত্র লিখলেন– "এরিস্টোটলের যতগুলো বই পাওয়া যায়, সব বাগদাদে পাঠিয়ে দাও।"

খলীফার চিঠি ছিলো রোম সম্রাটের জন্যে নির্দেশেরও অধিক। চিঠি পেয়েই তিনি গ্রন্থ অনুসন্ধান শুরু করলেন। সম্রাজ্যের কোথাও এমন গ্রন্থের চিহ্ন মাত্র দিলো না। স্বয়ং দর্শনই তখন উধাও প্রতীচ্য থেকে। সম্রাট এতে উদ্বিগ্ন হলেন। সহায়তা চাইলেন পাদ্রীদের। এক পাদ্রী জানালেন– গ্রীসে এক গীর্জায় মজবুত ও গোপন এক কক্ষে কনস্টানটাইনের আমলের সকল দর্শন বাজেয়াপ্ত করে রাখা হয়। কারণ এগুলো খ্রিস্টধর্মের ভিত্তিকে আঘাত করছিলো। তারপর থেকে যত সম্রাট আসেন, প্রত্যেকেই সে কক্ষে একটি করে তালা বাড়িয়ে গেছেন।

বিপজ্জনক সেই কামরা খোলা হলো। দেখা গেলো বহু বই সুরক্ষিত আছে। সম্রাট ভাবলেন– বইগুলো মুসলিমদের কাছে পাঠানো সংগত হবে কী? পাদ্রীদের পরামর্শ চাইলেন। ইসলাম বিষয়ে যারা ভালো জানতো, তাদের ডাকলেন। তারা জানালো– এগুলো পাঠানো উচিত। তাদের ধর্মকে হত্যা করার কাজ করবে এসব দর্শন। প্রতিটি পর্যায়ে তার প্রভাবে দেখা দেবে অবক্ষয়। ধর্মের মৌলিকত্ব ও প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে ধাবিত হবে বিলুপ্তির দিকে। আল্লামা শিবলী নোমানী জানাচ্ছেন– "এ যুক্তি সম্রাটের খুব মনে ধরলো। পাঁচটি উট বোঝাই করে নিষিদ্ধ বইগুলো তিনি বাগদাদে পাঠিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।" (আল নু'মান)

গ্রন্থগুলো অনুবাদের দায়িত্ব পেলেন বহু ভাষাবিদ ইয়াকুব বিন ইকহাক কান্দী। আরো গ্রন্থের জন্যে ইউরোপে গেলেন খ্রিস্টান প্রচারক ইউহান্না ইবনুল বাতরিফ। সম্রাটের আগ্রহ দেখে খ্রিস্টান দার্শনিক কেস্তাবিন লুকা ইউরোপে গিয়ে নিয়ে এলেন আরো বহু গ্রন্থ। খ্রিস্টান রাজারা পাঠালেন আরো গ্রন্থ।

মুসলিম জাহান এগুলোকে গ্রহণ করলো নিছক জ্ঞান ও দর্শন হিসেবে। কিন্তু এর প্রভাব ছিলো ওহীভিত্তিক ধর্মের প্রতিকূলে। এই সব দর্শন ভাবনা ও জ্ঞান এবং জীবন ও জগতকে নিজের মতো সাজিয়ে নিতে চাইতো। ইসলামের যে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত, তার প্রতি সে অনবরত গোলা নিক্ষেপ করছিলো। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া মুসলিম জাহানের রাজনীতি, সংস্কৃতিও ইতিহাসের রং দিতে চায় পাল্টে। গ্রীক দর্শন মানুষের দৃষ্টি ও ভাবনার সীমিত সামর্থ নিয়ে জীবনকে আপন মুঠোয় নেবার কসরত চালালো। ওহীর সত্যকেও সে নিজের মানদণ্ডে বিচার করতে প্রয়াসী। তার এ প্রয়াস ধর্মকে চায় পুনর্বিন্যাস দিতে। তার আত্মা ও দেহকে চায় বদলে দিতে। তার প্রেরণা ও গতিকে চায় পাল্টে দিতে। মৌল অবস্থানকে চায় টলিয়ে দিতে। তার পথ ও প্রকৃতিকে চায় পূণঃ নির্মাণ করতে।

ইসলাম এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করলো। পরিবর্তিত গাযালীর রচনাবলী ইসলামের বাগানে ছড়িয়ে পড়া চিন্তা ও দর্শনরূপী এসব কীটের সংহার সাধন করলো। ইউরোপ অপেক্ষা করছিলো ইসলামের মৃত্যুদৃশ্য দেখবে। কিন্তু সহসা তাদের চিত্ত বজ্রাহত হলো। গ্রীক দর্শনের কোমর ভাঙার আওয়াজ শুনলো। যা ছিলো তাদের কাছে একেবারে অভাবনীয়। বিস্মিত ইউরোপ গাযালীর সত্তায় ইসলামের পুণরোজ্জীবন প্রত্যক্ষ করলো। তার কণ্ঠে তাই পরবর্তিতে শতাব্দীর পরে উচ্চারিত হলো– ইসলাম ঋণী দুইজনের কাছে। একজন মুহাম্মাদ সা. আরেকজন গাযালী।

গ্রীক দর্শনে নিবেদিত মুসলিম মনীষীদের প্রতি ইউরোপের বিশেষ কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু তাদেরকেও তারা মেনে নিতে পারে নি। তাদেরকেও নরকের কীট হিসেবে দেখে। কারণ মুসলিম হিসেবে জন্ম নেয়ার অপরাধ তারা করেছেন। দান্তে তার ডিভাইন কমেডিতে ইবনে সিনা ইবনে রুশদকে নরকে পুড়িয়েছেন। তারা অন্যদের তুলনায় সম্মানজনক শাস্তি ভোগ করছিলেন। এদের একমাত্র অপরাধ– এরা খ্রিস্টির বিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করেননি।

ড্যানিয়েল ডিফো তার ইসলাম এন্ড দি ওয়েস্ট গ্রন্থে স্বীকার করেছেন যে- বারো ও তেরো শতকে সর্বজনীন বিশ্বাস ছিলো খ্রিস্টান জগতের বহির্ভাগ মানেই বিরুদ্ধবাদী দুর্বৃত্তদের আশ্রয়স্থল। ইউরোপীয় চিন্তারাজ্যের অন্যতম নায়ক গ্যালান্ড ডি হারবেলট তার বিখ্যাত বিবলিউথিক ওরিয়েন্টালিজমে ইতিহাসকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন : পবিত্র ও অপবিত্র।

প্রথমটি খ্রিস্টান ও ইহুদীদের। দ্বিতীয়টি মুসলমানদের। অপবিত্র ইতিহাসকে তিনি সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। অপবিত্রদের সাম্রাজ্যের সকল প্রদেশকে আলোচনায় এনেছেন। তাদের ইতিহাস ঐতিহ্য, আচার-প্রথা, ভাষা-সাহিত্য, শাসক-জনতা, প্রাসাদ, নদী, উদ্ভিদসহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। সর্বত্রই অপবিত্রতার ছাপ। সবকিছুর মূলে আছে তাদের ধর্ম-ইসলাম। হারবেলটের এই মনোবৃত্তি ইউরোপীয় চিন্তাকে শাসন করেছে বরাবর। ১৬৯৭ সালে এ্যান্টয়েন গ্যালান্ডের ভূমিকাসহ তার বইটি প্রকাশিত হয়। এটি ছিলো পরবর্তীদের জন্য শ্রেষ্ঠ দলিল ও পথিকৃত। এ গ্রন্থ অন্য অসংখ্য গ্রন্থের জননী। যে সবগ্রন্থ একটি অপরটির প্রতিযোগি।

ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলাম গ্রন্থে পি.এম. হল্ট দেখিয়েছেন– 'বিবলিউথিক এবং পরে প্রকাশিত সেল এর কুরআন অনুবাদের ভূমিকা, (১৭৩৪) ও সিমন আকলির দি হিস্ট্রি অব দি স্যারাসিন্স (১৭০৮-১৮) এই তিন গ্রন্থ ইসলাম সম্পর্কিত 'নতুন উপলব্ধির প্রসারে' 'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা' রাখে।

ওরিয়েন্টালিজমে এডওয়ার্ড সাঈদের ভাষ্য– 'বিবলিউথিক ইউরোপে আদর্শ রেফারেন্স গ্রন্থ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ছিলো।'

আসলে বিবলিউথিক নয়, তাদের আদর্শ ছিলো অবাধ বিরোধিতা ও মিথ্যাচার। রেসালাতকে অস্বীকারের মাধ্যমেই তারা ইসলামের শেকড় উৎপাটন করতে চেয়েছে। তাদের রচনায় দেখানো হয় ইসলাম ব্যক্তিচিন্তার ফসল। অনবরত তারা কথাটি বলেই চলে। বহুভাবে। বহু ভঙ্গিতে। তাদের অপরিহার্য কাজ হলো সাদৃশ্য তালাশ। খুব দ্রুততার সাথে তারা ইসলামকে খ্রিস্টবাদের সাথে সাদৃশ্য দিয়ে বসে। প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও সে কোনো দিককে তারা মিলিয়ে নেবে। প্রমাণের কোনো প্রয়োজন নেই। একান্তই যদি প্রমাণ চান, তাহলে 'বিবলিউথিক' জাতীয় বহু গ্রন্থ তো আছেই।

যেহেতু খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি যিশুখ্রিস্ট, তাই একজন প্রাচ্যবিদের বাধ্যতামূলক কাজ হলো হুজুর সা. কে ইসলামের ভিত্তি হিসেবে উপস্থাপন। তারা প্রথমেই ইসলামের পরিভাষায় হাত দেন। খুব সচেতন ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে। ইসলাম শব্দের ব্যবহার তারা করেন মুসলিম বা নির্দিষ্ট কোনো মুসলিম জনগোষ্ঠি বুঝাবার জন্যে। এর ব্যবহার যে অনুচিত, যদিও তারা জানেন। কারণ পরিভাষার অপপ্রয়োগে দিন-রাতকে একাকার করা যায়। বিষ ও শরবতের পার্থক্য ভুলিয়ে দেয়া যায়।

ইসলাম কী– এটা সকলেরই জানা। একটা শিশুও বলতে পারে– কুরআন-সুন্নাহর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠা জীবন ব্যবস্থার নাম ইসলাম। কিন্তু প্রাচ্যবিদরা যখন 'ইসলাম' উচ্চারণ করেন, পরিভাষার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন না। তুর্কিদের পরাজয় হয়ে যায় ইসলামের পরাজয়। আফ্রিকার শাদে নিরক্ষর মুসলমানদের বিবরণ হয়ে যায় 'শাদে নিরক্ষর ইসলাম।' মধ্যপ্রাচ্যে বিচ্ছিন্ন মুসলিম গোষ্ঠিসমূহ হয়ে যায় 'ইসলামসমূহ।'

এভাবেই তারা ইসলামের নাম করে মুসলিম জনগোষ্ঠির অনগ্রসর জীবন-যাপনকে বুঝিয়ে চলেন। ইসলাম নয়, বরং বিভিন্ন সংস্কৃতিকে উপস্থাপন করেন। মুসলিম জনগোষ্ঠির চিন্তা ও তৎপরতাকে প্রদর্শন করেন। এভাবে এক চিন্তার সঙ্গে অন্য চিন্তার এক তৎপরতার সাথে অন্য তৎপরতার সংঘাত হাজির করেন। এইসব চিন্তা ও যাপনপ্রক্রিয়া কীভাবে খ্রিস্টান-ইহুদী বা হিন্দু-বৌদ্ধ বা যরথুস্টবাদীদের চিন্তা ও সংস্কৃতির অংশ, তা প্রমাণ করার জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক কলা ও চাতুর্যের সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করেন।

যে কোন উপায়ে তারা দেখিয়ে ছাড়বেন চিন্তার এই রূপ প্রাচীন এক পরিক্রমা। এতে ভালো ও অনুপম কোনো দিক থাকলে সেটাকে ইউরোপীয়

অংশ সাব্যস্থ করবেন। আবার এতে তাদের বিবেচনায় কোনো অবাঞ্ছিত দিক স্পষ্ট হলে একে বর্বর হিসেবে চিত্রিত করবেন। দেখাতে চাইবেন, এটা 'ইসলামের' নিজস্ব সম্পদ। চিন্তা, সংস্কৃতি, জীবনবোধ ও ভাবধারার এই সব ধরণ ও চরিত্রকে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠির স্বার্থ রাজনৈতিক চালবাজির সাথে মিলিয়ে নেবেন। দেখাবেন একেক গোষ্ঠি ইসলামকে নিজস্ব স্বার্থের নির্দেশে পূণগঠন করছে। এর বিভিন্ন দিক কীভাবে কোন শাসক গোষ্ঠির স্বার্থের পাহারা নিশ্চিত করে, তা স্পষ্ট করার জন্যে যেনতেন প্রকার প্রক্রিয়া অবলম্বন করবেন। একে সূত্র বানিয়ে এগিয়ে যাবেন ইসলামের মৌলিক শাস্ত্রসমূহের দিকে। সর্ববিধ সর্তকতা সহকারে বর্ণিত চিন্তা ও সংস্কৃতির সাথে একে গুলিয়ে একাকার করে দেবেন। এই কাজের গোটা পরিক্রমা সচেতন বুদ্ধিমত্তার সাথে উদযাপন করবেন। যাতে পাঠক প্রশ্ন করার সুযোগ না পান। কারো মনে এই সন্দেহ জাগ্রত না হয় যে– ইসলাম ও মুসলিম জনগোষ্ঠি তো এক জিনিস নয়। তাদের নিয়ে আলোচনা আর ইসলাম নিয়ে আলোচনা তো সমার্থক নয়। এখানে ঘাপলা ও উদ্দেশ্যমূলক তৎপরতা রয়েছে।

মুসলিম অর্থে ইসলামকে ব্যবহার করে, মুলমানরা যা করেনি, কিন্তু ইউরোপে মিথ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, এমন মিথ্যাকেও ইতিহাসরূপে চিত্রিত করে প্রাচ্যবাদ। এবং এর দায়ভার চাপানো হয় ইসলামের উপর। প্রাচ্যবিদদের মধ্যে সবচে জাগ্রত দৃষ্টি ও বিবেকবান হিসেবে পরিচিত এডওয়ার্ড সাঈদ ও এই প্রবণতা এড়াতে পারেননি। ওরিয়েন্টালিজমে তার আওয়াজ শুনুন– 'এমন নয় যে ইসলাম এমন কিছু করে নি, যা ত্রাস, ধ্বংস দৈত্যসুলভ ঘৃণ্য, অসভ্য বর্বর জাতির সাথে সাদৃশ্যময়।' কিংবা ইসলাম প্রশ্নে উদার এম.এন. রায় এর কথা শুনন- ইসলাম যখন ভারতে এলো, তার বিপ্লবী চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। প্রাচ্যবিদ মাত্রই ইসলামকে তার প্রকৃত চিত্রের বাইরে নিয়ে গেছেন। মুসলিম আচরণ, মধ্যযুগীয় মিথ, বিদ্বেষপ্রসূত প্রোপাগাণ্ডা ইত্যাদির সমম্বিত রূপকে ইসলাম হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। অশুদ্ধ ও নেতিবাচক ধারণা ছড়িয়েছেন।

এর চেয়েও ভয়াবহ যে কাজটি তারা করেন, সেটা হলো ইসলাম অর্থে 'মুহামেডানিজম' এর ব্যবহার। বহু মুসলিম এর অনুবাদ করেন মুহাম্মদিয়াহ। অনেক সময় দ্বীন অর্থে তারা একে ব্যবহার করেন। নিজেদের শব্দে উপরোক্ত আবহ লক্ষ্য করে তারা পুলকিত হন। ভুলে যান মুহাম্মদ শব্দের সাথে ইজম যুক্ত করে ইউরোপীয়রা আসলে কী বুঝাতে চান। ইংরেজি ইজম এর ব্যবহার হয় কোনো তন্ত্র বা মতবাদ বুঝাতে। ন্যাশনালিজম-জাতিয়তাবাদ, সেক্যুলারিজম-ইহজাগতিকতাবাদ, কম্যুনিজম-সমাজতন্ত্র বুঝিয়ে আসছে জন্মের পর থেকেই। এভাবে ইজম শব্দটি ইসলামের ক্ষেত্রে চালিয়ে দিতে পারলে তার ঐশীত্ব ঘুচানো

যাবে। ধারণা জন্মাবে- এটা কোনো ঐশী ব্যাপার নয়। এক মহান ব্যক্তির মতবাদ। যাকে ধর্ম বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে।

প্রাচ্যবিদরা শব্দটি দিয়ে এ লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছেন। আর মুসলিম বিশ্বের অনেকেই অনুকারিতায় উৎসাহে এর ব্যবহার করেন। অসচেতনভাবে। ডেনিয়েল নরম্যান তার ইসলাম এন্ড দি ওয়েস্ট গ্রন্থে স্বীকার করেছেন– এভাবে ইসলাম হয়ে যায় একটি ইমেজ। তাকে নাম দেয়া হয় মুহাম্মেডানিজম-মুহাম্মদের মতবাদ। আর আপনা আপনি মুহাম্মাদ সা. সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয় ভণ্ড আখ্যা।'

এরপর অবধারিতভাবেই 'মতবাদের প্রবক্তা'র উপর সর্বশক্তি নিযে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাঁর বিশ্বস্ততা ও মহাত্মকে শেষ করে দিতে পারলে 'মতবাদ'টি এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে!

হযরত মুহাম্মদ সা. এর মহান মর্যাদার উপর ইউরোপ এতে বেশি হামলা করেছে, যার কোনো নজির ইতিহাসে নেই। গোড়া প্রাচ্যবিদ মন্টোগোমারি ওয়াটকেও তাই স্বীকার করতে হলো- 'পশ্চিমা দেশগুলিতে ইতিহাসের পাতায় হযরত মুহাম্মাদ সা.কে যত ঘৃণিত ও হেয় প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, বিশ্ব ইতিহাসে অন্য কোনো মহামানবের ক্ষেত্রে এমন করা হয়নি।" (মুহাম্মদ এট মক্কা)

'ঘৃণিত ও হেয়' প্রমাণ করার চেষ্টার একটি নজির দেখুন, ইউরোপীয় চিন্তানায়ক হারবেলটের বিবলিউথিকে : "এই সেই ভণ্ড মেহমুত। (খ্রিস্টান) বিরোধি মতের প্রতিষ্ঠাতা ও গ্রন্থলেখক। যা ধর্মের নাম নিয়েছে। যাকে আমরা বলি মহামেডান। আর্য, পলেশীয় পলিয়ানিস্ট ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন বিরুদ্ধবাদীরা যিশুখ্রিস্টের ইশ্বরত্ব খণ্ডিত করার সময় তার যে সব প্রশংসা করেছে, কুরআনের অনুবাদক ও মোহামেডান আইন বা ইসলাম বিশেষজ্ঞরা তাই আরোপ করেছে ওই ভণ্ড নবী ওপর ..... ।"

ইউরোপ শত শত বছর ধরে এভাবেই চালিয়ে যাচ্ছিলো। এই ধরনের বক্তব্য ঘৃণা, বিদ্বেষ, অন্ধত্ব, হীনতা ও নির্বিবেক মিথ্যাচারের ছাড়া আর কোনো অর্থই বহন করে না। এতে প্রকারান্তরে নিজেদের হিংসাকাতর মনের ঘৃণ্য ছবি স্পষ্ট হয়।

মানুষের স্বভাব এতো মিথ্যাচারকে অব্যাহতভাবে বরদাশত করতে পারে না। ইউরোপ থেকেই এর বিরোধিতা শুরু হলো। কার্লাইল, আর্থার, গ্লিন নিউনার্দ, পাদ্রী ম্যাকগ্রেগর, বসওয়ার্থ স্মিথ, উইলিয়াম ড্রেপার, মনোগোমারি ওয়াট, , স্নোক হরগ্রোনজি সহ অনেকেই এ ধারার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন। ইসলামের প্রতি উদার ছিলেন বলে নয়, বরং এ পদ্ধতি মোটেও কার্যকর নয় বলে। তাদের হাত দিয়েই রচিত হলো বক্তব্যও আক্রমণের নতুন ভাষ্য। সেখানে প্রশংসা আছে,

আছে বিদ্বেষ। বাস্তবতার বর্ণনা আছে, আছে অবাস্তব মিথ্যাচার। পণ্ডিত্যের ধাঁচ আছে, আছে আক্রোশের আঘাত। বহু সত্য আছে, আছে মূল সত্যকে অস্বীকার। কিন্তু উৎসের দিক দিয়ে তা পুরনো ধারার জমজ। পুরনো ধারা হুজুর সা. এর নবুওয়াতকে প্রত্যাখান করতো, এখনও করা হয়। হুজুর সা. ইসলামের রচয়িতা বলতো এখনো বলা হয়। কিন্তু প্রভাব ও কার্যকারিতার বেলায় নতুন ধারা খুবই টেকসই, ফলপ্রসু ও নিরাপদ প্রমাণিত হলো। উভয়ধারার সমন্বিত রূপ আমরা দেখি উইলিয়াম ম্যুরের মধ্যে। তিনি তার দি 'লাইফ অব মুহাম্মাদ' গ্রন্থে মিথ্যাচারিতার কৃতীত্ব প্রদর্শন করেন। হুজুর সা. সম্পর্কে কাল্পনিক বর্ণনার এক স্তুপ তৈরী করেন। প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রদর্শন করেন ঘৃণ্য হঠকারিতা। হুজুর সা. এর মোহরে নবুওয়াত আসলে আম্মাজান খাদিজা রা. এর আঘাতের দাগ, শুকর নিষিদ্ধ হওয়া আসলে শুকরের প্রতি হিংসা, হুজুর সা. তুকতার্কের আশ্রয় নিতেন নিজের বুযুর্গী দেখাবার জন্যে, হুজুর সা. এর জীবনের একটাই লক্ষ্য ছিলো– খ্রিস্টবাদ উচ্ছেদ। তাঁর একটাই কৃতীত্ব– মানুষের চোখে ধুলা দেয়া ইত্যাদি বর্বর প্রচারণার সমাহার ছিলো গ্রন্থটি। ভারতীয় মুসলিম চিন্তাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ নবীপ্রেমও ইতিহাসের দায় থেকে ম্যুরের জবাবী এক গ্রন্থ লিখেন– 'দি লাইফ অব মুহাম্মদ।' তার পক্ষ থেকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ উচ্চারিত হয় খুতবাতে আহমদিয়্যাহ-এ। ম্যুরের জন্যে এই চ্যালেঞ্জ ছিলো অভাবনীয়। সৈয়দ আহমদের গ্রন্থটি ইউরোপ-আমেরিকায় প্রচারিত হয়। গ্রন্থটি ম্যুরের দাঁত ভেঙে গিয়েছিলো। তিনি দীর্ঘ প্রচেষ্টা সত্তেও নিজের বক্তব্যকে প্রমাণ করতে পারলেন না। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উদ্ভট মিথ্যাগুলো বাদ দিলেন। ভুল স্বীকার করলেন এবং গ্রহণ করলেন কৌশলী ভূমিকা। এখন থেকে তিনি হুজুর সা. এর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। তার মাহাত্মের বর্ণনা দেবেন এবং হঠাৎ আক্রমণ করবেন।

এ ধারা বিপুলভাবে অনুসৃত হবে অনুসারীদের মধ্যে। সীরাতের উপর কৌশলী আক্রমণে নেতৃত্ব দেবেন ম্যুর, মারগোলিয়থ,স্প্রেঙগার।তৈরী হবে নতুন এক টেক্সট। যার নমুনা দেখুন ইউলসন ক্যাশ এর ১৯২৮ সালে প্রকাশিত দি এক্সপেনিশন অব ইসলামে : "হযরত মুহাম্মদ সা. নিজের ব্যক্তিত্ব ও আপন মতাদর্শের দ্বারা লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে এখনো অসংখ্য লোক তার একচ্ছত্র আনুগত্য করছে। বহু জাতি ও বিশাল জগতময় ছড়িয়ে পড়া তার আইনকে আল্লাহর আইন হিসেবে ধরা হয়।"

মার্কাস উডস তার 'মুহাম্মদ বুদ্ধ ও খ্রিস্ট' গ্রন্থে লিখেন– "হযরত মুহাম্মদ সা. চিন্তাবিদ হবার তুলনায় বড় কবি ছিলেন। তার স্বভাবগত সুক্ষ্মদর্শিতা, পরিস্থিতিজ্ঞান এবং অনুভূতিশক্তিতে প্রতিমা পূজা অসার প্রমাণ হওয়ায় তিনি তা প্রত্যাখান করে দিয়েছিলেন।"

উদার হিসেবে পরিচিত গড়পড়তা প্রাচ্যবিদদের বুদ্ধিবৃত্তিক শত্রুতার সাধারণ ভাষ্য এটাই। যার মূল প্রবণতা হচ্ছে প্রশংসার মধ্য দিয়ে দাবি করা হুজুর সা. নবী নন। নবী হিসেবে তাকে ধরে নেয়া হয়েছে। তার ব্যক্তিগত চিন্তার প্রতিফলন হচ্ছে ইসলাম। তাদের সকল আক্রমণ এই লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু এ লক্ষ্যে সাফল্য অর্জন তাদের কপালে ছিলো না। কারণ হুজুর সা. এর নুবওয়াতের প্রমাণ তিনি নিজেই। তিনি জীবনে মিথ্যা বলেছেন, প্রমাণ করুন। তার চরিত্রে কোনো ত্রুটি ছিলো, প্রমাণ করুন। তিনি জীবনে কাউকে প্রতারিত করেছেন, প্রমাণ করুন। প্রাচ্যবিদরা যতদিন এ সব চ্যালেঞ্জের প্রামাণ্য ও সংগত জবাব দিতে না পারবে, ততদিন হুজুর সা. এর নুবওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্থ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। কারণ নবী না হয়েও নবী দাবি করা, নবী হিসেবে নিজেকে পেশ করা, এ ভিত্তিতে মানুষকে পরিচালিত করা মিথ্যা, চারিত্রিক স্খলন ও প্রতারণার সমাহার। এই তিন বিষয়ের যে কোন একটি প্রমাণিত হলে নবুওয়াতকে অস্বীকার করার যুক্তি তৈরী হবে। অতএব তারা একটি মাত্র বিষয় প্রমাণ করুক- হুজুর সা. কখনো মিথ্যা বলেছেন।

এটা যদি সম্ভব হতো, তাহলে পশ্চিমাদের অনেক আগে আরবের মুশরিক, ইহুদীরা কাজটি করে ইসলামের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারতো। যারা নিকট থেকে হুজুর সা. এর জীবনাচার দেখেছেন, তাদের কেউই এমন দাবি করার দুঃসাহস দেখায়নি। এমনকি চরম শত্রু অবস্থায় আবু সুফিয়ান ও হিরাক্লিয়াসের রাজসভায় স্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন– 'তিনি জীবনে কোনো ম্যিথা বলেন নি।' আবু সুফিয়ান তখন ছিলেন ইসলাম বিরোধী শক্তির প্রধান সেনাপতি। তিনি সারাক্ষণ সচেষ্ট ছিলেন কীভাবে ইসলামকে ধ্বংস করা যায়। সে জন্যে আরবের মুশরিকরা যুদ্ধের পর যুদ্ধ করেছে, নিজেদের ভয়ানক বিপর্যয় ঘটিয়েছে, কিন্তু হুজুর সা. মিথ্যা বলেন এমন দাবি করে নবুওয়াতকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা তারা করে নি। কারণ নবীজীর চরিত্রে এমন কলঙ্ক আরোপ আরবদের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা পাবে না। আবু জেহেল সহ ধূর্ত ও বিপজ্জনক নেতারা এ পথে পা বাড়াবার সাহস করে নি।

মদীনায় ইহুদীরা হুজুর সা. এর সাথে অজস্র প্রতারণা করলো, নিচে বসা অবস্থায় দেয়ালের উপর থেকে পাথর ফেলে শহীদ করার ষড়যন্ত্র, ছাগলের গোস্তে বিষ মিশিয়ে জীবন নাশের চক্রান্ত- এগুলো করেছে ইহুদীরা। কিন্তু হুজুর সা. মিথ্যা বলেন, এমনটি দাবি করা ধৃষ্টতা হয়নি তাদের। তৎকালের ইসলাম বিদ্বেষী কবি আবুল উজ্জা জাহমীর কবিতা পড়ুন, কা'ব ইবনে আশরাফের কবিতা পড়ুন, মুসাইলামাতুল কাযযাবের বক্তব্য শুনুন, তুলায়হা আসাদীর প্রচার লক্ষ্য

করুন, আসওয়াদ আনাসীর কথায় কান পাতুন- মিথ্যার অভিযোগ করতে পারে না হুজুর সা. এর উপর। তারা বলছে কবি, উন্মাদ, যাদুকর ইত্যাদি।

কিন্তু তিনি নিজেকে রাসূল হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন এবং তিনি সত্যবাদী। আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন নাযিল হয় তার কাছে, এ দাবিতে তিনি সত্যবাদী। কুরআন বারবার বলছে তিনি কবি নন, উন্মাদ নন, যাদুকর নন, তিনি আল্লাহর রাসূল।

কেন তিনি কবি হবেন, জীবনে কবিতা না লিখে? কেন তিনি কবি হবেন, যখন তার বক্তব্য কবিতা নয়? কেন তিনি কবি হবেন, যখন শত্রুর দেয়া কবি অভিধা তার ও তার খোদার পক্ষ থেকে প্রত্যাখাত? কেন তিনি কবি হবেন- যখন তার বাণীরাজী কবিতার সীমানা অতিক্রম করেছে? উন্মাদের বাণী কী পৃথিবীকে পাল্টে দেয়? সৃষ্টি করে নতুন সভ্যতা? সূচনা করে বৈশ্বিক বিপ্লবের? তৈরী করে জ্ঞানের অসংখ্য শাখা? লক্ষ লক্ষ গবেষক অজস্র বছর ধরে মেধা, সাধনা ও মানবীয় সামর্থ প্রয়োগ করেও যার কোনো কূল-কিনারা খুজে পাচ্ছেন না! উন্মাদের কথা এমন হতে পারে? যাদুকরের কথা? যার বাণীর আলোরাজি সাতমহাদেশের তাবৎ অন্ধকারের দেয়াল দেয় কাঁপিয়ে? সকল উন্মাদের উন্মাদনার জন্যে সে বাণীতে নিহিত থাকে সর্বোৎকৃষ্ট মহৌষধ; সকল যাদুর তুকতাক যার প্রভাবে ব্যর্থ অকার্যকর ও পরাজিত- সে বাণীর উৎস উন্মাদনা? যাদুবিদ্যা? যে বাণীর নির্দেশে কতো মহাজ্ঞানী, মহাবীর, মহাকবি, মহামনীষী পরিচালনা করলেন আপন জীবন, অজস্র আইনবিদ, সমাজবিদ, মনোবিদ, শিক্ষাবিদ, ভাষাবিদ, জ্যোতির্বিদ, তর্কবিদ, যুক্তিবিদ, তত্ত্ববিদ, প্রজ্ঞাবিদ, রহস্যবিদ যে বাণীকে গ্রহণ করলেন পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ হিসেবে, যার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে লক্ষ লক্ষ গ্রন্থ রচিত হলো, অজস্র মানদণ্ডে যার পর্যালোচনা হলো, অসংখ্য প্রক্রিয়ায় যার যাচাই হলো, কিন্তু সকল গ্রন্থ, পর্যালোচনা ও প্রক্রিয়া সমুদ্র মাপার ক্ষুদ্র চামচ প্রমাণিত হলো- সেই বাণীকে উন্মাদনা বলে কোন উন্মাদ? যাদু বলে অভিহিত করে কোন যাদুগ্রস্থ?

কিন্তু ইউরোপ করলো, প্রাচ্যবিদ করলো। জন ফেলবি তারিখুল আরব গ্রন্থে লিখলো– 'তিনি ছিলেন মৃগী রোগী। হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়ে যেতেন। তখন উন্মাদনার তোড়ে যা বলতেন, তাকে খোদার বাণী হিসেবে চালিয়ে দিতেন।' উইলিয়াম ম্যুর লিখলো- "তার মধ্যে ছিলো সম্মোহন। এর দ্বারা প্রথমেই মানুষকে আকৃষ্ট করতেন। যেই কাছে আসতো, সম্মোহিত হয়ে মনে করতো তিনিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠজন।" (দি লাইফ অব মুহাম্মদ)

ফেলবি চালাক, ম্যুর আরো চালাক। প্রথমজন ওহী নাযিলের সময় যে বিশেষ অবস্থা জারি হতো, তাকে মৃগীরোগ বলে বসলো। ম্যুর নাম উচ্চারণ ছাড়া যাদুর কথাই বললো। 'সম্মোহনের দ্বারা আকৃষ্ট করতেন', 'যেই কাছে আসতো, সম্মোহিত হয়ে ....' -নিশ্চিত যাদুর অপবাদ!

অথচ এইসব অপবাধ অনেক আগেই ইতিহাসের আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। বর্বর মনের ভুল উদ্ভাবন হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। অতএব অধিকতর চতুর প্রাচ্যবিদরা আশ্রয় নিলেন আরো জটিলতার। তারা আক্রমণ করলেন আরো গভীরে এবং হারিয়ে যেতে থাকলেন আরো বেশি বিভ্রান্তির মরিচিকায়।

মারগোলিয়থ কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি টেনে হুজুর সা. এর মর্যাদাকে আহত করতে চাইলেন। শুরু করলেন তাঁর (সা.) খান্দানের প্রতি তাচ্ছিল্য আরোপ। "এটা পরিষ্কার যে, মুহাম্মদ সা. একটি অতি নগণ্য ও দরিদ্র পরিবারের লোক ছিলেন।" কথাটি প্রমাণ করার জন্যে কুরআন থেকে নিয়ে অভিধান- সর্বত্র কাচি চালিয়েছেন। দেখুন তার যুক্তিজাল "(ক) কুরআন জানাচ্ছে কুরাইশগণ অবাক হয়ে বলতো– তাদের কাছে ভদ্রঘরের কাউকে নবী বানিয়ে পাঠানো হলো না কেন? (খ) হুজুর সা.কে কেউ যখন মাওলা বললো, তিনি এ পদবী গ্রহণে রাজী হননি। (গ) মক্কা বিজয়ের সময় তিনি বলেন– আজ থেকে মক্কার অভিজাত শ্রেণি ধ্বংস হয়ে গেলো।" (ইউনিভার্সাল হিস্ট্রি অব দি ওয়ার্ল্ড)

অথচ বাস্তবতা হলো

(ক) কুরআন জানাচ্ছে–

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ

অর্থাৎ, তারা বলে– কুরআন মক্কা ও তায়েফের কোনো প্রধানের কাছে কেন অবতীর্ণ হলো না?

এখানে 'আজীম' শব্দ এসেছে। আরবরা একে ব্যবহার করতো সম্পদশালী ও প্রভিপত্তিশালী লোকদের ক্ষেত্রে। ভদ্রলোক বুঝাতে তারা শরীফ শব্দ ব্যবহার করেন। হুজুর সা. ভদ্র, এ নিয়ে আরবের কেউই ভিন্নমত প্রকাশ করেনি। তার বংশ অভিজাত- সে স্বাক্ষ্য তারা না দিয়ে পারেনি। হিরাক্লিয়াসের সামনে আবু সুফিয়ান এ সত্যের স্বীকৃতি দেন। শরাফত তথা ভদ্রতার জীবন্ত প্রতীক হিসেবে হুজুর সা. গোটা আরবে ছিলেন একক ও অনন্য- এ কথা অস্বীকার করতে পারেননি ডি.এইচ হগার্থের মতো উগ্র কিংবা উইলিয়াম ড্রেপারের মতো কৌশলী প্রাচ্যবিদ। হর্গাথ তার হিস্ট্রি অব আরবে ড্রেপার তার ইন্টেলেকচুয়াল ডেভলপমেন্ট অব ইউরোপে হুজুর সা. এর শরাফতের উচ্ছসিত বর্ণনা

দিয়েছেন। এমন বর্ণনা চার্লস ওয়াটসন, কার্লাইল সহ অনেকেই না দিয়ে পারেন নি। মারগেলিয়থ যদি সত্য তালাশ করতেন, তাহলে তিনি নজির পেতে পারতেন বোখারী, মুসলিম, শামাইলে তিরমিযী থেকে নিয়ে হাদীসের যে কোন কিতাবে। তালাশ করতে পারতেন ইবনে হিশাম, সিরাতে মোগলতাই থেকে নিয়ে সিরাতের যে কোন বিশ্বস্ত কিতাব। কিন্তু তিনি গ্রহণ করলেন জার্মানীর প্রাচ্যবিদ নোলডেকির বিভ্রান্তি। যিনি এসব যুক্তির প্রথম উদগাতা। নোলডেকিই 'মাওলা' শব্দ নিয়ে বিভ্রান্তির প্রয়াস শুরু করেন। কারণ- হুজুর সা. বলেছেন- 'আমাকে মাওলা ও সায়্যিদ বলো না।' কিন্তু হাদীসের অপর অংশ কৌশলে চেপে গিয়েছেন। যাতে হুজুর সা. বলেছেন "কেননা প্রকৃত মাওলা ও সায়্যিদ হচ্ছেন আল্লাহ।" কুরআনের সর্বত্র আল্লাহকেই মাওলা বলা হয়েছে। বদর যুদ্ধে মুসলমানরা শ্লোগন দেন– "আল্লা-হু মাওলানা, ওয়ালা মাওলা লাকুম।" মাওলা আমাদের আল্লাহ। হে কাফিরগণ! তোমাদের কোনো মাওলা নেই। হুজুর সা. আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শব্দের প্রয়োগ নিজের ক্ষেত্রে পছন্দ করেন নি। এতে কি প্রমাণ হয়ে যায় যে– হুজুর সা. এর বংশ অভিজাত ছিলো না!!

মক্কা বিজয়ের পর যে অভিজাত গোষ্ঠীর অবসান ঘোষিত হয়, তারা হলো হঠকারী, দাম্ভিক ও শাসক শ্রেণি। এ ঘোষণা ছিলো ইসলামেরই শিক্ষার ফল। এখানে শ্রেণি সংগ্রামের কল্পনা করে মারগোলিয়থ অভিজাত বিদ্বেষের দৃষ্টান্ত খুঁজে পেলেন। চিন্তার উর্বরতা বটে! তিনি এমন এক সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে ভাবলেন না– দুনিয়ার অসংখ্য ইতিহাসগ্রন্থ হুজুর সা. এর বংশীয় মাহাত্মের উচ্চকণ্ঠ বিঘোষক। ফলে এ কাণ্ডের মাশুল তাকে দিতে হলো ইতিহাসের মার খেয়ে। তার এ বক্তব্য রাষ্ট্র হতে না হতেই ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় ইতিহাসের আকরগ্রন্থ তারিখে তাবারি। যার স্পষ্ট ভাষ্য– 'হুজুর সা. এর বংশ গোড়া থেকেই সম্ভ্রান্ত এবং সব দিক দিয়েই মর্যাদার অধিকারী ছিলো।' স্টানলি লেনপুলের মতো প্রাচ্যবিদ মারগোলিয়থের ভ্রান্তির প্রতিবাদ করলেন। লাহোর থেকে প্রকাশিত 'দি প্রোফেট এন্ড ইসলাম' গ্রন্থে লিখলেন– মুহাম্মাদ সা. এর জন্ম কুরাইশ গোত্রের সেই পরিবারে, যা মক্কাকে সারা আরবের প্রধান শহরে রূপান্তরিত করেছে। তার বংশ পবিত্র ঘরের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলো। মুহাম্মদ সা. এর মহান দাদা ছিলেন প্রকৃতপক্ষে মক্কার শাসক। কা'বার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন তিনি। হজ্ব করতে যারা আসতো, তিনি তাদের খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাপনা করতেন।"

হুজুর সা. এর খান্দানের বিরুদ্ধে হাস্যকর কামান দাগিয়ে মারগোলিয়থ সবচে বড় ঝুঁকিটি নিলেন রাসূল সা. এর পিতার নামকে কেন্দ্র করে। ইউনিভার্সাল

হিস্ট্রিতে তিনি লিখলেন- 'মুহাম্মদ সা. ছিলেন বংশ পরিচয় অজ্ঞাত ব্যক্তি। কারণ তার পিতা ছিলেন আবদুল্লাহ। যে ব্যক্তির বংশ পরিচয় নেই, আরবে তাকে আবদুল্লাহ বলা হতো।' অথচ হুজুর সা. এর বংশ পরম্পরা হলো- মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম ইবনে আবদে মানাফ ইবনে কুসাই ইবনে কিলাব ইবনে মুররা ইবনে কাআব ইবনে লুওয়াই ইবনে গালিব ইবনে ফেহের ইবনে মালিক ইবনে নযর ইবনে কেনানা ইবনে খুযাইমা ইবনে মুদরিকা ইবনে ইলিয়াস ইবনে মুযার ইবনে নেযার ইবনে মালিক ইবনে আদনান। (সীরাতে মুগলতাই, ইবনে হিশাম, তারিখে তরবী ইত্যাদি)

এ বংশধারা ছিলো আরবে সবচে প্রসিদ্ধ। বরেণ্য। এর প্রতিটি ধাপে এমন সব ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যাদের কীর্তি ছিলো প্রবাধপ্রতিম। নযর ইবনে কেনানা ছিলেন আরবের একচ্ছত্র নেতা। তিনি তার খান্দানকে প্রথমে ভূষিত করেন কুরাইশ উপাধিতে। ফেহের ছিলেন অপ্রতিদ্ধন্ধি নেতা। তারপর কুসাই ইবনে কেলাব হন আরো প্রতিপত্তিশালী। তার শ্বশুর খলীল খাযায়ী তাকে কাবা ঘরের তত্তাবধায়ক নিয়োজিত করেন। তিনি মক্কায় দারুন নদওয়া নামক পরামর্শ পরিষদ স্থাপন করেন। এটাই ছিলো মক্কার সামাজিক পার্লামেন্ট। তিনিই মক্কা ও মিনায় হজ্ব যাত্রীদের পানাহারের ব্যবস্থা করেন। মাশআরে হারাম তথা নিষিদ্ধ মাস তারই আবিষ্কার। সারা আরব যাকে অলংঘনীয় বিধান হিসেবে মেনে নেয়। তিনিই হজ্বের মৌসুমে চর্মবেষ্টিত হাউজ নির্মাণের প্রথা চালু করেন।

কুসাইর ছিলেন ছয় পুত্র। আবদুদ দার, আব্দে মনাফ, আবদুল ওজ্জা, আবদ ইবনে কুসাই, তাখমীর, বাররা। কুসাইর পরে আবেদ মনাফ হন গোটা আরবের নেতা। তার ছিলেন ছয়পুত্র। এদের মধ্যে হাশিম ছিলেন সর্বাধিক সম্মানী ও প্রতিপত্তিশালী। দুনিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে আগত হাদীসের জমজমের পানি দান ও সাধারণ পানাহারের দায়িত্ব তিনি পালন করতেন। তার বাণিজ্য ছিলো রোম সাম্রাজ্য পর্যন্ত বিস্তৃত। রোমান সম্রাটের কাছ থেকে তিনি ফরমান আদায় করেন- আরবরা তার সাম্রাজ্যে বাণিজ্য করবে ট্যাক্স ছাড়াই। ইথিউপিয়ার সম্রাট নাজ্জাসীর কাছ থেকেও অনুরূপ ফরমান তিনি আদয় করেন। তারই অবদানের ফলে আরবগণ শীতকালে ইয়ামান ও গ্রীষ্মকালে সিরিয়া থেকে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বাণিজ্যপণ্য নিয়ে যেতে পারতেন। হিরাক্লিয়াসের রাজধারী আনকারায় গেলে তাদেরকে জানানো হতো সাদর অভ্যার্থনা। আরবের কোথাও কুরাইশদের বাণিজ্য কাফেলা কেউ লুট করতে পারতো না হাশেমের প্রভাবের কারণে। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তিনি জনগণের খাদ্যদানের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন। রুটি টুকরো করে তরকারির ঝোল মিশিয়ে সবাইকে পরিবেশন করতেন। কোনো কিছু টুকরো করাকে আরবীতে হাশম বলা হয়। সেই থেকে তার নাম হয় হাশিম।

তার স্ত্রী ছিলেন বনী নাজ্জার গোত্রের সবচে অভিজাত নারী- সালমা। তার বংশধরদের হাশেমী বলা হতো। এটাই ছিলো হুজুর সা. এর খান্দান। হাশেমের ছিলেন এক পুত্র -শাইবা- যার অপর নাম আবদুল মুত্তালিব। তিনি পিতার খ্যাতিকেও ছাড়িয়ে যান। মাটির তলে হারিয়ে যাওয়া জমজম কূপ খনন করেন। ফলে আরবের ঘরে ঘরে প্রার্থনাবাক্যের মতো উচ্চারিত হতো তার নাম। প্রভূত শ্রদ্ধায়, বিপুল আবেগে। তিনি মানত করেন দশটি ছেলেকে যৌবনে উপনীত হতে দেখলে তাদের একজনকে আল্লাহর নামে কুরবানী করবেন। তার ইচ্ছে পূর্ণ হয়। ফলে একজনকে কুরবানী দেয়ার জন্যে দশ সন্তানের নামে লটারির আয়োজন হয়। লটারিতে এলো তার সবচে মার্জিত, রুচিশীল, সজ্জন, সুন্দর ও জনপ্রিয় পুত্রের নাম- আবদুল্লাহ।

কুরবানীর জন্য তাকে ময়দানে নেয়া হচ্ছিলো। আবদুল্লাহর বোনেরা কাঁদতে লাগলেন। তার পিতার কাছে আবেদন করলেন- তার পরিবর্তে দশটি উট কুরবানি করুন। তাকে রেহাই দিন। আবদুল্লাহ ও দশটি উটের মধ্যে লটারি দেয়া হলো। এবারও এলো আবদুল্লাহর নাম। দশের স্থলে উটের সংখ্যা বিশে নেয়া হলো। আবারো নাম এলো আবদুল্লাহর। এভাবে দশ দশ করে উটের সংখ্যা বেড়ে যখন একশোয় পৌছলো, তখন এলো উটের নাম। আবদুল মুত্তালিব একশো উট কুরবানী করলেন। আবদুল্লাহর প্রাণরক্ষা পেলো।

আবদুল মুত্তালিব তনয় আবদুল্লাহর এ কাহিনী আরবে ছড়ায় কিংবদন্তির মতো। এ বংশের আভিজাত্য আরবকে দেয় গৌরব। এ সত্যের বিবরণে উচ্চকণ্ঠ ইতিহাস। ওয়াকেদী, ইবনে ইসহাক, যারকানী, ইবনে সা'দ, ইবনে কাছির, ইবনুল আসির- কে না বর্ণনা করেছেন এ সত্যকে। কিন্তু মারগোলিয়থ সাহেব গায়ের জোরে একে অস্বীকার করলেন। ইতিহাস তাকে সমর্থন করুক বা না করুক, একজন জার্মান লোনডেকি তো সাথে আছেন! আর কী চাই!!

বিদ্বেষ যখন মানুষকে অন্ধ বানায়, তখন হিতাহিত জ্ঞান কাজ করে না, সে এমন কিছু করে বসে, যা তার গায়ের সকল নকল আবরণ সরিয়ে দেয়। আসল অবয়ব স্পষ্ট করে দেয়!

হুজুর সা. এর বংশসূত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করার কাজে ইউলিয়াম ম্যুরও বেশ খেটেছেন। দাবি করেছেন- হুজুর সা. বংশসূত্রে ইসমাইলী ছিলেন না। লাইফ অব মুহাম্মদে তার বক্তব্য- 'ইসমাইলের আ. বংশধর মনে করার আগ্রহ সাধারণত তার জীবদ্দশায় শুরু হয়েছিলো। ফলে হুজুর স. এর ইবরাহিমী বংশসূত্রের প্রাথমিক ধারা গড়ে নেয়া হয়। ইসমাইল আ.ও বনী ইসরাইলের অসংখ্য কাহিনী অর্ধেক ইহুদী আর অর্ধেক আরবী ছাঁচে ঢালাই করা হয়।'

ম্যুরকে যখন এ বক্তব্য প্রমাণ করার জন্যে চ্যালেঞ্জ করা হলো, তিনি ভড়কে গেলেন। এ ব্যাপারে আর উচ্চবাক্য করলেন না। ফ্রস্টার সাহেবের মতো বিশেষজ্ঞ আরবের ঐতিহাসিক ভূগোল গ্রন্থে এমন রটনাকে প্রত্যাখান করেন। প্রমাণ করেন হুজুর সা. বংশসূত্রে ইসমাইলী। প্রাচ্যবিদ নেভুর স্পষ্ট করেছেন ইসমাইলী বংশতালিকা কীভাবে হুজুর সা. পর্যন্ত উপনীত হয়েছে। ফিলিপ কে হিট্টি হিস্ট্রি অব দি আরবে সবিস্তারে দেখিয়েছেন– শুধু কুরাইশ নয়, বরং সমগ্র উত্তর আরব এবং হেযাজের অধিবাসীগণ হযরত ইব্রাহীম আ. এর বংশধর। কিন্তু তারপরও বহু প্রাচ্যবিদ ম্যুরের ভ্রান্তির উপর সওয়ার হলেন। তারা মিথ্যাকে রটিয়ে বেড়াতে লজ্জাবোধ করছেন না মোটেও। বংশের উপর অপবাদ আরোপের পাশাপাশি তারা হুজুর সা. এর সুমহান চরিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চাইলেন। তাদের সবচে' উৎসাহের বিষয় হলো হুজুর সা. এর বহু বিবাহ। এক্ষেত্রে প্রাচ্যবিদরা যুগ যুগ ধরে চূড়ান্ত মিথ্যাচার করে আসছে। হাজার হাজার গ্রন্থে তারা এ বিষয়ে পুরিষ উদগীরণ করেছে। সকল প্রক্রিয়ায় তারা প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে যাচ্ছে। আমরা দেখিয়েছি দান্তে কীভাবে যৌন ব্যাপারে নবীয়ে রহমতের সা. বিরুদ্ধে কবিত্বময় প্রোপাগাণ্ডা করছেন। সেই ধারাবাহিকতা আজও চলমান। প্রাচ্যবিদরা এতো নগ্ন, অশ্লীল ও ধৃষ্ট কথাবার্তা বলেছে, যাকে অপরাধ হিসেবে স্বীকার করে আজ হোক কাল হোক ক্ষমাপ্রার্থনা করতেই হবে খ্রিস্টিয় জগতকে। নতুবা এ কলঙ্ক যুগ যুগ ধরে তাদের বিবেকহীনতার কথা জগতময় রটিয়ে বেড়াবে।

আমরা তাদের বিকৃত মানসিকতার এমন সব বক্তব্য হাজির করছি না, যা পড়লে লজ্জা ও লজ্জা পায়। ঘৃণা ও ধিক্কারের কোনো শব্দই যথেষ্ট মনে হয় না। অতিসামপ্রতিক আমেরিকান পাদ্রী জেরি ফ্যালওয়েল, প্যাট রবার্টসন বা জেরি ফায়েঞ্জের প্রচারণায়ও ঘৃণ্য সেই স্রোত প্রবহমান।এরা পাশ্চাত্যে অত্যন্ত প্রভাবশালী।শক্তিশালী, কোনো কোনো শক্তিশালী প্রেসিডেন্টের চেয়েও।সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশের গুরু জেরি ফায়েঞ্জ এর প্রচারণা লক্ষ্য করুন "পাশ্চাত্য মানদণ্ডে হযরত মুহাম্মাদ সা. বাজে স্বভাবের একজন স্বেচ্ছাচারি লোক। কেননা তিনি মাত্র নয় বছর বয়সের একটি মেয়ে বিয়ে করেছেন।" আয়ান হারসি ঘোষণা করেছে– ব্রাউনের জীবনভিত্তিক ছবির আদলে হুজুর সা. এর জীবনের উপর ছবি বানাবে। নিজের মতো করে নবী চরিত্র উপস্থাপন করবে। ব্যাখ্যা করবে। নিজ পুত্রের স্ত্রীর কাছে প্রেম নিবেদনের দৃশ্য দেখাবে। তার কথা হলো– 'এটা কীভাবে সম্ভব, তিনি কয়েক দিন হেরা গুহায় গোপন থাকলেন। আর সেখান থেকে এমন যাদুকাঠি নিয়ে বেরিয়ে এলেন, যার দ্বারা নিজের পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করা বৈধ হয়ে গেলো! সাবেক প্রেসিডেন্ট বুশের গুরু জেরি ফয়েঞ্জের উক্তি–

"..... তিনি ছিলেন অরুচির মানুষ। বাচ্চাদের প্রতি আসক্ত। বারোজন নারীকে বিয়ে করেছেন। সর্বশেষে বিয়ে করেন ছোট এক মেয়েকে, যার বয়স মাত্র নয়।" এসব হচ্ছে মূর্খউক্তি ও বিষাক্ত বিদ্বেষ।

ওরা কি জানেনা, হুজুর সা. সর্বপ্রথম যে নারীকে বিয়ে করেন, তিনি ছিলেন চল্লিশ বছর বয়সী বিধবা? তার ছিলো দু পুত্র তিন কন্যা। হুজুর সা. এর বয়স তখন ছিলো পঁচিশ। পঁচিশ বছরের কোন যুবক চল্লিশ বছরের বিধবা নারীকে বিয়ে করবে? যে নারী ইতোপূর্বে দুজন স্বামীর সাথে সংসার করেছেন! বিয়ের পর খাদিজা রা. পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। এ সময়ে হুজুর সা. আর কোনো নারীকেই বিয়ে করেননি। চল্লিশোর্ধ এক পবিত্রা রাণীকে নিয়ে কাটিয়ে দিলেন গোটা যৌবন। খাদিজার রা. গর্ভে জন্ম নেন ছয় সন্তান। অপূর্ব ভালোবাসা ও দায়িত্বশীলতায় পূর্ণ ছিলো সেই সংসার। হুজুর সা. বলেন– আল্লাহ পাকই আমার অন্তরে তার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন (সহীহ মুসলিম, ফাযায়েলে খাদিজা রা.) কামান্ধ পশ্চিমারা এ ভলোবাসার তাৎপর্য কোথায় খুঁজবে? এ ভালোবাসার পেছনে একমাত্র নৈতিক তাৎপর্য লুকিয়ে আছে। যা ঘোষণা করছে যৌন তাড়না হুজুর সা. কে শাসন করতে পারেনি। তিনিই বরং শাসন করতেন তাকে। নতুবা খাদিজার সাথে হুজুর সা. এর সংসার জীবনের চিত্র হতো ভিন্ন। এমন কি খাদিজা রা. হতে পারতেন না হুজুর সা. এর প্রথম স্ত্রী।

খাদিজার রা. ইন্তেকালের পর প্রবল পেরেশানী ও কঠিন পরিস্থিতি ধেয়ে এলো হুজুর সা. এর জীবনে। বয়েস তখন পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। বাইরে কাফেরদের নিষ্ঠুর নির্যাতন, ঘরে নেই শান্তনা দেয়ার কেউ। সন্তানদের লালন-পালনের কেউ। গৃহ পরিচালনার কেউ। খাওলা বিনতে হাকিম আরজ করলেন, এ পরিস্থিতিতে একজন স্ত্রী একান্তই জরুরী। তিনিই হযরত সওদা বিনতে জামআর রা. জন্যে প্রস্তাব পেশ করলেন। যিনি ছিলেন বিধবা ও এক সন্তানের জননী। মুসলমান হয়েছিলেন প্রাথমিক যুগেই। হিজরত করেন আবিসিনিয়ায়। সেখান থেকে মক্কায় ফিরতেই স্বামী মারা গেলে তিনি একান্তই অসহায় হয়ে যান। হুজুর সা. তার জন্যে উজ্জ্বল উদ্ধার হয়ে গেলেন। কে বলবে এ বিয়েতে যৌন তাড়না ছিলো?

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা. হুজুর সা. এর জন্যে নিজের জীবনের সবকিছু ওয়াকফ করে দেন। তার বড়ো আকাঙ্খা ছিলো হুজুর সা. এর সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন করবেন। হুজুর সা. এর মহিমান্বিতা স্ত্রী এর গৌরবে নিজের কন্যাকে ধন্য করবেন। নিজে হবেন এ সম্পর্কের দ্বারা মহিমান্বিত। আবু বকরের রা. এ কামনা ছিলো পাহাড়ের চেয়েও ওজনদার। আবু বকর রা. এ কামনার

কথা বলে বেড়াতেন না। সবাই জানতো যুবায়ের ইবনে মুতঈমের রা. পুত্রের সাথে তার কন্যার বিয়ে হবে। কিন্তু যুবায়ের পুত্র নিজ থেকে ব্যাপারটির ইতি ঘটালেন। হযরত খাওলা রা. যখন আয়শা রা. এর বিয়ের প্রস্তাব দিলেন, সহজেই তা গৃহিত হলো। তখন তার বয়স ছিলো ছয় বছর। হযরত আয়শার রা. বয়স যখন নয়, তখন তাকে নেয়া হয় নবীগৃহে। যৌন কামনার অনুসন্ধানীরা এ বিয়েতে কিছুই খুঁজে পাবে না। কেন তিনি যৌন প্রয়োজনে একটি বিয়ের জন্যে ৫৩ বছর বয়েস পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন? কেন তিনি বাছাই করবেন নয় বছরের বালিকাকে? কুরাইশরা কী ইতোপূর্বে আরবের সবচে সুন্দরী রমণীদের প্রস্তাব তার কাছে দেয়নি? তিনি কি তা প্রত্যাখান করেন নি ঘৃণাভরে?

তাহলে এই বিয়ে কোন প্রয়োজনে? পরবর্তি ইতিহাস বলবে এই বিয়ে ইসলামের কত বড় প্রয়োজন পুরণ করেছে। আয়শা রা. হুজুর সা. এর ঘরে আসার পর বর্ণনা করবেন দুই হাজার দুই শত দশ খানা হাদীস। যার মধ্যে ১৭৪ খানা হাদীসের শুদ্ধতার উপর বুখারী-মুসলিম একমত। শরীয়তের এক চতুর্থাংশ নির্দেশাবলি বর্ণিত হবে হযরত আয়শা রা. থেকে। আবু বকর রা. ওমর রা. ও ওসমানের রা. শাসনামলে তিনি প্রদান করবেন বহু আইনী ফয়সালা। যে সমস্যার কোনো সমাধান সাহাবাদের কাছে নেই, তার মীমাংশা করে দেবেন তিনি।

এভাবেই তালাশ করলে দেখবো– প্রত্যেক উম্মুল মুমিনীনের বিয়ের মধ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বহু কল্যাণ নিহিত ছিলো। প্রত্যেকের বিয়ের পেছনে ছিলো এমন এক প্রেক্ষাপট, যাতে বিয়ে করে নেয়ার মধ্যে ছিলো বিপুল কল্যাণ ও খোদার রহমত। যেমন ধরুণ হযরত জুওয়াইরিয়া রা. এর বিয়ে। তিনি ছিলেন বনু মোস্তালিক গোত্রপতি হারিস ইবনে যেরারের কন্যা। তার স্বামী মোনাফে' ইবনে সাফওয়ান নিহত হন মুরাইসি এর যুদ্ধে। তিনি তার পিতা এবং গোত্রের সাত শতাধিক নারী-পুরুষ বন্দি হন। যুদ্ধ বন্দি হিসেবে তিনি সাবিত ইবনে কায়েস ইবনে শাম্মাসের রা. করতলগত হন। অভিজাত, বুদ্ধিমতি, ভাগ্য বিপর্যস্ত নারী হুজুর সা. এর দরবারে এসে ব্যাকুল চিত্তে মুক্তির আব্দার করলেন। সাবিত ইবনে কায়স ও প্রস্তাব করলেন, গোত্র সর্দারের কন্যাকে হুজুর সা. যদি নিজের আওতায় নিয়ে আসেন, সেটাই উত্তম হবে। হুজুর সা. তাকে নিজের বাদি হিসেবে রেখে দিতে পারতেন। কিন্তু দিলেন স্ত্রীর মর্যাদা। এ খবর প্রচারিত হবার সাথে সাথেই সাহাবাগণ বনি মুস্তালিকের সকল বন্দিকে মুক্ত করে দিলেন। হযরত আয়শার বর্ণনা মতে এই বিয়ের বরকতে বনী মুস্তালিক গোত্রের সাত শতাধিক দাস-দাসী মুক্ত হয়ে গেলেন।

যে গোত্র ছিলো ইসলামের স্থায়ী শত্রু, তারা হয়ে গেলো ইসলামের প্রহরী। প্রভাবশালী এই বেদুঈন সম্প্রদায়ের উৎপাত থেকে মদীনা পেলো সুরক্ষা।

প্রাচ্যবিদরা বিশেষভাবে রং লাগায় হযরত জয়নাব রা. এর বিয়েতে। তারা ইচ্ছেমতো একে বিকৃত করে এবং ঘৃণ্য নিন্দাবাদে উন্মত্ত হয়। মারগোলিয়থ, ড্রেপার, ম্যুর, গুল্ডযিহার, স্প্রেঙ্গার, আলফ্রেড গিয়োম সহ প্রায় সকল প্রাচ্যবিদ এ বিষয়ে কল্পনাবিলাসে লিপ্ত হয়েছেন। তাদের পুঁজি হলো ওয়াকেদীর এক ভিত্তিহীন বর্ণনা। যা ইবনে জারির তাবারি সহ কেউ কেউ লিপিবদ্ধ করেছেন। বর্ণনাটি হযরত জয়নাবকে রা. কেন্দ্র করে। হুজুর সা. নিজের আযাদকৃত গোলাম হযরত যাযদ রা. এর কাছে বিয়ে দেন জয়নাবকে। জয়নাব রা. ছিলেন হুজুর সা. এর ফুফাত বোন। অভিজাত রমণী। এক সময় গোলাম ছিলেন বলে হযরত যায়দ রা. কে তিনি মন থেকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। প্রায় এক বছর তাদের সংসার চলে। উভয়ের মধ্যে দূরত্ব ছিলো। ছিলো নিয়মিত বিবাদ। এক সময় যায়দ রা. তাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। নবীয়ে কারীমের সা. দরবারে এসে অভিযোগ করলেন, জয়নাব কঠোর শব্দে আমাকে আঘাত করে। আমি তাকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। হুজুর সা. তাকে বারবার বুঝালেন। তালাক না দেয়ার জন্যে। কিন্তু তালাক না দিয়ে যায়েদের চলছিলো না। তাদের জীবনে শান্তি ছিলো না। দাম্পত্য বন্ধন এক অসহ জ্বালা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের এ অবস্থা সমাজে জানাজানি হয়ে গেলো। পরিস্তিতি বিব্রতকর হয়ে দাঁড়ালো।

তালাকের পর যয়নাব রা. হলেন পরিত্যক্তা। আল্লাহর রাসূলের সা. নির্দেশেই তিনি যায়দকে রা. বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু আজ তার জীবন বিধ্বস্ত। বিপন্ন। মানসিক ও সামাজিকভাবে বিপর্যস্ত এই নারীকে নিজের স্ত্রীত্বের মর্যাদা দিয়ে মহিমান্বিত করবেন বলে হুজুর সা. ভাবছিলেন। কিন্তু মানুষ কী মনে করবে, এ চিন্তা হুজুর সা. এর মধ্যে কাজ করছিলো। কারণ যায়দ রা. ছিলেন নবীজীর সা. পালিত পুত্র। আর পালকপুত্রকে জাহেলি যুগে ঔরসজাত পুত্র হিসেবে গণ্য করা হতো।

ইসলাম এই প্রথার উচ্ছেদ কামনা করলো। হুজুর সা. জয়নাবকে রা. বিয়ে করলে সে প্রথার উচ্ছেদ রচিত হতো। কিন্তু এক্ষেত্রে হুজুর সা. এর ইতস্ততার কারণে আয়াত নাযিল হলো– আপনি অন্তরে যে কথা গোপন করেছেন, আল্লাহ তা প্রকাশ করে দেবেন। এ ব্যাপারে আপনি মানুষকে ভয় করেন। অথচ আপনার উচিত একমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা। অবশেষে হুজুর সা. হযরত জয়নাবকে রা. বিয়ে করলেন।

কিন্তু ওয়াকেদীর ভিত্তিহীন গল্প এক্ষেত্রে শত্রুদের হাতিয়ার। গল্পটি হলো– যায়েদের রা. সাথে সাক্ষাতের জন্যে একদিন হুজুর সা. তার বাড়ীতে গেলেন। যায়েদ বাড়িতে ছিলেন না। জয়নাব রা. কাপড় পরছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি নবীজীর সা. চোখে পড়লে হুজুর সা. বাইরে বেরিয়ে এলেন। তখন তিনি বলছিলেন– 'আল্লাহ পাক পবিত্র ও সবচাইতে বড়। পবিত্র সেই আল্লাহ, যিনি অন্তরকে পরিবর্তন করে দেন।'

যায়দ এ ঘটনা জানতে পেরে নবীজীর সা. দরবারে এসে বলেন– 'জয়নাবকে যদি আপনার ভালো লাগে, তাহলে তাকে আমি তালাক দিয়ে দেই।'

তাবারী এই ঘটনা বর্ণনা করেছেন ওয়াকেদীর সূত্রে। যিনি বহু মিথ্যা গালগল্পের মূল সূত্র। তিনি ছিলেন আব্বাসী সালতানাতের প্রিয় পাত্র। বিলাসী আব্বাসী সুলতানদের খাহেশ-পূঁজার দলিল সরবরাহের ইচ্ছা থেকেই এমন গালগল্প রচিত হয়ে থাকবে।

মুখরোচক এই গল্পকে প্রত্যাখান করেছেন বিদগ্ধ মুহাদ্দিসীন। হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ .ফতহুল বারীতে ঘটনাটি উল্লেখ করে লিখেন– "ইবনে আবি হাতিম এবং ইবনে জরীর এখানে কোনো কোনো পূর্ববর্তির উদ্ধৃতিতে কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন। যা আমরা এ কারণে উপেক্ষা করতে চাই যে সেগুলো মিথ্যা।"

বোখারী-মুসলিম প্রমুখ সতর্ক ও বরেণ্য মুহাদ্দিস এ ঘটনাকে সর্বাংশে প্রত্যাখান করেছেন।

প্রাচ্যবিদরা শত শত শক্তিশালী হাদীসকে এক কথায় বর্জন করেছে। গোটা হাদীস শাস্ত্রকেই অস্বীকার করেছে অনেকেই। কিন্তু তারাই এই কাহিনী নিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চাইলো সূর্যের বুকে কালো দাগ একে দিতে। আসলে এটা তাদের পুরনো স্বভাব। ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ "তালমুদ' এ হযরত মরিয়মকে অসামাজিক কাজে কলঙ্কিত নারী আখ্যায়িত করা হলো। সেখানে লেখা হলো– ঈসা হচ্ছে অবৈধ সন্তান। তার মা এক ঋতূ পরিমাণ সময় সৈনিক বান্দিরার সঙ্গ গ্রহণ করে গর্ভবতী হয়েছে।" দ্বিতীয় স্যামুয়েল গ্রন্থের পুরো এক অধ্যায় জুড়ে আছে দউদ আ. এর নামে গালগল্প। তিনি স্বীয় সৈনিক উরিয়া আল হিসসির স্ত্রীর সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়েছেন ইত্যাদি। অধ্যায়টির নাম 'দাউদের ধোকা ও বিচ্যুতি।' তাদের বক্তব্য– "দাউদ আ. আপন সৈনিক উরিয়াকে একের পর এক যুদ্ধে পাঠান, যাতে তিনি মারা যান। এবং তার স্ত্রীর পানিগ্রহণের পথ সুগম হয়। উরিয়ার স্ত্রীর সাথে আগেও তিনি অপকর্ম করেন। ফলে সে গর্ভবতী হয়।"

সুলাইমান আ. এর ব্যাপারে বলা হয়েছে– "তার স্ত্রী ছিলেন সাত শত আর তিনশত জন ছিলেন রক্ষিতা। এসব নারীই তাকে আল্লাহ বিমুখ করে

দিয়েছিলো।" শুধু কী তাই? "সুলাইমান অনেক অপরিচিত নারীর স্বাদ গ্রহণ করেছেন। কাম-স্বার্থ চরিতার্থ করেছেন। অথচ তাদের বিয়ে করেনি।" শুনুন লুত আ. সম্পর্কে তাদের ধৃষ্টতা– "নবী লুত আ. মদ পান করে নিজের দুই কুমারী মেয়েকে ধর্ষণ করে।"

এসব নির্লজ্জ মিথ্যাচার আমাদের শিউরে তুলে। আহত করে। কোনো নবীর অপমান একজন মুসলিম মেনে নিতে পারে না। তাদের পবিত্র চরিত্রে অশুভ আঘাত মানেই অমার্জিত ধৃষ্টতা।

প্রত্যেক নবীই ছিলেন পরিপূর্ণ সৎ, পূতঃপবিত্র। খোদার নির্বাচিত। খোদার নির্দেশের বাইরে তারা যেতেন না। তাদের বিয়ে, সংসার জীবন- সবই খোদার নির্দেশের প্রতিফলন। নবীদের বহু বিবাহের বিরবণ রয়েছে খোদ বাইবেলে। বাইবেল জানায় দাউদ আ. এর স্ত্রী ছিলেন ৯৯ জন, ইয়াকুব আ. এর ৪ জন, মূসা আ. এর ৪ জন, ইবরাহীম আ. এর তিনজন। বাইবেলে রয়েছে বহু বিবাহের সমর্থন। পাদ্রী ডেভিন পোর্ট, ফিকস, জন মিলটন, আইজ্যাক টেলর সহ অনেকেই বহু বিবাহের পক্ষে সোচ্চার। ইউরোপে বহু বিবাহ বরাবরই ছিলো প্রচলিত। রাজা ও পাদ্রীদের বৈধ-অবৈধ পত্নীদের কোনো সীমা-সংখ্যা ছিলো না। গীর্জাগুলো ছিলো পাপ ও যৌনতার আখড়া। আজ তারা বহু বিবাহের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। কিন্তু অবৈধ যৌনতার সকল রাস্তা উন্মুক্ত করে পশ্চিমারা প্রত্যেকেই বহু নারীকে যৌনসঙ্গী বানাচ্ছে, কিন্তু তাকে বৈধ স্ত্রীর স্বীকৃতি দিচ্ছে না। নারীদের প্রতি এই আনাচার করেও ইউরোপ লজ্জিত নয় মোটেও।

তৎকালীন পৃথিবীতে সর্বত্রই প্রচলিত ছিলো বহুবিবাহ। প্রত্যেকেই ইচ্ছেমতো স্ত্রী রাখতো। কোনো সীমা-সংখ্যা ছিলো না। ইসলাম একটি সীমা বেঁধে দিলো। এক এবং কঠিন শর্ত সাপেক্ষে একাধিক। সর্বোচ্চ চার। এ বিধান আসার পর যাদের স্ত্রী অধিক ছিলো, তারা চারজনকে রেখে বাকিদের তালাক দিয়ে দেন। নবীজীর সা. স্ত্রীদের ব্যাপারটি ছিলো আলাদা। যিনি যাকে একবার বিয়ে করেন, তাকে অন্য কারো জন্যে বিয়ে করা চিরতরে হারাম হয়ে যায়। এখন যদি তিনি কাউকে তালাক দেন, তাহলে সেই মহিলা আর কাউকে বিয়ে করতে পারবেন না। সহায় সম্বলহীন অবস্থার কারণে তাদেরকে হুজুর সা. বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু তিনি তাদেরকে তালাক দিলে তারা আরো বেশি অসহায় হয়ে যেতেন। হুজুর সা. এর সাথে কয়েকদিনের দাম্পত্যজীবন তাদের জন্যে স্থায়ী এক বঞ্চনার কারণ হতো। তারা কোথায় যেতেন? কে তাদেরকে আশ্রয় দিতো? তাদের তো কিছুই ছিলো না!

হুজুর সা. এর জন্যে তাই চারের অধিক স্ত্রী রাখার সুযোগ দেয় আল কুরআন। ইসলামের পূর্ণতার জন্যে এর প্রয়োজন ছিলো। কেন নয়? পরিবারিক জীবন হচ্ছে সভ্যতা ও মানবতার আতুড়ঘর। মানবজীবনের সবচে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর প্রতিটি ধাপ ও পর্যায়ে মানবতার মহান শিক্ষকের কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ কী- এর দৃষ্টান্ত থাকা চাই। অধিক সংখ্যক স্ত্রী থাকায় জীবনাচারের বহু মাত্রিক দিক প্রতিফলিত হয়েছে। অসংখ্য অনুষঙ্গ হাজির হয়েছে। অগণিত বাস্তবতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রত্যেকের দিক থেকে তা রূপরেখা আকারে মানবতার সামনে উপস্থাপিত হয়েছে। পারিবারিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আদর্শ হিসেবে মানবতাকে পথ দেখাচ্ছে। সে জন্যেই হুজুর সা. রাত যেভাবে যাপন করলেন, ভোরে সবাইকে তা জানিয়ে দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছিলেন। হুজুর (সা.) এর । জীবনাদর্শই যে বাস্তব হেদায়াত।

প্রাচ্যবিদরা এখানে আপত্তি জানায়। মক্কার জীবনকে হেদায়াত হিসেবে মানে,গোল পাকায় মাদানি জীবন নিয়ে। দাবি করে হুজুর সা. মক্কায় নবীসুলভ জীব যাবন করেছেন। কিন্তু মদীনায় গিয়ে শাসক সেজে যান। ড. স্প্রেঙ্গার এ অভিযোগে খুবই সরব। আর্নল্ড টয়েনবি, স্নোক হরগ্রোনজি, জেন অস্টিনসহ অনেকেই এ নিয়ে পাড়া মাত করতে চেয়েছেন। ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইসলামে জোসেফ শাখতের চতুর ভাষ্য-

"এক ধর্মীয় সংস্কারক হিসেবে হযরত মুহাম্মদ সা. মক্কায় জনকল্যাণশীল তৎপরতা গতিশীল করে তুলেন। তবে মদিনায় তিনি ধর্মভিত্তিক নবগঠিত সমাজের শাসক ও আইন প্রণেতা হয়ে যান।"

মজার বিষয় হলো- শাখতদের এ তত্ত্ব অন্য প্রাচ্যবিদদের হাতে প্রবল মার খেয়েছে। তারা এই তত্ত্বের অসারতায় স্থিরচিত্ত এবং এর প্রবক্তাদের চিন্তার স্থূলতায় অবাক হয়েছেন। এর অবাস্তবতা চিহ্নিত করেছেন।

দি প্রিচিং অব ইসলাম গ্রন্থে টমাস ডব্লিউ আর্নল্ড লিখেন-

"ইউরোপের অধিকাংশ লেখক প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, হযরত মুহাম্মদ সা. মক্কা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে মদিনায় হিজরত করলেন, আর পাল্টে দিলেন জীবন চলার গতি। সম্পূর্ণ নতুন আদর্শের এক রূপ নিয়ে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। .... আমার মতে ইউরোপীয় লেখকদের এ মন্তব্য স্থূল। বাস্তবতা বর্জিত। কারণ হুজুর সা. মদীনায় পৌঁছে ধর্মপ্রচারের গুরু দায়িত্ব হাতছাড়া করেননি। তার আঙ্গুলের ইশারায় প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত বিশাল সেনাবাহিনী থাকা সত্ত্বেও ধর্ম প্রচারে অমুসলিমদের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে কখনো তিনি পিছপা হননি।

এ বিষয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে সাদ এমন প্রচুর সংখ্যক চিঠির উল্লেখ করেছেন, যা প্রমাণ করে ইসলাম ধর্মের প্রচারক মদীনায় থাকাকালীন আরবের বিভিন্ন গোত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং গোত্রপতিদের নিকট দাওয়াতী পত্র প্রেরণ করেছিলেন।"

তিনি কি সত্যিই মদীনায় গিয়ে জীবন পদ্ধতি পাল্টে ফেলেন? জবাব দিচ্ছেন স্ট্যানলি লেনপুল– "না। তিনি খুবই খুবই সরল প্রকৃতির ছিলেন। ক্ষমতার শীর্ষে আসন তার পদচুম্বন করলেও নিজের পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং নিত্যকার আসবাবপত্রে পূর্বের মাপকাঠিই অক্ষুণ্ন রাখেন। দু'টি বস্তু তার খুবই প্রিয় ছিলো। একটি হলো আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় অস্ত্র। অন্যটি হলো হলুদ রঙের একজোড়া পোশাক। যা তৎকালীন ইথিউপিয়ার সম্রাট নাজ্জাসী তাঁকে উপঢৌকন হিসেবে দেন। .... তিনি অধিনস্তদের প্রতিও সীমাহীন দয়াশীল ছিলেন। গোলাম এবং ছোটরা সে আচরণই করুক, তিনি তিরস্কার বা রাগ করতেন না। আনাস রা. এর কথা হলো– "আমি একাধারে দশ বছর যাবত নবী সা. এর সেবায় কাটিয়েছি। তিনি একটি বারের জন্যেও কখনো 'উহ্ হু' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। নিজের পরিবার-পরিজনের সাথে সর্বদা মধুর ব্যবহার করতেন। ছোট ছেলে-মেয়েদের আদর করতেন অনেক বেশি। রাস্তায় তাদের দেখলে ডেকে ডেকে সস্নেহে মাথায় হাত বুলাতেন। কারো প্রতি অভিশাপ দেয়ার জন্যে তাকে বলা হলে তিনি জবাবে বললেন– আমি অভিশাপ দেয়ার জন্যে প্রেরিত হইনি। আমাকে পাঠানো হয়েছে বিশ্বের প্রতি রহমত স্বরূপ। হাদীস জানায়– তিনি রোগীর সেবাযত্ন করতেন। জানাযার পিছু পিছু চলতেন। ক্রীতদাসও আহারের আমন্ত্রণ জানালে গ্রহণ করতেন। নিজের পুরনো কাপড়ে নিজেই তালি দিতেন। নিজের ছাগলের দুধ নিজেই দোহন করতেন। (দি স্পিচস এন্ড টেবিল টক অব দি প্রোফেট মুহাম্মাদ সা.)

বসওয়ার্থ স্মিথ লিখেন–

তিনি চতুর্মূখী গুণের আধার ছিলেন। এক সময় চারণভূমিতে, এক সময় সিরিয় ব্যবসায়ীদের সাথে আবার এক সময় নির্জন হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন। সবত্রই সব দিক দিয়ে তুলনাহীন। তিনি সংখ্যালঘুদের মহান সংস্কারক। নির্যাতিত হয়ে তিনি হিজরত করেন মদীনায়। হয়ে উঠেন দিগ্বিজয়ী। এক সময় পারসিক ও রোমান পরাশক্তির সমমানের হয়েও দিন যাপন করতেন প্রথম অবস্থার মতো। অন্য কেউ এমন অপরাজেয় শক্তিধর হলে তার জীবন যাপনে অস্বাভাবিক পরিবর্তন দেখা যেতো। (মুহাম্মদ এন্ড মুহাম্মেডানিজম)

অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সন্ত্রাসের উপস্থিতি আবিষ্কার করতে চেয়েছে হুজুর সা. এর জীবনে। এক্ষেত্রে তারা কোনো ধরনের অবহেলা করেনি। বুদ্ধিবৃত্তিক সকল পন্থা ও ধূর্ততার সকল প্রক্রিয়া অবলম্বন করে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই উৎপাদন করতে পারেনি। মদীনার ইহুদীদেরকে নির্বাসন ও শাস্তিদান নিয়ে যারপর নেই, বিষের বিস্তার করেছে। কিন্তু কার্লাইল, রবার্ট এ গাল্লিক, ম্যাকডোনাল্ড, স্ট্যানলি ল্যানপোল প্রমূখ ইসলামের প্রতি অনুদার হলেও সত্যের স্বার্থে এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। স্ট্রাডিজ ইন এ মস্ক গ্রন্থে স্ট্যানলি লেনপোল লিখেন– মদীনাতে মুসলমানদের ধর্ম এবং স্বয়ং রাসূল সা. কে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছিলো। তিনি শুধু ইসলামের মহান প্রচারক ছিলেন না। মদীনার বাদশাহও ছিলেন। এ কারণে এ শহরে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও রক্ষণাবেক্ষণের সার্বিক দায়িত্বও তার উপরে ছিলো। মদীনার ইহুদীরা ঠাট্টা-বিদ্রুপ এবং ভর্ৎসার দ্বারা তাকে খুব বেশি উত্তেজিত করে তুলে্ তিনি পয়গাম্বর হিসেবে তাদের এই দুর্ব্যবহারকে উপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু মদীনার প্রধান এবং যুদ্ধ চলাকালীন সেনাপ্রধান হিসেবে বারবার তাদের বিশ্বাসঘাতকতাকে ক্ষমা-সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা কিছুতেই সম্ভব ছিলো না। এ সময় মদীনা সেনা নিয়ন্ত্রণে ছিলো। নিরাপদ ছিলো। এ কারণে ইহুদীদেরকে তাদের অপরাধের শাস্তি দেয়া হয়েছে।"

কী 'বিশ্বাসঘাতকতা' করেছিলো ইহুদীরা? তারা হুজুর সা. এর সাথে কৃতচুক্তি ভঙ্গ করে। মদীনা রাষ্ট্রের নাগরিক হয়ে আগ্রাসী শক্তির সহযোগিতা করে। তৎপর হলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার। হুজুর সা. তাদেরকে নতুনভাবে চুক্তির আহ্বান জানালেন। বনু নযীর এ আহ্বান প্রত্যাখান করলো। ফলে তাদেরকে মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসের অনুমতি দেয়া সম্ভব ছিলো না। তাদেরকে নির্বাসিত করা হলো। বনু কুরাইযাগণ নতুন করে চুক্তি সম্পন্ন করলো। তাদেরকে পূর্ণ নিরাপত্তা দেয়া হলো। সহীহ মুসলিম শরীফে এ ঘটনা সংক্ষেপে এসেছে– "আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন বনু নযীর ও কুরাইজার ইহুদীরা হুজুর সা. এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিলো। হুজুর সা. নবু নযীরকে নির্বাসনদণ্ড দান করেন। আর বনু কুরাইজাকে মদীনায় অবস্থান করতে দেন এবং তাদের প্রতি সদয় হন।"

আহযাবের যুদ্ধে বনু কুরায়যা প্রকাশ্যে চুক্তি লংঘন করে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধ করে। মদীনার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে এক ভয়াল হুমকি ছিলো তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতা। এর ফলে যে কোন মুহূর্তে মদীনার পতন হবার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছিলো। এ যুদ্ধে কুরাইশরা পরাাজিত হয়। আর বনু কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত অবধারিত হয়। খন্দক যুদ্ধ হতে ফিরে কাউকে অস্ত্র

না খোলার নির্দেশ দেন হুজুর সা.। অভিযান করেন বনু কুরাইযার দিকে। ওরা আপোষ মীমাংসায় রাজী হলে হয়তো শর্ত সাপেক্ষে নিরাপত্তা পেতো। কিন্তু তারা মুসলমানদের উপর আক্রমণের জন্যে অপেক্ষা করছিলো। যখন আলী রা. তাদের দূর্গের নিকটে গেলেন, তখন তারা হুজুর সা.কে গালি দিতে লাগলো। তাদের দুর্গ অবরুদ্ধ হলো। এক মাস পরে তারা বললো– সাদ ইবনে মায়াজের বিচার তারা মেনে নেবে। হুজুর সা. তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন।

মদীনা রাষ্ট্রে ইহুদীদের বিধি-বিধান পরিচালিত হতো তাওরাত কিতাবের আলোকে। সেই অনুসারে সাদ ইবনে মায়াজ রা. ফয়সালা দিলেন– "যারা সরাসরি যুদ্ধ করেছে, তাদেরকে করা হবে হত্যা। নারী-শিশুরা হবে বন্দী। মাল-সম্পদ হবে মুসলমানদের অধিকৃত।"

ইহুদীরা জানতো তাওরাতের আলোকে বিচার হলে তাদের পরিণতি এমনটিই হবে। তাওরাতের বিচার থেকে বাঁচার জন্যেই তারা নিজেদের সাথে চুক্তিবদ্ধ আওস গোত্রের সর্দারের ফয়সালা কামনা করছিলো। কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থের আলোকে এ শাস্তি এড়াবার কোনো পথ ছিলো না। তাদের নেতা হুই ইবনে আখতাবের ভাষায়– 'এটি আল্লাহর এক আদেশ, যা লিপিবদ্ধ ছিলো। এ এক শাস্তি, যা আল্লাহ পাক বনী ইসরাইলের জন্যে নির্ধারিত করে রেখেছিলেন।' ইসলামের প্রকৃতি মূলত রহমশীল। ইহুদীরা রহমশীল আচরণ বারবার পাচ্ছিলো আর বারবার ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছিলো। শেষ পর্যন্ত তারা সকল পথ বন্ধ করে দিয়ে নিজেদেরকে কঠোর সিদ্ধান্তের মুখোমুখি করে নেয়। অথচ ইসলাম প্রতিশোধপরায়ণ নয়। মক্কার ভয়াবহ শত্রুদের ক্ষেত্রেও অবলম্বন করা হয়েছে দয়ার নীতি।

এ দিক থেকে সুবিধা করতে না পেরে বহু প্রাচ্যবিদ দাঁতের কসরত চালিয়েছে ইহুদী বন্দিনী রায়হানা প্রসঙ্গে। গজওয়ায়ে বনি কুরাইযায় তিনি বন্দি হন। তারা লিখেছে– হুজুর সা. তাকে আলাদা রাখার নির্দেশ দেন। এবং কয়েকদিন পরে তার অন্তঃপুরে নিয়ে যান। তাদের দাবি– যুদ্ধবন্দিনীদের সাথে হুজুর সা. সহবাস করতেন। এক ধৃষ্ট লেখকের ভাষায়– 'ইসলামের প্রবর্তক যখন শত শত ইহুদী বন্দির লাশের দৃশ্য দেখলেন, তখন ঘরে ফিরে চিত্তবিনোদন করলেন রায়হানাকে নিয়ে।"

অথচ বন্দি রায়হানাকে সাথে সাথেই মুক্তি দেয়া হয়। ইতিহাসের আকরগ্রন্থ হাফিজ ইবনে মান্দার 'তাবাকাতে সাহাবার' ভাষ্য– "রায়হানাকে বন্দি করা হয়। পরে মুক্তি দেয়া হয়। তিনি তার গোত্রে ফিরে যান এবং মর্যাদার জীবন যাপন করেন।" তবে অন্য বর্ণনায় স্পষ্ট হয়– হুজুর সা. এই দাসীকে মুক্ত করে বিয়ে

করেন। বর্ণনাটি অত্যন্ত দুর্বল। এর ভিত্তি হলেন গল্পকার ওয়াকেদী। দাসী রায়হানাকে যদি মুক্ত করে হুজুর সা. বিয়ে করেন, সেটা তো তার প্রতি অনুগ্রহ। একজন দাসীকে এই মর্যাদা কে দিতো? তৎকালীন পৃথিবীর ইতিহাস দেখুন। দাসীরা সকল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হতো। পাশবিক জীবন যাপনে বাধ্য হতো। মালিক তাদেরকে ব্যবহার করতেন যৌনদাসী হিসেবে, পণ্য হিসেবে। এটাই ছিলো স্বীকৃত পন্থা। স্বাভাবিক নিয়ম। বিশেষত শত্রুতাকারী সম্প্রদায়ের বন্দি দাস-দাসীদের সাথে খুবই কঠোর আচরণ করা হতো। সেখানে বিশ্বাসঘাতক ইহুদী সম্প্রদায়ের এই দাসীকে যদি হুজুর সা. মুক্তি দিয়ে আপন স্ত্রীর মর্যাদা দেন, সেজন্যে ইহুদী-খ্রিস্টান ঐতিহাসিকদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত ছিলো। তাদের তাকানো উচিত ছিলো নিজেদের প্রতি। নিজেরা দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে দখলদারী ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে বন্দিনী নারী ও দাসীদের সাথে কেমন আচরণ করেছে। কোনো দাসীকে স্ত্রীর মর্যাদা দানের কথা ভাবতেই পারতো না তাদের আত্মগর্বী পূর্বপুরুষেরা।

আগেই বলেছি, ওয়াকেদীর বর্ণনা নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু তাকে যদি সত্য বলে মেনেই নেই, তাতে হুজুর সা. এর নবী সুলভ চরিত্র ও উন্নত মানবতাবোধ প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা সেখানেও নিজেদের হিংসা ও ক্ষুদ্রতার প্রদর্শনী ঘটালো।

হযরত মুহাম্মদ সা. এর সত্তা ও সুমহান চরিত্রে আরো নানা দিক থেকে আঘাত করতে চেয়েছে প্রাচ্যবিদরা। কিন্তু প্রতিটি আঘাত ব্যর্থ হয়ে তাদের দিকে ফিরে গেছে। তাদের হতাশা বাড়িয়েছে। এবং কোনো না কোনোভাবে নিজেদেরই বলয় থেকে এর প্রতিবাদ উঠেছে।

কেন নয়? একজন মারগোলিয়থ মক্কায় অবস্থানকালে বিপন্ন মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের পেছনে খুজে বেড়ালেন 'গভীর ষড়যন্ত্র', তায়েফে হুজুর সা. এর দাওয়াতী মিশনে তালাশ করলেন কূটকৌশল, সেই সব ষড়যন্ত্রপ্রিয় প্রাচ্যবিদদের ভিত্তিহীন বক্তব্য কেন সম্মুখীন হবে না প্রতিবাদের? সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও শত্রুরা যখন কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে ব্যর্থ হতে থাকলো, তাদের ব্যর্থতাই প্রমাণ করলো রাসূলে কারীমের সা. মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও নিষ্কলুষতা প্রাকৃতিক সত্যের মতো সুনিশ্চিত।

এ সত্যের ক্ষমতা ও দৃঢ়তার মোকাবেলায় তাদের দাঁতের কসরত আকার্যর হতে থাকলে তারা মনোযোগ দিলো কুরআনুল কারীমের প্রতি। ইউরোপে কুরআনুল কারীমের অনুবাদ হয় বহু আগেই। ১১৪৩ সালে ইংরেজ পণ্ডিত রবার্ট অব কেটন ল্যাতিন ভাষায় কুরআন অনুবাদ করেন। অনূদিত কুরআনের নাম দেন Lex Mahumet the False Praphete (যার ইংরেজি করা হয় the law

of Mahumet the False Prophet) নাম থেকেই বুঝা যাচ্ছে অনুবাদটি ছিলো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বিভ্রান্তি ছিলো প্রকট। খ্রিস্টান চার্চে এটা খুবই চালু হয়। কয়েকশো বছর ধরে পশ্চিমা বিশ্বে কুরআনের উদ্দেশ্যে ও মর্ম অনুধাবনে এটাই একমাত্র উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মূল আরবীর দিকে না তাকিয়ে একেই অবলম্বন করে অসংখ্য ভুল ও বিভ্রান্তিসহ ইউরোপের অন্যান্য ভাষায় কুরআন অনূদিত হয়। ১৬৪৯ সালে রাজা প্রথম চার্লস এর চ্যাপলেইন আলেকজান্ডার রস ফরাসী sieur duryer এর লা আল কুরআন দে মাহামেত অবলম্বনে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন আল কুরআন। যার শিরোনাম ছিলো– the Alcoran, teanslated out of Arabic into Enerch. By the sieur duryer , lors of Malezair and Resident for the Frenen king at Alexandria and newly Englished for the satisfaction of All that desire to look into the Turkish Vanities. শিরোনামই বলে দিচ্ছে অনুবাদের সাথে মূল আরবীর কোনো সম্পর্ক ছিলো না। এর প্রায় ১০০ বছর পরে, ১৭৩৪ সালে জর্জ সেল নামক জনৈক আইনজীবি ও প্রাচ্যবিদ সরাসরি আরবী থেকে কুরআন অনুবাদ করেন। কাজটির শিরোনাম ছিলো– the Alcoran of Mohammed. tr. into English immediately From the original Arabic. বলা হয় সেল তার অবসর সময়ে আরবী ভাষা অধ্যয়ন করতেন। অনেকের দাবি তিনি ২৫ বছর মুসলিম দেশ ভ্রমণ করেন। এটা ভুল। তিনি কোনো মুসলিম দেশে যান নি। নিজেই জানিয়েছেন। তিনি আরবী শিখেন মূলত সোসাইটি ফর দি প্রমোশন অব খ্রিস্টান নলেজ ইন লন্ডন এর পৃষ্টপোষকতায়। সিরিয়ান খ্রিস্টানদের জন্য নিউ টেস্টামেন্টের একটি আরবী ভাষ্য রচনার জন্যে। কুরআন মাজীদের অনুবাদে তিনি সাহায্য নেন

লুইস মারচি এর ল্যাতিন অনুবাদের। সেটা প্রকাশিত হয় রোমে, ১৬৯৮ সালে। এর পাশাপাশি লন্ডনের ডাচ চার্চে সংরক্ষিত আরেকটি অনুবাদ তিনি সংগ্রহ করেন। ইস্তাম্বুলে রচিত এই পাণ্ডুলিপি ১৬৩৩ সালে ল্যাতিন চার্চকে দান করে এক ডাচ বণিক। একশো বছর পরে সেল একে কাজে লাগান। ১৬৪৯ সালে ফরাসী অনুবাদ থেকে রসের অনুবাদ সম্পর্কে সেল মন্তব্য করেন– 'এতে ফরাসী অনুবাদের ভুলের সাথে আরো বহু ভুল যুক্ত হয়েছে।' (সেল এর তর্জমার ভূমিকা) সে তুলনায় তার অনুবাদ ছিলো পাঠযোগ্য। এতে ছিলো বিশদ নোট। বিশ্লেষণে তিনি ছিলেন তুলনামূলকভাবে বাস্তববাদী। কিন্তু কুরআনের সন্দেহাতীত সত্যকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করতে চেয়েছেন। তার সুরক্ষিত নিয়শ্চয়তাকে সন্দেহগ্রস্থ করতে চেয়েছেন। এবং প্রচ্ছন্নভাবে দাবি করেছেন- কুরআন মুহাম্মদ সা. এর রচনা।

সেলের সূচিত এ প্রক্রিয়া বিশেষ পর্যায়ে উপনীত হয় অস্ট্রেলিয়ান প্রাচ্যবিদ আর্থার জেফরির হাত দিয়ে। চার্লস হেমিল্টন, থিউডর নোলডেকি, এ.জে. ইউংসিংক, ফেডারিখ স্ক্যালি প্রমুখ কুরআন মাজীদকে হুজুর সা. এর রচনা হিসেবে অভিহিত করলেন প্রকাশ্যভাবে। কুরআন প্রসঙ্গে এরা ছাড়াও অধিকাংশ প্রাচ্যবিদদের সুর আসলে একটাই এবং একটাই তাদের আক্রমণের কেন্দ্রভূমি। তাদের লক্ষ্য একদিকেই ধাবিত এবং সকল প্রক্রিয়া একটি কথাকে প্রমাণ করতে সচেষ্ট। সেটা হচ্ছে কুরআন হুজুর সা. এর প্রণয়ন, আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ নয়। অথচ হুজুর সা. লিখতে জানতেন না। পড়তে পারতেন না। তিনি যা বলতেন, তা সুরক্ষিত হতো। কিন্তু তা কখনোই কুরআনের মতো ছিলো না। কুরআন ও হাদীসের ভাষার তাফাত খুবই পরিষ্কার। মানগত ব্যবধান আকাশ-পাতাল। হাদীসে রাসূলের সা. ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য অনবদ্য। কিন্তু কুরআনের সাথে তার কোনো সাদৃশ্য নেই, তুলনা নেই। আরবরা হাদীসের ভাষাকে নিজেদের ভাষারীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ দেখতো, কিন্তু কুরআনের ভাষাভঙ্গি ও এর আশ্চর্য প্রভাবে বিস্মিত হয়ে যেতো। তারা স্তব্ধ, স্তম্ভিত ও বিস্মিত চিত্তে প্রশ্ন করতো– এ বাণীর উৎস কোথায়?

হাদীসসমূহ অধ্যয়ন ও গবেষণায় স্পষ্ট হয় তা এমন এক হৃদয় থেকে উৎসারিত, যা খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ। যে হৃদয় খোদার মহিমা ও কল্পনাতীত মাহাত্মে কম্পমান। কিন্তু কুরআন অধ্যয়নে দেখা যায় পরাক্রমও ঐশ্বর্যের বিচ্ছুরণ। সর্বত্রই নির্ভেজাল সৌন্দর্য, উপমার বৈচিত্র, বিদ্যুৎ চমকের মতো আশ্চর্য উদ্ভাস, ও সহসা রূপান্তর। সর্বত্রই এক অমোঘ, শক্তিমান, পরাক্রান্ত বজ্রধ্বনি। হাদীসে কেবলই বান্দার বিনীত সংলাপ। কুরআনে বান্দাকে কেউ ডাকছেন নিজের দিকে। আরবের ভাষাবিদরা হাদীসের উৎস জানতো। কিন্তু কুরআনের এই অমোধ, ঐন্দ্রজালিক বাণীর সাথে তার পার্থক্য লক্ষ্য করে তারা হলো স্তব্ধ, বিমূঢ়। এ বাণী উচ্চারিত হচ্ছিলো উর্ধ্বে আকাশ বিদীর্ণ করে, নিম্নে ধরণীতল চৌচির করে, স্বর্গ-নরকের, জীবিত-মৃতের, দৃশ্য-অদৃশ্যের তাবৎ রহস্যের জানালা খুলে। ফলে যারাই শুনলো, অবাক হয়ে ভাবলো- এ বাণীর উৎস কোথায়?

এক উম্মী নবীর পক্ষে কি এ বাণী রচনা সম্ভব? না কখনো নয়। এখানে আছে জীবন ব্যবস্থার সামগ্রিক সমাধান। যুদ্ধ-শান্তি, সন্ধি-সংঘর্ষ, ব্যক্তি-বিশ্ব, আইন-আদালত, পরিবেশ-প্রতিবেশ, অতীত-বর্তমান, ইহকাল-পরকাল, শাস্তি-পুরস্কার, উন্নয়ন-অধঃপতন, চরিত্র-নৈতিকতা, সদাচার-কদাচার, মনস্তত্ব-সমাজবিদ্যা, কূটনীতি-রাজনীতি, অর্থনীতি-আধ্যাত্মিকতা, ভূতত্ত-সৃষ্টিতত্ত, গ্রহ-নক্ষত্র, চন্দ্র-সূর্য, গ্যালক্সি-ছায়াপথ, সমুদ্র-জলযান, শব্দ-নৈশব্দ, আলো-অন্ধকার, বায়ু প্রবাহ-

ঋতুবৈচিত্র, ফুলের পরাগ-মানবভ্রুণ, জৈব-অজৈব শক্তি, খনিজ সম্পদ, প্রাণবৈচিত্র সংখ্যাতত্ত-কাব্যতত্ত, দর্শন-নীতিবিদ্যা, ইতিহাস-ভবিষ্যদ্বাণী, সভ্যতার উত্থান-পতন, ধর্মতত্ত, ইবাদত, বাকশিল্প-ধ্বনিশিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, ভ্রমণ-গৃহীজীবন, শাসক-শাসিত, অপরাধ-বিচার, সম্পদ-দারিদ্রসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বজনীন, চিরন্তন, বাস্তব, অনস্বীকার্য সত্য ও শ্বাশত বর্ণনার সমাহার এতে আছে। জ্ঞানের সকল উপকরণ যার সামনে এসে থমকে যায়। অবনত হয়। মানবীয় সামর্থ্যের সকল অবলম্বন যার সামনে অক্ষম অসহায়-সেই মহাগ্রন্থ কীভাবে রচনা করবেন একজন উম্মী– যিনি কোথাও শিখেন নি কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞান?

এ গ্রন্থ যদি তাঁরই রচিত হবে, তাহলে স্থানে স্থানে তাঁকেই সম্বোধন করে সতর্কবাণী, ধমক এমনকি তার ভুল-ত্রুটির উল্লেখ থাকছে কেন? এমন বিষয় উল্লেখ করা হলো কেন- নিজের বিষয়ে যা প্রকাশ করতে চায় না কোনো মানুষ?

এই মহাগ্রন্থ প্রদান করলো অতীতের এমন সব বিবরণ, যুগ যুগের গবেষণা যাকে অস্বীকার করতে পারে নি। যাকে বাস্তব ও যথার্থ বলে প্রমাণ করলো আধুনিক বিজ্ঞান। অথচ অন্য সব উৎসে বর্ণিত একই বিবরণ ভুল ও বিভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হলো। এই গ্রন্থ প্রদান করলো এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী, যা সময়ের ব্যবধানে বাস্তবে পরিণত হলো। এই গ্রন্থে বিবৃত হলো এমন সব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, হাজার বছর পরে এসে যাকে অবধারিত সত্য বলে নতুন তাৎপর্যে উপলব্ধি করতে পারলো বিজ্ঞান।তৎকালীন পৃথিবীতে যেমনটি ভাবা হতো না, জানা ছিলো না। যার চিন্তা উদয় হয়নি কারো ভাবরাজ্যে- এমন সব বৈজ্ঞানিক সত্যের সমাহার এ গ্রন্থে। সেটা কীভাবে ঘটলো। যুগ-যুগান্তের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মানব মনীষা ভাবলো এ গ্রন্থ কোনো মানুষের তৈরী হতে পারে না। তাহলে এ বাণীর উৎস কোথায়?

জবাব দিচ্ছে স্বয়ং আল কুরআন। "কুরআন এমন গ্রন্থ নয়, যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দ্বারা উদ্ভাবিত হতে পারে। এটি সমুদয় পূর্বতন ঐশী বাণীর সত্যায়নকারী। এবং যে শাশ্বত ঐশী গ্রন্থ সমস্ত সংশয় সন্দেহের অতীত। বিশ্ববিধাতার পক্ষ থেকে তারই পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ (সূরা ১০ : আয়াত ১৭) "আর যারা ঈমান এসেছে, সৎ কাজ করেছে, তারা সেই সব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, যা মুহাম্মদের সা. প্রতি নাযিল হয়েছে। (সূরা ৪৭ আয়াত : ২) "রমযান মাস। এ মাসেই কুরআন নাযিল হয়েছিলো মানবতার জন্যে হেদায়েত, এবং ন্যায়-অন্যায় পার্থক্যের সুস্পষ্ট নিয়ামক। (সূরা : ২ আয়াত : ১৮৫) 'নিশ্চয় আমি তা মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি। (সূরা ৯৭ আয়াত : ১) নিশ্চয় কুরআন বিশ্বপতির নিকট

থেকেই অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ। সত্যপরায়ণ ও বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রাঈল এই বাণী নিয়ে অবতীর্ণ হন। আপনার হৃদয়ে, যেন আপনি লোকজনকে সতর্ক করে দিতে পারেন- প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় (সূরা ২৬ আয়াত : ১৯২-১৯৫)

কুরআন পরিষ্কার বলে দিচ্ছে এটা মুহাম্মদ সা. এর রচনা নয়। আল্লাহর কিতাব। কেউ যদি তা অস্বীকার করে, তাহলে তার ও তাদের জন্য অবারিত আল্লাহর চ্যালেঞ্জ। "আমি স্বীয় বান্দার প্রতি যা নাযিল করেচি। এতে যদি তোমরা সন্দেহ পোষণ করো, তাহলে কুরআনের মতো একটি সূরা নিয়ে এসো। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে ডাকো। তোমরা যদি তা করতে না পারো, এবং কখনো করতে সক্ষম হবে না। অতএব, ভয় করো ঐ আগুনকে, যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর। (সূরা : ১, আয়াত : ২৩)

কুরআনের এই চ্যালেঞ্জ কারবার ঘোষিত হয়েছে। তৎকালীন অস্বীকৃতিবাদীদের জন্যে আজকের মিথ্যারোপীদের জন্যেও। এই চ্যালেঞ্জ প্রতিটি যুগে, প্রতিটি প্রেক্ষাপটে তাদের উদ্দেশ্যে বিঘোষিত, যারা কুরআনকে আল্লাহর বাণী হিসেবে মেনে নিচ্ছে না।

আরবে তখন ভাষা, সাহিত্য, কবিতা ও অলংকারের উদ্দাম চর্চা ছিলো। প্রত্যেকেই পারদর্শী ছিলো কবিতায়, বাঁকশিল্পে। শ্রেষ্ঠ কবি ও ভাষাবিদরা ছিলো জীবিত। তুলনাহীন বাগ্মী ও বাকশিল্পীরা এই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হলেন। কিন্তু কেউই পারলেন না জবাব দিতে। তারা যুদ্ধ করে ইসলামের বিরুদ্ধে জীবন দিলো, জীবিতরা হুজুর সা. এর বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার শক্তিপ্রয়োগ করলো। কিন্তু বিনাযুদ্ধে ইসলামকে পরাজিত করার জন্যে প্রয়োজন ছিলো একটি মাত্র সূরা। যা কুরআনের সমতুল্য হবে। সাধ্য থাকলে আরবরা হাজার সূরা বানাতো। কিন্তু লক্ষ্যস্থল ছিলো ওদের সীমানার বাইরে। কুরআনের মুকাবেলা সম্ভব ছিলো না কারো পক্ষে। নিরুপায় হয়ে কুরাইশ নেতা ওলীদ ইবনে মুগীরা বলতে বাধ্য হলো– এ বাণী চিরদিন বিজয়ী হতে এসেছে। এর পরাজয় অসম্ভব। (খাসাইসূল কুবরা : জামাল উদ্দীস সুয়ুতী)

ওতবা ইবনে রবীয়া সূরা হামিম সাজদার তেলাওয়াত শুনে সেজদার আয়াতে বাণীর প্রভাবে সেজদায় চলে গেলো। (খাসাইসুল কুবরা : সুয়ুতী) এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। কাফেররা কুরআনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করবে তো দূরে থাক, তারা এর প্রভাবে মুগ্ধ, বিস্মিত ও নির্বাক হয় গেছে। কেউ কেউ এর অনন্যতার কথা স্বীকার করেছে প্রকাশ্যে।

জার্মান প্রাচ্যবিদ ডক্টর হ্যানস কেসপার গ্রাফ, ভন ভটমার প্রমুখ তৎকলীন আরবদের ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্যে ধোয়াশা সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। দাবি

করেছেন- হয়তো কুরআনের মোকাবেলায় উত্তম কিছু রচিত হয়েছে। যা আমাদের পর্যন্ত আসে নি। এ বিভ্রান্তির জবাব দিয়েছেন আল্লামা আবু সুলাইমান খাত্তাবী রাহ.। রাসাইল ফি এ'জাজিল কুরআনে তিনি লিখেন এ ধারণা একদম ভিত্তিহীন। চিরকালই মানুষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহকে অবশ্যই বর্ণনা করে আসছে। পরবর্তি বংশধরদের তা জানাচ্ছে। বিশেষ করে যে সব বিষয়ে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে। কুরআনের ব্যাপারটা তো তখন গোটা বিশ্বে উৎসাহ ও খ্যাতির কেন্দ্রবিন্দু ছিলো। যদি এর কোনো মোকাবেলা করা হতো, সেটা আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হতো। আমাদের পর্যন্ত সে সংবাদ না পৌঁছা ছিলো অসম্ভব।

যদি একে সম্ভব বলে চালিয়ে দিতে চান, তাহলে এটাও তো সম্ভব যে, হুজুর সা. এর সময় আরো কোনো নবী বা বহু নবী এসেছিলেন। তাদের কাছে কিতাব নাযিল হয়েছিলো, ইসলাম ছাড়া অন্য শরীয়ত তারা প্রবর্তন করেন- কিন্তু তা আমাদের কাছে পৌঁছেনি। এ কথা যদি অকল্পনীয় হয়, তাহলে কুরআনের মোকাবেলা হয়েছিলো- এটাও অকল্পনীয়।"

তবে কেউ কেউ কুরআনের মোকাবেলার চেষ্টা করেছিলো। ইতিহাস সে সব বিবরণ সংরক্ষণ করেছে। যা সর্বদাই বিবেক ও জাগ্রত চেতনার অধিকারী প্রত্যেকের কাছে কৌতুকের ব্যাপার এবং নিরেট ব্যর্থতার দলীল। যেমন সূরা কারিয়ার মোকাবেলায় কেউ লিখেছিলো–

الفيل ما الفيل وما ادراك ما الفيل له مشفر طويل وذنب اثيل
وما ذآت من خلق ربنا لقليل.

সূরা ফিলের মোকাবেলার ব্যর্থ প্রয়াস–

الم تر الى ربك كيف فعل بالحبلى اخرج منها نسمة تسعى
بين شراسيف وحشى.

(রাসাইল ফি এ'জাজিল কুরআন : খাত্তাবী)

আরবের প্রশিদ্ধ সাহিত্যিক আবদুল্লাহ ইবনে মুকাফফা' কুরআনের চ্যালেঞ্জের জবাব দিতে চেয়েছিলেন। তিনি যখন وقيل يا ارض ابلعى مائك وياسماء اقلعى - এই আয়াতের তেলাওয়াত শুনলেন, বলে উঠলেন– স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, এ বাণীর মোকাবেলা অসম্ভব। এ হচ্ছে আল্লাহর কালাম।' (খাত্তাবীর এ'জাজুল কুরআন) ইসলাম পূর্ব সাত আরব কবির অন্যতম লাবিদ আবু রাবিয়া যখন সুরা বাকারার প্রথম আয়াত কাবা ঘরের দেয়ালে দেখলেন, এর অলঙ্কারিক শ্রেষ্ঠত্বে

বলে উঠলেন– খোদার কসম! এ কোনো মানুষের বাণী নয়। (এ'জাজুল কুরআন : সুয়ূতী)

অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ কুরআনের এ অলৌকিকত্বকে স্বীকার করতে রাজী নন। আরবী গদ্য ও কবিতার কোনো কোনো অংশকে কুরআনের মতোই সমৃদ্ধ বলে তারা দাবি করেন। এ প্রসঙ্গে লিউডেনের কুরআন বিশ্বকোষের 'কুরআনের অলৌকিকতা' শীর্ষক প্রবন্ধের উল্লেখ করা যায়। লেখক রিচার্ড সি মার্টিল এতে মুসাইলামাতুল কাযযাবের উল্লেখ করে দাবি করেছেন– তার কবিতার মান কুরআন তুল্য। অথচ আবরীভাষী কোনো নরাধমও মুসয়লামার হাস্যকর কথাবার্তাকে কুরআনের সাথে তুলনা করতে লজ্জা পায় বিংশশতকের প্রথম দিকে খ্রিস্টান মিশনারীরা কুরআনের অনুরূপ বই লেখার চেষ্টা করে। এ কাজে কিছু লোককে নিয়োগ দেয়। নাসির উদ্দীন জাহের নামে এক খ্রিস্টান লেখক কুরআনের অলৌকিকতাকে অস্বীকার করে প্রবন্ধ লিখে। সে তার ভাষায় সূরা ফাতেহা ও কাওসারের অনুরূপ সূরা তৈরী করে। কিন্তু আরব সাহিত্যিকদের চোখে তা ছিলো অসঙ্গতিতে ভরা। ব্যক্তিগত চিন্তার প্রভাব তাতে ছিলো প্রকট। অর্থগত আবেদন, বিষয়বস্তুর দীপ্তি, স্টাইলের অনন্যতা, ও শৃঙ্খলার যথার্থতা ছিলো তাতে অনুপস্থিত। কাঙ্খিত অর্থের আভাস তাতে মিলেনি। ভাষাও ছিলো না অলঙ্কারপূর্ণ। ১৯৯৭ সালে আমেরিকান অনলাইন কয়েকটি জাল সূরা প্রকাশ করে। কথিত সূরাগুলোর নাম দেয়া হয় মুসলিমুন, তাজাসসাদ, ও ঈমান। কুরআনের আয়াত থেকে চুরি করা শব্দ, বক্তব্য থাকা সত্তেও এ সবের কোনো কোনো অংশ অস্পষ্ট, অর্থহীন থেকেছে। রচনার বিভিন্ন অংশের অসংগতি ও বৈপরিত্ব তার ভেজালকে স্পষ্ট করে দিয়েছে।

কুরআনের বাগ্মীতা, অলঙ্কারিত্ব, ভাষাগত উৎকর্ষ, বিশুদ্ধতা, বিধি-বিধান, জ্ঞান-বিজ্ঞান, রহস্য, স্টাইল, ছন্দ, সুর ইত্যাদিতে সন্দেহ সৃষ্টির প্রয়াসও চলে আসছে। উইলিয়াম জেমস হিস্ট্রি অব সেভিলাইজেশনে দাবি করেন– "কুরআনে আছে বিক্ষিপ্ততা। একেক সময় একেক সূরা নাযিল হওয়ায় কোনো শৃঙ্খলা নেই। আছে পুনরাবৃত্তি। ....."

কার্লাইল বলেন– "কুরআন একটি গোলমেলে, ক্লান্তিকর, অপরিশোধিত ও এলোমেলো জিনিস। সীমাহীন পুনরাবৃত্তি, ভীষণ প্যাচানো, জটিল, অত্যন্ত অপরিশোধিত– এক কথায় বিশৃঙ্খল, সমর্থনঅযোগ্য মুর্খতা।" (অন হিরোজ, হিরো ওয়ারশিপ এন্ড দি হিরোইজ ইন হিস্ট্রি)

কার্লাইল যে বিষয়গুলো নিয়ে কঠিন মন্তব্য করে বসলেন, বিষয়গুলো কুরআন নাযিলের যুগে অমুসলিম ভাষাবিদদের কাছেও সমালোচিত হয়নি। বরং তারা

এর বিশুদ্ধতা ও অভিজাত্যকে অলৌকিক মেনেছেন। মুসলিম ভাষাবিদদের কথা বাদ দিলাম। তৎকালীন অমুসলিম পাণ্ডিত খালেদ বিন উকবা, তাফিল বিন আজরু, উৎবা বিন রাবিআ, আনিস বিন জিলাদেহ প্রমুখ কুরআনের ভাষারীতিকে পরিশোধিত, বিন্যস্ত, সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত হিসেবে বরণ করে নেন। কার্লাইলদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে স্ববিরোধের বিবরণ দিলে বিশাল অধ্যায় দাঁড়ায়। কার্লাইলের মতো পণ্ডিত বাইবেলের ভাঁজে ভাঁজে ছড়ানো অসঙ্গতি, স্ববিরোধ, তথ্যগত ভুল, ঐতিহাসিক ভ্রান্তি, অবৈজ্ঞানিক বর্ণনা ইত্যাদির দীর্ঘ ও বিস্তৃত পরিমাণ নিয়ে কোনো কথা বলেছেন কী না জানি না। তবে বাইবেলে প্রচুর পুনরাবৃত্তি, প্যাচ জটিলতা ও গোলমেলে বিষয় থাকলেও কুরআনের উপর বিষয়গুলো চাপাতে চাইলেন। এবং তার আসল খ্রিস্টান মনের পরিচয় জাহির করলেন– 'সমর্থনঅযোগ্য মুর্খতা' কথাটায়। এখানে গোটা বক্তব্য গালাগালির রূপ ধারণ করলো। ভুলে যাচ্ছি না তিনি হুজুর সা. কে কুরআনের লেখক বলে অভিহিত করেছেন এ গ্রন্থে। তা যে আল্লাহর বাণী নয়, সেটা বুঝাবার জন্যে এর উপর কিছু ত্রুটি না চাপালে চলছিলো না। ইতিহাসও বাস্তবতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে তিনি তাই কথাগুলো বললেন। কোনো প্রমাণ না দিয়েই। কার্লাইলের অভিযোগ প্রত্যাখাত হয় সচেতন ও সতর্ক প্রাচ্যবিদ মহলে। ফরাসী প্রাচ্যবিদ আর্নেস্ট রেনান কুরআনের বিস্ময়কর ভাষাশৈলী, বিষয়বস্তু ও সৌন্দর্য সম্পর্কে বলেন– 'আমার গ্রন্থাগারে রাজনৈতিক সমাজিক সাহিত্য ও অন্যান্য বিষয়ে হাজার হাজার বই আছে। এগুলোর কোনোটিই আমি একাধারে বেশি পড়িনি। কিন্তু একটি গ্রন্থ সব সময় আমার প্রিয়। যখনই ক্লান্তি অনুভব করি, এবং পরিপূর্ণতা ও গভীর মর্মের দরোজা খুলতে চাই, তখনই গ্রন্থটি পড়ি। বেশি মাত্রায় এটি পড়েও ক্লান্ত হইনি। জড়তা অনুভব করি না। এটাই কুরআন- ঐশীবাণী, আসমানী গ্রন্থ।" (উদ্ধৃতি- কুরআন ও জীবন আব্দুর রহমান)

এফ. আরবুথনট বলেন– সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন হলো গদ্যও পদ্যের মিশ্রণে তৈরী বিশুদ্ধতম আরবীর নমুনা। কথিত আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যাকরণবিদরা কুরআনে ব্যবহৃত ভাষারীতি ও ব্যাখ্যায় সঙ্গতি রেখে ব্যাকরণের নিয়মাবলি প্রবর্তণ করেন। বিশুদ্ধ রচনায় তার সমকক্ষ সাহিত্য তৈরীর প্রচেষ্টা সত্তেও কেউই এ ব্যাপারে সফল হতে পারে নি। (উদ্ধৃতি- মুসলিম দর্শনের ভূমিকা– ড. রশীদুল আলম)

জর্জ সেল বলেন– কুরআনের বাচনভঙ্গি সাধারণত মনোহর ও প্রবহমান। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষত যে সব জায়গায় আল্লাহর মহিমা ও গুণাবলি বিবৃত, সে সব অংশ সমুন্নত, সর্বোৎকৃষ্ট। (উদ্ধৃতি- ঐ)

মারগোলিয়থের মতো ইসলাম বিদ্বেষী ও বলতে বাধ্য হন- কুরআন মিলযুক্ত গদ্য অথবা পদ্যে পরিবেশিত। বাচনভঙ্গির দিক দিয়ে একক অনুকরণীয়।' (উদ্ধৃতি : ঐ)

জন নেইশ বলেন- মূল আরবীর ভূষণে কুরআনের নিজস্ব মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য ও মোহিনী শক্তি রয়েছে। এর বাকরীতি সংক্ষিপ্ত ও সমুন্নত। সংক্ষিপ্ত, তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যসমূহ প্রায়ই সমিল। সেগুলো অধিকারী প্রকাশ ক্ষমতার 'বিস্ফোরক শক্তির।' (উদ্ধৃতি : ঐ)

প্রাচ্যবিদ পামর তার 'কুরআন' গ্রন্থে প্রশংসার নামে কুরআনের অলৌকিকতাকে অস্বীকার করেছেন। বলতে চেয়েছেন মানুষের পক্ষে এমনটি রচনা বিস্ময়কর নয়। তবে পামর তো পামর। কার্লাইল তো পামর নন। তাকে উদার হিসেবেই দেখেন অনেকেই। তিনি হুজুর সা. এর জীবন বর্ণনায় বাস্তবতার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছেন। ভেতরের বিদ্বেষ লুকিয়ে রাখতে যত্নবান থেকেছেন। কিন্তু দিন শেষে দেখা গেলো- হুজুর সা. এর প্রশংসায় তিনি যতই উদারতা দেখান না কেন, তার বক্তব্য শেষ পর্যন্ত রাসূলে খোদাকে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবিদার প্রতিপন্ন করছে। কুরআনের ভাষা ও বক্তব্যের উপর ধারাবাহিক আক্রমণের এ হচ্ছে একটি দিন। যাতে দাবি থাকে কিন্তু দলীল থাকে না।

তবে জার্মান প্রাচ্যবিদ জুসেফ পেইন কিছু দলিল দেয়ার চেষ্টা করে হাসির খোরাক হয়েছেন। তিনি দাবি করেন, কুরআনে ভুল আছে। যেমন ابراهيم শব্দকে ابرهيم এবং سيماهم কে سيمهم লেখা হয়েছে। এটা যে কুরআনের স্বতন্ত্র রুসমে খতের (লিখন প্রণালী) বিষয়, পেইনের তা জানা উচিত ছিলো। তার ও তাদের উচিত ছিলো দুনিয়ার সকল মানুষকে মুর্খ না ভাবা। কারণ কুরআন সাত হরফে নাযিল হয়েছে- এ হাদীসের সুক্ষ্ম দিকসমূহ মুসলিম দুনিয়ার অজ্ঞাত নয়। আর কুরআনের লিখন প্রণালীর স্বতন্ত্র এ'জাজে কুরআনের অংশ- এটাও সুবিধিত। অতএব এ নিয়ে জলঘোলা করা অসম্ভব।

তবে উইলিয়াম ড্রেপার সাহেব জল ঘোলা করতে চেয়েছেন ভিন্নভাবে। তিনি কুরআনের মর্মকে খ্রিস্টধর্মের দান হিসেবে চিত্রিত করতে চেয়েছেন। তিনি লিখেন- দামেশকের খ্রিস্টান পাদ্রী বুহায়রা মুহাম্মদ সা.কে ফুসতুরিয় ধর্মবিশ্বাসের মূলনীতি শিক্ষা দেন। তার প্রশিক্ষণহীন, কিন্তু অত্যন্ত গ্রহণ ক্ষমতা সম্পন্ন মেধা গুরুর ধর্মীয় শিক্ষাকে গ্রহণ করার পাশাপাশি তার দার্শনিক ধ্যান-ধারণার গভীর প্রভাব গ্রহণ করলেন। (উদ্ধৃতি : সীরাতুননবী : আল্লামা শিবলী নোমানী)

লাইফ অব মুহাম্মদে উইলিয়াম ম্যুর আরেক কাটি সরেস। তার দাবি মূর্তিপূজা সম্পর্কে আন্তরিক ঘৃণার শিক্ষা তিনি এখান থেকেই পান। নতুন এক

ধর্ম প্রচারের প্রেরণা ও মূলনীতিগুলো এ সফরের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি। মারগোলিয়থ এখন দাবি করবেন– হুজুর সা. মিসর গমন করেছেন। বাহরাইন গমন করেছেন। তিনি সমুদ্র দেখেছেন বলেই কুরআনে সমুদ্রের বিবরণ এতো সুন্দর! এগিয়ে আসবেন কায়িন রবিন, টরি লেস্টার সহ অনেকেই। দাবি করবেন কুরআনের মৌলিক বিষয়সমূহ মুহাম্মদ সা. আহরণ করেন খ্রিস্টবাদ থেকে।

তারা নিজেদের বুনিয়াদ হিসেবে গ্রহণ করেন সামান্য এক তৃণখন্ডকে। এ হচ্ছে রাসূলে কারীম সা. এর বাল্যকালের এক ঘটনা। হুজুর সা. এর বয়স মাত্র এগারো বছর পেরিয়েছে। আবু তালিব বাণিজ্য সফরে দামেশক যাবেন। এতিম ভাতিজার দুঃখী অন্তর যাতে কষ্ট না পান, সে জন্যে তাঁকে সা. সাথে নিলেন। পথে তিনি বসরা শহরে বুহাইরা নামক জনৈক খ্রিস্টান পাদ্রির আস্তানায় উপস্থিত হলেন। বুহাইরা রাসূল সা. কে দেখে বললেন– ইনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। লোকেরা প্রশ্ন করলো– আপনি কীভাবে জানলেন? বুহায়রা বললেন– তোমরা যখন পাহাড় থেকে নামছিলে, তখন সকল পাথর ও বৃক্ষ তাকে সেজদা করছিলো।

ঘটনা এতটুকুই। বুহাইরার সাথে হুজুর সা. এর কোনো কথা হয়নি। কোনো কিছু শেখার তো প্রশ্নই উঠে না। হুজুর সা. তার আস্তানায় প্রবেশ করেননি। কিন্তু প্রাচ্যবিদরা এই তিলকে তাল নয় বরং পাহাড় বানিয়ে ছাড়লেন। অথচ প্রকৃতপক্ষে এ ঘটনাই আগাগোড়া দুর্বল। মুসলিম দুনিয়ায় এটা খুব জনপ্রিয় কাহিনী। বিভিন্ন সূত্রে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু সব সূত্রই মুরসাল। অর্থাৎ যিনি এর প্রথম বর্ণনাকারী, তিনি ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। অথবা যে উপস্থিত ছিলেন, তার নাম উচ্চারণ করে দায়িত্ব নিচ্ছেন না। বিষয়টি স্পর্শকাতর। ইমাম তিরমিযী রহ. ঘটনাটি উল্লেখ করে লিখেন– এ সূত্র ছাড়া অন্য কোনো সূত্রে হাদীসটি আমি পাইনি।' আবার প্রাপ্ত সূত্র হচ্ছে হাসান ও গরীব। হাসান হাদীসের মর্যাদা সহীহ হাদীসের চেয়ে কম। আবার তা গরীব তথা একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত হলে তার মর্যাদা আরোও কমে যায়। এর বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ান রয়েছেন। ইমাম যাহবী তাকে মিযানুল ই'তেদালে 'অযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী' অভিহিত করেন। এবং বুহাইরা বিষয়ক কাহিনীকে তার সবচে বড় মুনকার তথা প্রত্যাখাত বর্ণনা সাব্যস্ত করেন। এ হাদীসে আবু বকর সিদ্দীক রা.ও বেলাল রা.কে হুজুর সা. এর ভ্রমণ সঙ্গী ছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ বেলাল রা. এর অস্তিত্বই তখন নেই। আর আবু বকর রা. ছিলেন শিশুমাত্র। তাবাকাতে ইবনে সা'দে (১ম খণ্ড) হাদীসটিকে মুরসাল বা মু'দাল বলে অভিহিত করা হয়েছে। মু'দাল হচ্ছে ঐ হাদীস, যেখানে বর্ণনাকারী সাহাবীর নাম নেই, তাবেয়ীর নামও নেই।

এমতাবস্থায় তবে তবেয়ী সেই ঘটনায় হাজির থাকার প্রশ্নই আসে না। যেমন প্রশ্ন আসে না মুরসাল অবস্থায় তাবেয়ীর উপস্থিতির। কোনো কোনো সনদে সাহাবীর নাম আছে– আবু মূসা আশআরী রা.। কিন্তু তিনি ও ঘটনাস্থলে ছিলেন না। কিন্তু কার থেকে শুনেছেন, তাও জানানো হয়নি। ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণনাকারীদের সম্মান রাখতে গিয়ে একে শুদ্ধ বলেছেন। তবে কোনো কোনো অংশকে ত্রুটিপূর্ণ বলে স্বীকার করেছেন। তাহযিবুত তাহযীব গ্রন্থে তিনি আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ান সম্পর্কে লিখেন– 'তিনি ভুল করতেন।' কারণ তিনি মামালিকদের থেকে হাদীস বর্ণনা করতেন। স্বরচিত হাদীস তৈরীর অভিযোগে যারা অভিযুক্ত।

এমন এক দুর্বল ও আওতাবহির্ভূত বর্ণনার ভিত্তিতে মিথ্যার যে প্রাসাদ প্রাচ্যবিদরা গড়লো, তা বিধ্বস্ত হবার জন্যেই গঠিত হলো। ফলে নির্মাতাদের হতাশা ও ব্যর্থতা উপহার দিয়ে মিথ্যার প্রকল্পটি ধীরে ধীরে অপমৃত্যু প্রত্যক্ষ করছে। আর হুজুর সা. এর মিসর-বাহরাইন গমণের কথা হচ্ছে একদম কাল্পনিক। যা নিয়ে কথা বলা শব্দের অপচয় ছাড়া কিছু নয়।

প্রাচ্যবিদরা তবুও চালিয়ে যান। কুরআনের সুরক্ষাকে সন্দেহের বিষয়ে পরিণত করার কাজে তারা বেশ খাটেন। "এনসাইক্লোপোডিয়া অব ইসলাম" এ এফ বোল দাবি করেন নবী যুগের প্রথম দিকে কুরআন সংরক্ষিত হতো কেবল স্মৃতিশক্তির দ্বারা। কারণ আল্লাহ বলেন– আমি আপনাকে পড়াবো। ফলে ভুলবেন না। তবে আল্লাহ যা চান। (সুরা আ'লা : ৬) না ভুলার আশ্বাস পেয়ে আর লেখা হতো না। ফলে কুরআনের কোনো কোনো অংশ স্মৃতি থেকে হারিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। হয়তো হারিয়ে গেছে কিংবা রূপান্তরিত হয়েছে কিছুটা বা অনেকটা। বোলের এ বিভ্রান্তি দূর করবে আয়াতের শানে নুযুল। এ আয়াত নাযিল হয় হুজুর সা. এর পেরেশানী ও কষ্ট দূর করার জন্যে। ওহী নাযিল হলেই তা মুখস্ত করার জন্যে তিনি সাধনায় লেগে যেতেন। যা ছিলো নবীর সা. জন্যে কষ্টকর। এ আয়াতে আশ্বাস দেয়া হলো– কুরআন হারিয়ে যাবার ভয় নেই। এ কিতাবের হেফাজত করবেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। এর মানে কী এই যে কুরআন হেফাজতের বিভিন্ন উপায়-উপকরণ থেকে হাত-পা গুটিয়ে নিতে হবে? আয়াত থেকে রাসূল সা. এ মর্ম গ্রহণ করেননি। তিনি বরং সকল উপায় উপকরণকে কাজে লাগিয়েছিলেন। মুখস্তকরণ চলছিলো। আবার লেখাও হচ্ছিলো। ফলে ওমর রা. এর ইসলাম গ্রহণের আগে কুরআন মজীদের লিখিত অংশের অস্তিত্ব আমরা শক্তিশালী সনদে দেখতে পাই। পাশাপাশি পাঠ দানও চলছিলো। যার স্বাক্ষী দারেআরকাম কিংবা ওমর রা. এর বোন ফাতেমার গৃহ। এগুলো ছাড়াই প্রতিটি মুসলিম গৃহে কুরআন চর্চা হয়ে গিয়েছিলো অনিবার্য

বাস্তবতা। যা কুরআনের কোনো আয়াত হারিয়ে যাওয়ার সকল পথ করে দিয়েছিলো রুদ্ধ।

তবে এ জায়গায় প্রশ্ন তুলেছেন মারগোলিয়াথ। বুখারী-মুসলিমে হযরত আয়শা রা. বর্ণিত এক হাদীস। হুজুর সা. মসজিদে এক সাহাবীর কুরআন তেলাওয়াত শুনলেন। বললেন– "আল্লাহ তার উপর রহম করুন। তিনি আমাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সেই আয়াত, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম।"

মারগোলিয়থ বুঝতে চান, হুজুর সা. যখন এক আয়াত ভুলেছেন, তাহলে আরো বহু আয়াত ভুলে যাওয়া স্বাভাবিক। ভুলে যাওয়ার ঘটনা ঘটতে পেরেছে লিখিত না থাকার কারণে। লিখিত থাকলে একজন সাহাবীর পাঠের জন্যে অপেক্ষা করতে হতো না! মারগোলিয়থের এ সংশয়ের পথ খোলা থাকে না, যখন হাদীসের প্রকৃত তাৎপর্য পরিস্কার হয়। হাদীসের শব্দ হলো, لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أُنْسِيتُهَا 'ভুলে যাওয়া' ও 'স্মরণ করিয়ে দেওয়া' কুরআন হাদীসে বহু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ذكر শব্দটি সাধারণত স্মরণে থাকা বিষয়কে স্মরণ করার অর্থ প্রদান করে। এর দ্বারা কখনো প্রমাণ হয় না- আয়াতটি ভুলে গিয়েছিলেন হুজুর সা.। বরং স্মরণে থাকা আয়াতটি সহসা স্মৃতিপটে জাগ্রত হয়েছে, জীবন্ত হয়েছে। কীভাবে? সাহাবীর পাঠ শুনে। এতে প্রমাণ হয় আয়াতসমূহ শুধু হুজুর সা. এর কাছে সংরক্ষিত হচ্ছিলো, এমন নয়। বহু সাহাবী তা হিফজ ও সংরক্ষণে ছিলেন নিয়োজিত। যা প্রকারান্তরে কুরআনের হেফাজতের নিশ্চয়তা প্রমাণ করে। এর দ্বারা প্রমাণ হয় না যে আয়াতগুলো লিখিত হচ্ছিলো না। লিখিত থাকলেও হুজুর সা. তা থেকে পাঠ করতে পারতেন না। কারণ তিনি উম্মী। মারগোলিয়থ আরেকটি কান্ড ঘটিয়েছেন হযরত আয়শার রা. এক বর্ণনা নিয়ে। মুসনাদে আহমদে যা বর্ণিত। আয়শা রা. বলেন, রজম ও রেযাআত বিষয়ক এক আয়াত আমার ঘরে কাগজে লিখা ছিলো। আমাদের এক গৃহপালিত পশু হুজুর সা. এর ওফাতের সময় কাগজখানা খেয়ে ফেলে। যে আয়াতের কথা আয়শা রা. বলেছেন, গোটা উম্মতের মতে তা মানসুখ তথা রহিত আয়াত। স্বয়ং আয়শা রা. এর তেলাওয়াত মানসুখ বলে জানিয়েছেন। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে, নবীয়ে করীম সা. এর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আয়াতটি আয়শার রা. গৃহে থাকলো, আর তা তিনি বা কেউ মুখস্ত করলেন না! বিষয়টা বিস্ময়কর। মূলত এটা সংরক্ষিত ছিলো রহিত আয়াতটিকে স্মৃতি হিসেবে রেখে দেয়ার জন্য। কুরআনের অংশ বিশেষ বিলুপ্ত হয়েছে, এর দ্বারা এ

কথা প্রমাণ হচ্ছে না। কিন্তু মারগোলিয়থ সহজে থামেন না। ইনসাইক্লোপেডিয়া
অব ইসলামে ইমাম বুখারীর উল্লেখ করে দাবি করেন– الا ان تصلوا ما بيني
وبينكم من القرابة অংশটি ওহী হিসেবে নাযিল হয়। অথচ ইমাম বুখারী
লিখেছেন– ইবনে আব্বাস রা.কে প্রশ্ন করা হলো– কুরআনের আয়াত الا المودة
في القربي এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে। তিনি জবাবে বললেন– الا ان تصلوا ما بيني
وبينكم من القرابة (বুখারী, কিতাবুত তাফসীর) যে কেউ বুখারী শরীফ হাতে
নিয়ে পড়ে দেখতে পারেন। মারগোলিয়থ এখানে কতো বড় মিথ্যাচার
করেছেন। তিনি বুঝাতে চান ইমাম বুখারী এমন বাক্যকে কুরআনের অংশ বলে
স্বীকার করেছেন, যা আজ কুরআনে নেই। অথচ ইমাম বুখারী এমনটি বলেননি।
তিনি বলেছেন– বাক্যটি ইবনে আব্বাস রা. এর। যা দ্বারা তিনি الا المودة في
القربي এর ব্যাখ্যা করেছেন।

কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ বহু সংখ্যক সাহাবী কর্তৃক মুখস্তসূত্রে কুরআন
সংরক্ষণের সত্যকে অস্বীকার করেছেন। এ ক্ষেত্রে কাতাদা রা. এর এক বর্ণনার
বিভ্রান্তিপূর্ণ উপস্থাপণে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করেন। কাতাদা সূত্রে ইমাম
বুখারী বর্ণনা করেন– আনাস ইবনে মালিক রা.কে প্রশ্ন করলাম– হুজুর সা. এর
যুগে কুরআন একত্রিত করেন কারা? জবাবে তিনি বললেন– "চারজন। উবাই
ইবনে কাব রা. মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. যায়দ ইবনে সাবিত রা. ও আবু যায়দ
রা."। আনাস রা. এ বর্ণনায় কুরআন একত্রিত করার কথা বলা হচ্ছে। যার দ্বারা
উদ্দেশ্য রচনা করা। সম্পূর্ণ কুরআন জড়ো করে লিখিত অবস্থায় এ চারজন
সংরক্ষণ করে রাখেন। হুজুর সা. এর জীবদ্দশায়।

হাফিজ ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ইমাম তাবারীর উদ্ধৃতিতে আওস ও
খাজরাজের পারস্পরিক গর্ব প্রকাশের কথা উল্লেখ করেন। যাতে খাজরাজ
গোত্রের লোকেরা বললো– আমাদের মধ্যে এমন চার ব্যক্তিত্ব আছেন, যারা
সমগ্র কুরআন সংকলিত করেছেন। (ফাতহুল বারী : নবম খণ্ড)

পরিস্কার হয়েছে– বর্ণিত চার সাহাবীর কুরআন সংকলনের কথাই আনাস
ইবনে মালিকের রা. উদ্দেশ্য। হিফজের কথা নয়। কারণ এমন কোনো সাহাবী
ছিলেন না, কুরআনের কোনো না কোনো অংশ যার হিফজ ছিলো না। প্রতিটি
ঘরে দিনে, রাতে কুরআন তেলাওয়াত হতো। গোটা মুসলিম সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও
পরিচালিত হতো কুরআনের দ্বারা। বহু সাহাবী সমগ্র কুরআন হিফজ করেন।
যাদের মধ্যে আছেন, হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর রা., হযরত উসমান
রা., হযরত আলী রা., হযরত তালহা রা., হযরত সা'দ রা., হযরত আবদুল্লাহ

ইবনে মাসউদ রা., হযরত হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা., হযরত সালিম মাওলা আবি হুযাইফা রা., হযরত আবু হুরায়রা রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., হযরত আমর ইবনুল আস রা., হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রা., হযরত মুয়াবিয়া রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়িব রা., হযরত আয়শা রা., হযরত হাফসা রা., হযরত উম্মে সালমা রা., হযরত উবাই ইবনে কাব রা., হযরত মুযাজ ইবনে জবল রা., হযরত আবু হালিমা মুযাজ রা., হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রা., হযরত আবু দারদা রা., হযরত মুজাম্মা' ইবনে জারিয়া রা., হযরত মাসলামা ইবনে মুখাল্লাদ রা., হযরত আনাস ইবনে মালিক রা., হযরত উকবা ইবনে আমির রা., হযরত তামিমে দারী রা., হযরত আবু মূসা আসআরী রা., হযরত আবু সায়দ রা., । (আল ইতকান : সুয়ুতী)

মহিমান্বিত এই নামগুলো হাফিজে কুরআনদের ক্ষুদ্র এক অংশ মাত্র। এমন অসংখ্য সাহাবী ছিলেন, যাদের নাম হাফিজ হিসেবে প্রচারিত হয় নি। হাফেজ সাহাবী এতো বেশি ছিলেন যে, শুধু বীরে মাউনার যুদ্ধে সত্তর জন হাফিজ সাহাবী শহীদ হন। ইয়ামামার যুদ্ধে সুয়ুতী সহ অনেকের মতে শহীদ হন সত্তরজন হাফিজ সাহাবী। যারকাশীর মতে তাদের সংখ্যা শাতশো। যে আরবরা স্মৃতিশক্তিতে ছিলো তুলনাহীন, হাজার হাজার কবিতা মুখস্ত রাখা যাদের কাছে মামুলি ব্যাপার, নিজেদের বংশধারা, অন্যের বংশ পরম্পরা এমনকি ঘোড়ার 'নসবনামা' যারা মুখস্ত রাখতেন, তারা যখন পেলেন বিস্ময়কর কুরআন, যা তাদের জীবন-মরণের সাথী, যার কাছে সপে দিয়েছিলেন নিজেদের হৃদয়, যার জন্যে তারা বাঁচতেন এবং জীবন দিতেন, যে কুরআনে ছিলো তাদের তৃষ্ণার উপশম, আসুখের দাওয়াই, কষ্টের অবসান, সাফল্যের চাবিকাঠি, সেই কুরআন মুখস্ত করণে কেন তারা পিছিয়ে থাকবেন? কোন যুক্তিতে? কেন মাত্র চারজন হবেন কুরআন হিফজকারী? এসব প্রশ্নের জবাব প্রাচ্যবিদদের ঝুড়িতে নেই। তাদের ঝুঁড়িতে আছে বিভ্রান্তি। তারা আছেন তারই তালাশে। অতএব মন্টোগোমারি ওয়াট দাবি করছেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. নাকি সূরা ফালাক ও নাসকে কুরআনের অংশ মনে করতেন না। কারণ ইবনে মাসউদ রা. এর যে পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, তাতে সুরা দু'টি ছিলো না। তাতে কী? ইবনে মাসউদ রা. সূত্রে বর্ণিত মুতাওয়াতির কেরাতসমূহে তো সূরা দু'টি আছে। মুতাওয়াতিরের বিপরীতে কোনো দুর্বল বক্তব্য কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আবু আব্দুর রহমান সুলামী, যার ইবনে হুবাইশ, আবু আমর শাইবানী রা. ইবনে আব্বাস সূত্রে সুরা দু'টিকে কুরআনের অংশ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনা করেছেন আলকামা রা., আসওদ রা., ইবনে ওহাব রা., মাসরুক রা., আসেম

ইবনে জুমরা রা. ও হারিস রা.। তার থেকে প্রাপ্ত সকল বর্ণনায় সুরা দু'টি কুরআনের অংশ হিসেবে সংশয়াতীত। (আন নশর ফিল কেরাতিল আশার : ইমাম যাজারী)

পাণ্ডুলিপিতে পাওয়া যায়নি, এটা কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। পাণ্ডুলিপিতে সূরা ফাতেহা ও ছিলো না। এর মানে কি সুরা ফাতেহা ও তার দৃষ্টিতে কুরআনের অংশ নয়? এটা ও কি দাবি করবেন ওয়াট সাহেব? আল্লামা নববী, ইবনে হাযম, ইমাম রাযী, ইবনে আরবী জাহিদ কাউসারী, প্রমুখের দৃষ্টিতে অগ্রহণযোগ্য ও চূড়ান্ত দুর্বল একটি বর্ণনাকে পুঁজি করে দেখা গেলো সূরা দু'টি তার পাণ্ডুলিপিতে ছিলো না। কিন্তু সর্বোচ্চ সবল বর্ণনা প্রমাণ করলো তিনি সুরা দু'টিকে কুরআনের অংশ বলে বর্ণনা করেছেন। এখানেই ফয়সালা হয়ে যায়। কিন্তু এতে যদি ওরা সন্তুষ্ট না হন, তাহলে তারা শুনুন। মুহাদ্দিসদের বক্তব্য– সুরা ফাতেহা, নাস ফালাক পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখেন নি। কারণ তা স্বতঃসিদ্ধ। সবার মুখস্ত। প্রতিনিয়ত পঠিত। এতে ভুল হবার কোনো শংকা নেই। ভুলে যাবার কোনো ভীতি নেই। এগুলো না লিখলে তা বিলুপ্ত হবার কোনোই সন্দেহ নেই। এতে বরং সুরা দু'টির স্বতঃসিদ্ধতা প্রমাণিত হয়। অসংশয় প্রমাণিকতা নিশ্চিত হয়।

অধিকাংশ প্রাচ্যবিদ বলতে চেয়েছেন– কুরআন সংকলিত হয় ওসমান রা. এর সময়ে। তারা কুরআনকে বিচার করেছেন বাইবেলীয় অনেক ক্রিটিজম এর ভিত্তিতে। বাইবেল যেভাবে রচিত হয় ঈসা আ. এর ইন্তেকালের অনেক পরে, কুরআনের ক্ষেত্রেও তারা এমনটি বলতে শুরু করলেন। আর্থার জেফরি তার দি কুরআন " সিলেক্টেড সুরা, ইসলাম, মুহাম্মদ এন্ড হিজ রিলিজিউন এবং প্রসিদ্ধ গ্রন্থ "মেটারিয়ালস ফর দি হিস্ট্রি অব দি টেক্সট অব দি কুরআন" –এ অভিযোগ করেন হুজুর সা. এর পরে সংকলিত হবার আগে কুরআনের আসল অবয়ব রূপান্তরীত হয়ে গেছে। টবি লেস্টার, জুসেফ পেইন, জন ওয়ালব্রোজ, সহ অনেকেই প্রশ্ন তুললেন- কুরআন কি অসম্পাদিত অবস্থায় দেড়শ বছর পাড়ি দেয়নি?

এর একটাই সুস্পষ্ট জবাব– না। কুরআন সম্পাদনা শুরু হয় হুজুর সা. এর জীবদ্দশায়। যখনই কুরআনের কোনো অংশ নাযিল হতো, হুজুর সা. নির্ধারিত সাহাবীদের দিয়ে তা লিখিয়ে রাখতেন। এই সব সাহাবী ছিলেন খুবই উচু পর্যায়ের। বোখারী মুসলিমে আনাস রা. সূত্রে এমন সাহাবী বারোজন বলে উল্লেখিত। আল্লামা ইবনুল কাইয়্যূম যাদুল মায়াদ গ্রন্থে ১৭ জন ওহী লেখক সাহাবীর উল্লেখ করেছেন। আল্লামা কাত্তানী সিরাতুল ইরাকীয়া গ্রন্থে ৪২ জনের

নাম উল্লেখ করেছেন। সুবহী সালেহ দিয়েছেন ৪০ জনের পূর্ণ তালিকা। যাদের মধ্যে চার খলীফা ছাড়াও আছেন প্রধান সাহাবগণের মহিমান্বিত নাম। সাহাবায়ে কেরাম কুরআন লিখতেন পাতলা চামড়ায়, দুষ্প্রাপ্য কাগজে, খেজুর গাছের শাখায়, কাটের ফলকে, উটের চওড়া হাড়ে, পশুর পাতলা চামড়া, কাপড়, গাছের ছাল ইত্যাদিতে। ওহী নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই হুজুর সা. তাদেরকে লেখার নির্দেশ দিতেন। লেখার কাজ সম্পন্ন হতো হযরত জিব্রাইল আ. এর উপস্থিতিতে। কোনো নষ্ট বা অরক্ষিত জিনিসে কখনোই লেখা হতো না। কিছু সংখ্যক ওহী লেখক সর্বদাই হুজুর এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। তাদের সংখ্যা বাড়তো-কমতো। যিনি বা যারা লিখতেন, তাদের লেখা শুদ্ধ হলো কী না, তা যাচাই করা হতো। লেখার পরে হুজুর সা. শ্রবণ করে নিতেন। কোনো সূরা বা কোন আয়াত কোথায় যুক্ত হবে, তা পরিষ্কারভাবে বলে দেয়া হতো। লেখার শুদ্ধতা পূর্ণরূপে নিশ্চিত হবার পরে তা প্রচারের নির্দেশ দেয়া হতো। (আত তিবইয়ান ফি উলূমিল কুরআন : সাবুনী) এ প্রক্রিয়ায় কুরআন শরীফের কয়েকখানা পাণ্ডুলিপি রচিত হয়। ওহী অবতরণ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যেহেতু কোনো পাণ্ডুলিপিকেই সম্পূর্ণ বলে ঘোষণা দেয়া যাচ্ছিলো না। অপরদিকে হুজুর সা. এর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ওহী নাযিলের সম্ভাবনা ছিলো, তাই নবী জীবনে কোনো পাণ্ডুলিপি একক ও চূড়ান্ত বলে ঘোষিত হবার সুযোগ ছিলো না। আলী রা. আয়শা রা. ইবনে মাসউদ রা.সহ অনেক সাহাবীর পাণ্ডুলিপি তখন বিদ্যমান ছিলো।

হুজুর সা. এর ইন্তেকালের পরে কাজটি চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন করার প্রেক্ষিত এলো। এ সময়েই ঘটলো ভণ্ড নবীর আবির্ভাব। ইয়ামামার যুদ্ধে ৭০ জন হাফিজে কুরআন সাহাবা শহীদ হয়ে গেলেন। ওমর রা. তখন বিক্ষিপ্ত কুরআনকে চূড়ান্ত রূপে সংকলন করার উপর বিশেষভাবে জোর দিলেন। প্রথমে আগ্রহী না হলেও এক পর্যায়ে সিদ্দিকে আকবর রা. রাজী হয়ে গেলেন। কুরআনের এক পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি তৈরীর সিদ্ধান্ত নিলেন। এজন্যে এক কমিটি গঠন করলেন। যায়দ ইবনে সাবিত রা. ছিলেন এর পরিচালক। উবাই ইবনে কা'ব রা. ছিলেন লিখনকার্য পরিচালনার দায়িত্বে। যাচাই-বাছাইয়ের কাজে হযরত ওমর রা.। পূর্ণ সহযোগিতা করছিলেন হযরত আবু বকর সিদ্দীক রা.।

বুখারী শরীফে বাবুল কুররায় বর্নিত আছে, এ কাজে ৭৫ জন হাফিজ সাহাবীকে নিয়োগ দেয়া হয়। যাদের প্রত্যেকের নিকট কুরআনের লিখিত অংশ ছিলো। যাদের মধ্যে কাতিবে ওহী ছিলেন ৪ জন। কুরআন সংকলনে আয়াত সংগ্রহে তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হলো–

১. লিপিবদ্ধ আয়াত অবশ্যই রাসূল সা. এর সম্মুখে লিখিত হতে হবে।
২. প্রত্যেক লেখা গ্রহণের ক্ষেত্রে অবশ্যই তা মুখস্ত ও লিখিত- দুই রূপে বিদ্যমান থাকতে হবে।
৩. আয়াত নিয়ে যারা হাজির হবেন, তাদেরই মুখস্ত থাকা যথেষ্ট নয়, অন্যান্য হাফিজে কুরআন সাহাবীরও তা মুখস্ত থাকতে হবে।
(আল ইতকান- জালাল উদ্দীন সুয়ুতী, মানাহিলুল ইরফান ফি উলূমিল কুরআন যারকানী)

বুখারী শরীফে যায়দ ইবনে সাবিত রা. এর দীর্ঘ বর্ণনা রয়েছে। এতে তিনি বলেন- "..... আমি কুরআন সন্ধান করলাম। পাথরখণ্ড, খেজুরের ডাল, ও মানুষের অন্তর থেকে খুঁজে খুঁজে জড়ো করলাম। অবশেষে সুরা তাওবার আয়াতটি পেলাম হযরত খুযায়মার কাছে। সেটা অন্য কারো কাছে মিলেনি। পরে সহিফাটি মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আবু বকরের রা. দায়িত্বে ছিলো। তারপর ছিলো হাফসা বিনতে ওমর রা. এর দায়িত্বে।"

প্রফেসর মন্টোগোমারী ওয়াট বোখারীর এই বর্ণনায় আপত্তি তুলে আবু বকর রা. এর যামানায় কুরআন সংকলনকে অস্বীকার করেছেন। আপত্তির ভিত্তিটা একান্তই শিশুসুলভ। যায়দ রা. বর্ণিত হাদীসে দেখা যায় ইয়ামামা যুদ্ধে হাফিজ সাহাবাদের শাহাদাতের কারনে কুরআন সংকলনের অপরিহার্যতা সামনে আসে। অথচ ইয়ামামার শহীদদের তালিকায় এদের সংখ্যা বেশি হবার কথা নয়। কারণ এ যুদ্ধে নওমুসলিমরাই অংশ নিয়েছেন বেশি।

অথচ তাবারীর স্পষ্ট ভাষ্য- মদীনার অধিবাসী ৩৬০ মুহাজির-আনসার এবং মদীনার বাইরের তিন শো মহাজির এ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এই ছয়শো ষাট সাহাবীর নাম স্বাভাবিকভাবেই ইতিহাস সংরক্ষণ করেনি। তবে হাফিজ ইবনে কাছির বিশিষ্ট ৫৮ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। এতে আছেন ইসলামের ইতিহাসের অত্যন্ত মহিমান্বিত বহু সাহাবী।

যেমন হযরত সালেম মাওলা আবি হুযাইফা রা.। যিনি ছিলেন হাফেজ কারী আলেম। হিজরতের আগে মসজিদে কুবার ইমাম। তিনি এ যুদ্ধে শহীদ হন। ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

হযরত আবু হুযাইফা রা. হাফিজ, আলিম, উচ্চস্তরের সাহাবী।

হযরত যায়দ ইবনুল খাত্তাব রা. ওমর রা. এর বড় ভাই, একেবারে প্রাথমিক যুগের মুসলমান, হাফিজ, আলিম।

হযরত সাবিত ইবনে কায়স রা.- কাতিবে ওহী, হাফিজ, কারী।

হযরত উব্বাদ ইবনে বিশর রা.- বদরী সাহাবী, তিনি শ্রেষ্ঠ আনসার আলেমদের একজন, হাফেজ কারী।

হযরত তুফায়েল ইবনে আমর দাওসী রা.– দাওস গোত্রের সর্দার, হাফিজ, কারী।

অন্যান্য হাফিজ সাহাবী হলেন হযরত ইয়াজিদ ইবনে সাবিত রা. হযরত কায়স ইবনুল হারিস রা. হযরত আয়িজ ইবনে মায়ীজ রা. হযরত সায়ীব ইবনে আওয়াম রা. হযরত সায়িব ইবনে উসমান রা.।

উল্লেখিত সাহাবাগণ ছাড়াও ছিলেন এমন ৩০ জন আনসার ও ১৮ জন মুহাজির সাহাবী, যারা বদর যুদ্ধের আগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। এমন দশজন সাহাবী, যারা উহুদ যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। এতো সব গুরুত্বপূর্ণ সাহাবীর শাহাদাতের পরে ওয়াট সাহেবদের আপত্তির জায়গাটি বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

কিন্তু তারা হাল ছেড়ে দিবেন সহজেই? নলডোকি সাহেব যায়দ রা. এর রেওয়ায়েতের সূত্রে অভিযোগ করেন- যেহেতু সুরা তাওবার শেষে আয়াতটি মাত্র একজন ছাড়া কোথাও মিলেনি, অতএব তাতে সন্দেহ থেকে গেলো।

মুহাদ্দিসগণ এর জবাব দিয়েছেন বহু আগেই। একজনের কাছে পাওয়া গিয়েছিলো এর অর্থ এই নয় যে আয়াত খানা আর কারো মুখস্ত ছিলো না। শত শত হাফিজ সাহাবীর মুখস্ত ছিলো। স্বয়ং ওমর রা. যায়দ রা. ও উবাদা ইবনে সামিতের রা. মুখস্ত ছিলো। হুজুর সা. এর সময়ে কাতেবে ওহীদের লিখিত অংশসমূহের আয়াত বিদ্যমান ছিলো। খুযাইমা রা. কর্তৃক নিয়ে আসার আগে দুই মাধমে এ আয়াতের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় ১. নবীয়ে করীম সা. কর্তৃক লেখানো ২. সাহাবীদের মুখস্ত। কিন্তু তৃতীয় মাধ্যমে তা পাওয়া যাচ্ছিলো না। তাই যায়েদ রা. আয়াতটিকে মূল পাণ্ডুলিপিতে না লিখে আলাদাভাবে লিখে রাখেন। পরে যখন হযরত খুযাইমা রা. হুজুর সা. এর তত্ত্বাবধানে লিখিত হবার স্বতন্ত্র স্বাক্ষী নিয়ে এলেন, তখনই আয়াতটিকে মূল মাসহাফে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। (আল বুরহান ফি উলূমিল কুরআন : যারকাশী)

পাণ্ডুলিপি তৈরী হলো। যার নাম মাসহাফে উম্ম। প্রত্যেক সুরা পৃথক কপিতে লিখিত হলো। এতে ধারাবাহিকতা ছিলো না। কুরআনের সাত হরফের সবগুলোই এতে বিদ্যমান ছিলো।

প্রাচ্যবিদ জুসেফ পেইন এবার মাথা বের করলেন। দাবি করলেন– 'আবু বকর ও ওসমান এর সংকলিত কুরআন হলো শাসকশক্তির পছন্দের কুরআন।' কৌশলে তিনি বলতে চাইলেন– নিজেদের পছন্দ ও সুবিধার আলোকে তৈরীকৃত পাণ্ডুলিপিকে তারা কুরআন বলে চালিয়ে দিলেন। ফলে প্রচলিত কুরআন হলো তাদের পছন্দের কুরআন। মানে আবু বকরের রা. কুরআন, ওসমানের রা. কুরআন। যেমনটি লুকের বাইবেল, জনের বাইবেল।

কুরআন সংকলনের যে পদ্ধতি ও শর্তাবলি আমরা উল্লেখ করেছি, তাতেই এ অভিযোগের বেলুন ফুঁটো হয়ে যায়। এর জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন থাকে না। তবুও আমরা বলবো– সেই সময়ে এতো বেশি হাফেজ ও এতো বেশি লিখিত পাণ্ডুলিপির অস্তিত্ব ছিলো, যার ফলে একটি শব্দও পরিবর্তন করার সুযোগ ছিলো না কারো। আবু বকর, ওমর, যায়দ রা. সহ প্রধান সহাবাগণ কেন কুরআনে পরিবর্তন আনবেন, সে প্রশ্ন আপাতত থাকলো। আমরা শুধু দেখবো– আবু বকরের রা. যামানায় বহু সংখ্যক প্রাণ্ডুলিপি কুরআনের প্রতিটি বাক্য, শব্দ ও বর্ণের পাহারায় নিবেদিত ছিলো। আল্লামা ইবনে হাজম বলেন– প্রথম খলীফার আমলে আরব ভূখণ্ডে এমন কোনো শহর ছিলো না, যেখানে মানুষের নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে কুরআনের পাণ্ডুলিপি ছিলো না' হুজুর সা. এর ইন্তেকালের আগে ও পরে বহু সাহাবীর হাতে কুরআনের পাণ্ডুলিপি তৈরী হয়। স্বতন্ত্র পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন– হযরত উসমান ইবনে আফফান রা. হযরত আলী রা. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. হযরত উবাই ইবনে কাব রা. হযরত আবু যায়েদ রা. হযরত আবু দারদা রা. হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা., হযরত আবু মুসা আশআরী রা., হযরত আমর ইবনুল আস রা., হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রা., হযরত সালেম রা. হযরত আবু আইয়ুব আনসারী রা. হযরত উবাদা ইবনে সামিত রা., হযরত তামিম দারি রা., হযরত মাজমা ইবনে হাবেয়া রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা., হযরত আতা ইবনে আবদুল্লাহ রা., হযরত লাবিদ ইবনে রবিয়া রা., হযরত আকল ইবনে আমের রা., হযরত কায়স ইবনে আবি মাসা রা., হযরত সাকান ইবনে কায়স রা., হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব রা., হযরত আয়শা রা., হযরত উম্মে সালমা রা., হযরত হাফসা রা., হযরত উম্মে ওরাকা ইবনে নৌফেল রা.। (ইন্না-লাহু লাহা-ফিজুন : হাদী হায়দার)

হযরত ওসমান রা. এর শাসনামলের আগেই কুরআনের সুরক্ষা নিশ্চিত ও সুসম্পন্ন হয়ে গেছে। আবু বকর রা. এর আমলে সংকলিত কুরআনের কপিটি তখন হাফসা রা. এর কাছে। এতে ছিলো সাত কেরাত। একেক কারী একেক কেরাতে কুরআন শেখাতেন। আরবে এটা কোনো সমস্যার ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু ইসলাম যখন ইরান মিসর ইত্যাদিতে ছড়িয়ে পড়লো, নওমুসলিমরা একেক উস্তাদের কাছে একেক কেরাত শিখে একেই শুদ্ধ মনে করতেন। অন্য কেউ অন্যভাবে উচ্চারণ করলে তাকে ভুল প্রতিপন্ন করতেন। এ নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিতো। সেনাবাহিনীতেও বিভিন্ন ভাষাভাষীর মিশ্রণে তেলাওয়াতে পার্থক্য দেখা দিতো। যা সৃষ্টি করে নয়া জটিলতা। এ প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন পড়লো কুরআনের সুবিন্যস্ত সংকলন। ইমাম বুখারী গোটা বিষয়ের বিবরণ দিচ্ছেন হযরত হাসান

রা. এর সূত্রে। তিনি বলেন– ওসমান রা. এর কাছে হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান রা. আগমন করলেন। তিনি যুদ্ধ করেছিলেন ইরাকীদের সাথে। সিরিয়ানদের বিরুদ্ধে। আজারবাইজানের আর্মেনিয়া বিজয়ের জন্য। সেখানে কেরাত নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিলো, যা তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। ওসমান রা. এর কাছে তিনি নিবেদন করলেন– আমিরুল মু'মিনীন! ইহুদী-খ্রিস্টানদের মতো কুরআন নিয়ে এ উম্মত মতবিরোধে লিপ্ত হবার আগেই তাদের লাগাম টেনে ধরুন। ওসমান রা. এরপরে হযরত হাফসার রা. কাছে দূত পাঠালেন। বললেন, আপনার কপিটি আমার কাছে পাঠান। তা থেকে কয়েক কপি লিখে আপনার কপি ফেরত দেবো। হাফসা রা. তার কপিখানা ওসমানের রা. কাছে পাঠালেন। তিনি হযরত যায়দ ইবনে সাবিত রা. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. সাঈদ ইবনে আস রা. ও আবদুর রহমান ইবনে হিশামকে রা. কপি করার আদেশ দেন। তারা বিভিন্ন মাসহাফে তা লিপিবদ্ধ করেন। তিন কুরাইশ সদস্য ও যায়দ ইবনে সাবিতকে রা. ওসমান রা. বললেন– তোমাদের মধ্যে কোনো বিষয়ে ভিন্নমত দেখা দিলে কুরাইশী উপভাষায় লিখবে। কারণ কুরআন উপভাষায় নাযিল হয়েছে। তারা তাই করেন। যখন তারা কয়েকটি কপি করে নিলেন, ওসমান রা. মূল কপিটি হাফসা রা. এর কাছে ফিরিয়ে দিলেন। আর লিখিত পাণ্ডুলিপির একেক কপি একেক অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। এ ছাড়া কুরআনের যত মাসহাফ রয়েছে, সব জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। (সহীহ বুখারী : কুরআন সংকলন)

কয়টি কপি করান ওসমান রা.? অনেকের মতো পাঁচটি। কিন্তু আবু হাতেম সিজিস্তানীর মতে ৭টি। (মানাহিলুল ইরফান : যুরকানী)

এই সব কপিতে সুরাগুলোতে ক্রমানুসারে বিন্যস্ত করা হয়। আগে তা ছিলো না। এমন এক লিখন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, যাতে সব শুদ্ধ কেরাতকে অবলম্বন করা যায়। পাণ্ডুলিপিকে ত্রিশটি পারায় বিভক্ত করা হয়। একমাত্র কুরাইশ ভাষার রীতি অবলম্বন করা হয়।

এতটুকুই। ওসমান রা. এর সংকলন নতুন নয়। আবু বকরের রা. সংকলনকে তিনি বিন্যস্ত করেছেন মাত্র। আবু বকরের রা. সংকলন নবসৃষ্টি নয়, হুজুর সা. কর্তৃক লেখানো কপিগুলোকে তিনি বিধিবদ্ধভাবে সমন্বিত করিয়েছেন মাত্র। কিন্তু প্রাচ্যবিদরা দাবি করেন কুরআন সংকলিত হয় বিলম্বে। ওসমান রা. এর হাত দিয়ে। ফলে তার সুরক্ষা নিশ্চিত নয়। এ দাবির ভিত্তিতেই তারা কুরআন সম্পর্কে যাবতীয় বিশ্লেষণ পরিচালিত করেন। দীর্ঘ সাধনার মাধ্যমে তারা তৈরী করেন এমন সব বিভ্রান্তির ধারাভাষ্য, যা জ্ঞানীর জন্যে লজ্জা, সত্যপন্থীর জন্য ক্ষোভ এবং জাগ্রত বিবেকীর জন্যে অনুতাপ ডেকে আনে।

কিন্তু তাদের তাতে কিছুই যায় আসে না!

তারা দাঁত বসাতে চান হাদীসে রাসূলের সা. উপর। এক্ষেত্রে শীর্ষপুরুষ হলেন গোল্ডযিহার। তার অনুকরণে এগিয়ে আসেন জোসেফ শাখত। বিশেষ পথরেখা তৈরী করেন উইলিয়াম ম্যুর, আর্থার জেফরি, মন্টোগোমারি ওয়াট, আলফ্রেড গিয়োম, ডক্টর স্প্রেঙ্গার সহ অনেকেই। আর্থার জেফরি তার মুহাম্মাদ এন্ড হিজ রিলিজিয়ন গ্রন্থে দাবি করেন– হযরতের ইন্তেকালের পর তার বর্ধিষ্ণু অনুসারীরা ভাবলো ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের এমন বহু দিক আছে, যে ব্যাপারে কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা নেই। অতএব এক্ষেত্রে পথপ্রদর্শন তালাশ করা হলো হাদীসে। হাদীস মানে পয়গাম্বরের কথা ও কাজ। অর্থাৎ যেগুলোর ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে– এগুলো পয়গাম্বরের কথা ও কাজ। সঠিক, আংশিক সঠিক বা মনগড়া হাদীসের বিশাল ভাণ্ডার জড়ো করা হলো।" ম্যাকডোনাল্ড আরো অগ্রসর হয়ে বলে বসলেন– 'হযরতের অনুসারীরা নিজেদের কাজের বৈধতা দেয়ার জন্যে হাদীসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।'

তাদের বক্তব্য প্রচ্ছন্নভাবে হাদীস শাস্ত্রকে বিশেষ এক ষড়যন্ত্র হিসেবে অভিহিত করতে চায়। ম্যুর ও গোল্ডযিহারের ভাষায় যার রচনা শুরু হয় তাবেয়ী যুগে। অর্থাৎ হুজুর সা. এর ইন্তিকালের অন্তত নব্বই বছর পরে। নবীয়ে কারীম সা. এর ইন্তেকালের পর অনুসারীদের মনে হাদীসের কথা উদিত হবে কেন? যখন কুরআন মজিদই নিশ্চিত করেছে হাদীসের প্রমাণিকতা। কুরআনই কুরআনের পাশাপাশি তার ব্যাখ্যা হিসেবে হাদীস মানতে মুসলমানদের নির্দেশ দিচ্ছে– 'রাসূল সা. তোমাদেরকে যা দিচ্ছেন, তা গ্রহণ করো। যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করছেন, তা থেকে বিরত থাকো। (সুরা হাশর : ৭) মুমিনগণ! তোমরা যদি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হও, তাহলে অনুসরণ করো আল্লাহর, আনুগত্য করো তার রাসূলের সা. এবং তাদের, যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। তোমাদের মধ্যে কখনো কোনো বিষয় মতবিরোধ দেখা দিলে তোমরা তা উপস্থিত করো আল্লাহ ও তার রাসূলের সা. নিকট। (সুরা নিসা : ৫৯) হুজুর সা. এর কথা ও কাজ তথা হাদীসের আনুগত্যের নির্দেশনা রয়েছে সুরা নূরের ৬৪ নম্বর আয়াতে। সুরা নিসার ৮০ নম্বর আয়াতে। সুরা আহযাবের ৩৬ নম্বর আয়াতে। সুরা নিসার ৬৫ নম্বর আয়াতে। হাদীসের আনুগত্যের স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে অসংখ্য হাদীসে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার দ্বিতীয় ভিত্তি হিসেবে তা প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামের সূচনাবেলা থেকেই। ইসলামী আইন, সমাজ ও বিচার ব্যবস্থার দ্বিতীয় বুনিয়াদ হিসেবে তার প্রয়োগ ছিলো সুনিশ্চিত, অবধারিত। হুজুর সা. যখন মায়াজ ইবনে জাবাল রা.কে গর্ভণর হিসেবে ইয়ামানে প্রেরণ করেন, তাকে প্রশ্ন করেন, তুমি কীভাবে ফয়সালা করবে? তিনি

বললেন, কিতাবুল্লাহর আলোকে। হুজুর সা. বললেন– যদি কিতাবুল্লাহর মধ্যে সে ফয়সালা না পাও, তখন কীভাবে করবে? তিনি বললেন– সুন্নাহের আলোকে। হুজুর সা. এতে খুশি হলেন। তার জন্যে দুয়া করলেন। হুজুর সা. হাদীসের ভিত্তিতে আমল করতে বলতেন। হাদীস মুখস্ত করার জন্যে সাহাবাদের প্রেরণা দিতেন। সাহাবাদের জীবন পরিচালিত হতো এরই আলোকে। কুরআনকে তারা বুঝতেন হাদীসের ব্যাখা দ্বারা।

এই যখন বাস্তবতা, তখন হুজুর সা. এর ইন্তেকালের পর হাদীস শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুসারীদের ভাবতে হবে কেন? হাদীস ছাড়া তো কেউই নামায পড়তে পারতেন না, রোযা রাখতে পারতেন না। ইসলাম সম্মত ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবারিক বা সামাজিক জীবন-যাপন করতে পারতেন না। যুদ্ধ, গণীমত বন্টন, বিয়ে-শাদী, ইবাদত-বন্দেগী- প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুসলমানরা হাদীসের বাস্তবায়ন ঘটাতেন। এ বাস্তবায়ন ঘটানোর ইতিহাস হলো প্রত্যেক সাহাবীর জীবন। এ বাস্তবায়ন ঘটানোর ইতিহাস হলো ইসলামী সমাজের উন্মেষ ও বিকাশ। হাদীস ছাড়া একজন মুমীনের জীবন একটি দিনের জন্যেও চলতে পারতো না। হাদীসের উন্মেষ ঘটেছে ইসলামের উন্মেষের সাথে সাথে। হাদীসের বিকাশ ঘটেছে ইসলামের বিকাশের সমান্তরালে। আমরা দেখবো, হাদীস রচনার ধারা ও বিকশিত হয় হুজুর সা. এর জীবৎকালেই।

আলফ্রেড গিয়োম তার বিশালাকৃতির 'ইসলাম' গ্রন্থে লিখেন– "হযরতের বাণী ও কাজ ঠিক কখন লিপিবদ্ধ হয়, আমরা জানি না। প্রকৃত অর্থে প্রথম যুগের হাদীসসমূহ এ বিষয়ে স্ববিরোধি। কেউ কেউ বলেন তিনি তার বাণী লেখার অনুমতি দিয়েছিলেন। অন্যরা দাবি করেন, তিনি তা নিষিদ্ধ করে দেন।"

আলফ্রেড গিয়োম জানেন না– 'কখন লিপিবদ্ধ হয় হযরতের বাণী!' তবে আমরা জানি- প্রিয়নবীর সা. জীবদ্দশায় তাঁর নির্দেশ ও অনুমতিক্রমে হাদীস লিখা হয়। সাহাবাগণ এ সময়ে হাদীসের গ্রন্থ সংকলন করেছিলেন। যা আজো বিদ্যমান আছে দুনিয়ার বিভিন্ন মিউজিয়ামে। কমপক্ষে ৫২ জন সাহাবা নবীজীর জীবদ্দশায় লিখিত হাদীস সংরক্ষণ করতেন। কমপক্ষে নিরান্নব্বই জন তাবেয়ীর নিকট বিদ্যমান ছিলো হাদীসের লিখিত সংকলন। হাদীস লিখা ও সংকলন তৈরীতে জড়িত সাহাবা, তাবেয়ী, তাবেয়ীদের সংখ্যা ৪০৩ জন (দিরাসাত ফিল হাদীস- মুস্তফা আল আযমী)

আমরা জানি, সহী হাদীসের সবগুলোই সাহাবী যুগে লিখিত অবস্থায় বিদ্যমান ছিলো। সিহাহ সিত্তায় হাদীস সংখ্যা মাত্র পৌনে ছয় হাজার। অথচ সাহাবাগণ লিখে রাখেন এর চেয়ে কয়েকগুণ বেশি হাদীস। সকল সাহাবীর লিখিত

হাদীসের হিসাব করা কঠিন। কেবল কয়েকজন 'মুকসিরীন' সাহাবার লিখে রাখা হাদীসের সংখ্যা বিশ হাজারের অনেক বেশি।

হযরত আবু হুরায়রা রা. পাঁচ হাজার তিন শো চুয়াত্তর খানা প্রথম শ্রেণির হাদীস বর্ণনা করেন। প্রমাণিত হয়েছে– এগুলো লিখিত ছিলো তার কাছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আম্র রা. লিখে রেখেছিলেন পাঁচ হাজারের ও অধিক হাদীস।

আনাস ইবনে মালিক রা. রচনা করেন এক হাজার দুই শো ছিয়াশি হাদীসের সহীফা। যা তিনি সত্যায়ন করান নবীজীর সা. মাধ্যমে।

যাবির ইবনে আবদুল্লাহর রা. কাছে লিখিত ছিলো এক হাজার পাঁচ শো চল্লিশ হাদীস।

আয়শা রা. এর কাছ থেকে ওরওয়া ইবনে যুবায়ের রা. লিখে রাখেন দুই হাজার দুই শো দশ হাদীস।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে সাঈদ ইবনে যুবায়ের রহ. লিখে রাখেন দুই হাজার ছয় শো ষাট হাদীস (তাদভীনে হাদীস- মানাযির আহ্সান গিলানী)

মুহাদ্দিসগণের মতে প্রথম শ্রেণির হাদীসের সংখ্যা দশ হাজারও হয় না। কিন্তু সাহাবা যুগে বিশ হাজারের ও অধিক হাদীস লিপিবদ্ধ হয়ে যায়।

হাদীস রচনায় নবীজীর সা. 'নিষেধ' ও 'অনুমতির' প্রসঙ্গ টেনে গিয়োম সাহেব বিভ্রান্তির জালা ছিটিয়েছেন। এখানে গোপনীয়তার কিছু নেই। হুজুর সা. প্রথমে হাদীস লিখতে নিষেধ করেছিলেন। কারণ কুরআনের সাথে হাদীস মিশে জটিল অবস্থা সৃষ্টির আশংকা ছিলো। এ নিষেধ ছিলো একান্তই সাময়িক, একেবারে প্রথম দিকে। যখন সাহাবাগণ কুরআনের উসলুব তথা প্রকৃতি ও ধরণ বুঝে উঠেন নি। ফলে হাদীস আর কুরআনের পার্থক্য উপলব্ধিতে ভুল হবার শঙ্কা ছিলো। সেই সঙ্কা অচিরেই কেটে গেলো। কুরআনের বাকভঙ্গি সাহাবারা উপলব্ধি করে ফেললেন। এখন আল্লাহর রাসূল সা. হাদীস রচনায় নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেন। এখন তিনি হাদীস লিখতে অনুমতি দিচ্ছেন, উৎসাহ দিচ্ছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন। এখন তিনি আনসার সাহাবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন ডান হাতের সাহায্যে হাদীস সংরক্ষণের জন্যে। হাত দ্বারা লেখার ইশারা করে দেখাচ্ছেন। (জামে তিরমিযী, আবওয়াবুল ইল্ম)

এখন লিখার উৎসাহ দিচ্ছেন আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা.কে। (মুস্তাদরাকে হাকিম, কিতাবুল ইল্ম)

আবু শাহকে রা. নির্দেশ দিচ্ছেন অন্যকে হাদীস লিখে দেয়ার জন্য। (সহিহ বুখারী, কিতাবুল ইল্ম)

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসকে রা. বলছেন– তুমি লিখতে থাকো। যে খোদার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম করে বলছি আমার এ মুখ থেকে প্রকৃত সত্য ছাড়া কিছুই উচ্চারিত হয় না। (সুনানে দারেমী)

এখন সাহাবাগণকে হুজুর সা. এর চতুর্পাশ্বে লেখতে দেখা যাচ্ছে। তারা প্রশ্ন করছেন। নবীজী সা. উত্তর দিচ্ছেন। সাহাবাগণ লিখছেন। (সুনানে দারেমী)

প্রথম দিকে লিখতে নিষেধ করা হলো। তা সবার জন্যে ছিলো না। যারা কুরআন-হাদীসকে পৃথক পত্রে শুরু থেকেই পৃথকভাবে লিখেছেন, তাদের জন্যে হাদীস লিখার অনুমতি ছিলো। তারা লিখতে পারতেন। আর অন্যরা বর্ণনা করতেন। পরস্পরের নিকট। ফলে তখন ও হাদীস চর্চা থেমে ছিলো না। আর এই অব্যাহত চর্চার ফলে ইসলামী জীবন যাত্রায় প্রয়োজনীয় কোনো হাদীস বিলুপ্ত হয়নি। এসব হাদীস হুজুর সা. এর জীবদ্দশায় লিখিত হয় সহীফায়ে সাদেকা, সহীফায়ে আলী, কিতাবুস সাদাকা, সহিফায়ে আনাস ইবনে মালেক, সহীফায়ে আমর ইবনুল হাজম, সহীফায়ে ইবনে আব্বাস, সহীফায়ে ইবনে মাসউদ, সহীফায়ে জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, সহীফায়ে সামুরা ইবনে জুনদুব, সুহুফে আবু হুরায়রা, মুসনাদে আবু হুরায়রা ইত্যাদি সংকলনে। স্বয়ং হুজুর সা. এর প্রত্যক্ষ তত্তাবধানে লিখিত হয় ২৫০ খানা দস্তাবেজ।

কিন্তু ইহুদী প্রাচ্যবিদ গোল্ডযিহারের কাজ হলো হাদীসকে ভিত্তিহীন সাব্যস্থ করা। অতএব তিনি ইমাম যুহরীকে হাদীস সংকলনের প্রথম কারিগর বলে অভিহিত করেন। হিজরতের প্রায় একশো বছর পরে উমাইয়া শাসকদের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্তে হাদীসের সংকলন শুরু হলো বলে বিভ্রান্তি ছড়ান। নিজের ইহুদী চরিত্র দিগম্বর করে দিয়ে তিনি দাবি করেন–

'প্রচলিত হাদীসগুলোকে রাসূলের সা. উক্তি মনে করা হলেও আসলে তা নয়। এগুলো হলো প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক উৎকর্ষের ফসল মাত্র।'

গোল্ডযিহারের কথাটি রসিকতা নয়, পণ্ডিতি দাবি। কিন্তু কোন বুদ্ধির জোরে ইহুদী যিহার হুজুর সা. কর্তৃক লেখানো আপন বাণীসমূহকে 'নবীয়ে কারীমের সা. বাণী নয়'– বলতে পারলেন। সাহাবাগণ সরাসরি নবীজীর সা. যে সব বাণী শ্রবণ করে লিখে রাখলেন, সেগুলোই তো বিশ হাজারের অধিক। কোন শক্তিতে তিনি দাবি করবেন সাহাবারা মিথ্যা বলেছেন। এগুলো নবীজীর বাণী নয়। গোল্ডযিহারদের একটি শক্তি আছে। সেটা হলো, অবিশ্বাসের শক্তি। একজন ইহুদী যিহার নবীজীর সা. সত্যতায় বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাসী নয় সাহাবাদের সত্যবাদীতায়। অতএব তিনি তার সাম্প্রদায়িক মন থেকে যুক্তি, প্রমাণ, ইতিহাস

ও কাণ্ডজ্ঞানের মাথা খেয়ে হাদীসের অস্তিত্বকে যখন অস্বীকার করেন, আমরা তখন অবাক হই না। ভাবি, এক ইহুদী ইসলাম সম্পর্কে তার অবিশ্বাসের বিস্তৃতি দিচ্ছেন।

এক্ষেত্রে চমৎকার বলেছেন দার্শনিক আলেম আবদুর রহীম রহ. 'হাদীস সংকলনের ইতিহাস' গ্রন্থে তিনি লিখেন– "আমাদের অতীতকাল ও মুসলিম সংস্কৃতির প্রাথমিক ইতিহাসের সত্যাসত্য প্রমাণের জন্য তথাকথিত প্রাচ্যবিদদের অসংলগ্ন উক্তি ও ভিত্তিহীন কথাবার্তার প্রতি আমরা মোটেই ভ্রুক্ষেপ করিতে রাজি নহি। রাসূলের জীবনে হাদীস লিপিবদ্ধ ও সংগৃহিত হওয়ার কথা পশ্চিমা পণ্ডিতরা স্বীকার করুক আর নাই করুক, তাহাতে মুসলমানদের কিছুই যায় আসে না। কেননা ঘরের লোকেরাই ঘরের অবস্থা সম্পর্কে অধিক অবহিত।" নবীজীর সা. জীবদ্দশায় হাদীস লিখিত- সংকলিত হওয়ার সত্যকে মেনে নিলে যেহেতু হাদীসকে অস্বীকার করা যায় না, সেজন্যেই ওরা মরিয়া হয়ে বলতেই থাকে– হাদীস লিপিবদ্ধ হয়েছে উমাইয়া আমলে! এর আগে নয়। একথা পাঠককে বিশ্বাস করাতে পারলে পরবর্তি বিষ গেলানো যাবে– সেটা হচ্ছে– হাদীস বর্ণনাকারীদের চিন্তা, পরিবেশ ও সামাজিক জীবনের ফসল। যাকে রাসূলের সা. নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে!

এ ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে খুব খেটেছেন স্প্রেঙ্গার। তিনি সব রকম চালাকির আশ্রয় নিয়ে দাবি করেছেনর রাসূলের সা. নিকট থেকে নির্ভুলভাবে হাদীস পৌঁছার কথাটি মিথ্যা। হাদীস আসলে হিজরী দ্বিতীয় শতকে রচিত হয়। কিন্তু সত্য যেহেতু মাটি ফাটিয়ে এমনিতেই প্রকাশ পায়, তাই ১৮৫৫ সালে স্প্রেঙ্গার আবিষ্কার করেন খতীবে বাগদাদী লিখিত تقييد علم নামক গ্রন্থ। যাতে অকাট্য প্রমাণ ও নির্ভরযোগ্য উৎসের সমর্থনে প্রমাণ করা হয়েছে– বিপুল সংখ্যক হাদীস হুজুর সা. এর জীবদ্দশায় লিখিত হয়। গ্রন্থটি প্রকাশ করার ফলে স্প্রেঙ্গার সাহেবের হাকডাক বন্ধ হয়ে যায়। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলে প্রকাশিত অরিজিন এন্ড প্রোগ্রেস অব রাইটিং প্রবন্ধে তিনি লিখেন– 'রাসূলের সা. যুগে বিপুল সংখ্যক হাদীস লিখিত হয়ে থাকবে।'

হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা তার সনদের উপর নির্ভরশীল। আর্থার জেফরি, উইন স্লট ও মন্টোগোমারি ওয়াট আক্রমণ করেছেন সনদের উপর। তাদের দাবি– 'হাদীসের পূর্ণ সনদ বর্ণনা শাস্ত্রের প্রবর্তন। তিনি ওয়াকেদীর সমসাময়িক। যখন হাদীসের পূর্ণ সনদ বর্ণনার চল শুরু হলো, অবধারিতভাবে আলেমদের মাঝে জাগলো নিজের সনদকে কীভাবে হুজুর সা. পর্যন্ত পৌঁছানো যায়।"

ওয়াট সাহেব পণ্ডিত মানুষ। হাস্যকর এ কথাটি বলার আগে তিনি বেমালুম ভুলে গেলেন হযরত ওমর রা. ওসমান রা. এর মতো সাহাবী আবু বকরের রা. কাছ থেকে শুনে যখন হাদীস বর্ণনা করলেন, তারা সরাসরি নবীজীর সা. নাম বললেন না। বরং বললেন, আবু বকর রা. থেকে শুনেছি। তিনি হুজুর সা. থেকে শুনেছেন। অনুরূপভাবে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. যায়দ ইবনে সাবিত রা. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আবু হুরায়রা রা. প্রত্যেকেই বহু হাদীস হুজুর সা. থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু যে হাদীস তারা ওসমান রা. থেকে শুনেছেন, সেখানে বলেছেন– আমাদের কাছে ওসমান রা. বর্ণনা করেছেন। তিনি শুনেছেন হুজুর সা. থেকে।

এটাই তো ইসনাদ বা সনদ। হাদীসের ক্ষেত্রে অপরিহার্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। সাহাবীরা হাদীসে সনদ বর্ণনা করতেন। ফলে দেখি আলী রা. থেকে বর্ণনা করছেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা., আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা.। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. থেকে হাদীস বর্ণনা করছেন হযরত ওমর রা. আবু আইয়ুব আনসারী রা. উবাদা ইবনে সামিত রা. প্রমুখ। এর দৃষ্টান্ত বিপুল পরিমাণে রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, কতো গভীরভাবে সাহাবায়ে কেরাম সনদের গুরুত্ব দিতেন। এর মূলে ছিলো সেই সব হাদীস, যাতে ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনার বিরুদ্ধে ভীতিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। ফলে সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনাকে খুবই ভয় পেতেন। যখন বর্ণনা করতেন, করতেন সূত্র উল্লেখ করে। সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা বজায় রেখে। নিজেদের ছাত্র তাবেয়ীদের কাছে হাদীস পৌঁছাবার সময় রাসূল সা. থেকে এ হাদীস তিনি কীভাবে পেলেন– সরাসরি না কারো মধ্যস্থতায়!! যদি কারো মধ্যস্থতা থাকে, তাহলে সেটা উল্লেখ করতেন।

এটই হচ্ছে সনদ উল্লেখ। ইমাম শাফেয়ীর জন্মের আগ থেকেই তা প্রচলিত ও গৃহীত। তাবেয়ীরা হাদীস বর্ণনা করছেন সাহাবা সূত্রে। সনদ অর্জনের জন্যে তারা সর্বোচ্চ সাধনা করছেন। ইবনে শিহাব জুহরী রহ. সনদ অর্জন করছেন আনাস রা. থেকে। রাবীয়া ইবনে আব্বাদ রা. থেকে, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে। কাতাদা রহ. সনদ অর্জন করেছেন আনাস রা. থেকে। আবদুল্লাহ ইবনে সারজাছ রা. থেকে, আবুত তোফায়েল রা. থেকে। আবার কাতাদা রহ. থেকে সনদ অর্জন করছেন সুলায়মান আত্ত-তায়মী রহ. আইয়ূব সখতিয়ানী রহ. আ'মাশ রহ. শু'বা রহ. আওজায়ী রহ. প্রমুখ। তখনও ইমাম শাফেয়ীর জন্ম হয়নি। দ্বীনের ব্যাপারে সাহাবীরা রা. সরাসরি হুজুর সা. এর সাথে সমবন্ধিত কথা থাকলে তা বলতেন। অথবা মধ্যখানে অন্য কেউ থাকলে তার উল্লেখ করতেন। তাবেয়ীরা দ্বীনের ব্যাপারে সাহাবাদের থেকে শ্রবণ করে বলতেন।

সর্বোচ্চ বিশ্বস্ততা ও সতর্কতার জন্যে তখনই সনদ অবলম্বিত হতো। কার নিকট থেকে দ্বীনী ইল্‌মের বক্তব্য দেয়া হচ্ছে, গ্রহণ করা হচ্ছে- তা যাচাই করা হতো। প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সিরিন রহ. বলেন–

إِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ

নিশ্চয়ই এ জ্ঞান তোমাদের দ্বীনের অংশ। কার নিকট থেকে তা গ্রহণ করছো, যাচাই করে নাও। (সহীহ মুসলিম) ইবনে সিরিনের ইন্তেকাল ১১০ হিজরীতে। ইমাম শাফেয়ীর জন্ম ১৫০ হিজরীতে। তারপরও ইমাম শাফেয়ী কীভাবে সনদের প্রবর্তক?

• ইমাম মালিক রহ. এর নিকটে তার যৌবনের শুরু থেকে কেউ দ্বীন সম্পর্কে কোনো কথা বলতে চাইলে তিনি প্রথমেই প্রশ্ন করতেন? عَمَّنْ কার নিকট থেকে শুনে কথাটি বলছো? জবাবে সন্তুষজনক- বিশ্বস্ত ব্যক্তির নাম উচ্চারিত হলে তিনি কথাটি শুনতেন। নতুবা তা বলারই অনুমতি দিতেন না। (তাকঈদুল ইল্‌ম : খতীবে বাগদাদী) সনদের প্রতি এই হচ্ছে গুরুত্বদানের মাত্রা। ইমাম মালিকের রহ. জন্ম হয় ৯৫ হিজরীতে, ইমাম শাফেয়ীর জন্ম হয় ১৫০ হিজরীতে। তারপরও ইমাম শাফেয়ী কীভাবে সনদের প্রবর্তক? আলফ্রেড গিয়োম তার ফর ইসলাম গ্রন্থে সনদের অকার্যকরতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন– 'সনদ প্রবর্তন হলেও লক্ষ লক্ষ হাদীসের স্তুপ তৈরী হতে সময় নিলো না।' গড়পড়তা প্রাচ্যবিদরা এভাবেই হাদীসকে সন্দেহযুক্ত করতে চেয়েছেন। অথচ মুহাদ্দিসগণ জাল হাদীস তালাশে বিন্দুমাত্রও অবহেলা করেননি। দুর্বল হাদীসকে প্রত্যাখান করতে তারা কোনো কিছুরই পরওয়া করেননি। জাল হাদীসের পৃথক গ্রন্থ রচনা করেছেন। হাদীসের সত্যতা যাচাই করার জন্যে অনেকগুলো শাস্ত্রের জন্ম দিয়েছেন। জরাহ তা'দীল নামে হাদীস সমালোচনার বিশাল অধ্যায় সৃষ্টি করেছেন। আসমাউর রিজাল নামে সনদে সম্পৃক্ত লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিত্বের হাদীসের জীবনী পর্যালোচনা করেছেন।

• প্রতিটি হাদীসের গ্রহণ–বর্জনে চূড়ান্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তারপরও হাদীসের সংখ্যা হু হু করে বেড়ে যাচ্ছিলো বলে গিয়োম যা বলতে চান, তার উৎস হলো ভ্রান্তি। লক্ষ লক্ষ হাদীসের স্তুপ তিনি কোথায় দেখলেন? নিশ্চয় তিনি শুনেছেন– হাদীসের একেক ইমাম লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্ত রাখতেন। প্রকৃতপক্ষে তাদের লক্ষ লক্ষ হাদীস মুখস্ত রাখার অর্থ হলো একটি মৌলিক হাদীসের বিভিন্ন সনদ মুখস্ত রাখা। যেমন ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের সাতলক্ষ হাদীস মুখস্ত ছিলো। ইমাম আবু যুরআর মুখস্ত ছিলো সাতলক্ষ হাদীস।

ইমাম মুসলিমের তিন লক্ষ, ইমাম বুখারীর তি লক্ষ! (দৃষ্টান্তগুলো প্রাচ্যবিদদের মজাদার আইটেম) -এ সকল বর্ণনার অর্থ হলো এক হাদীসের বিভিন্ন সনদ মুখস্ত করা। মুহাদ্দিসগণ প্রত্যেক পৃথক সনদকে একটি স্বতন্ত্র হাদীস গণ্য করেন। সাধারণত একটি হাদীস হুজুর সা. এর যুগে এক বা দুই মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকে। পরবর্তিতে যখন মাধ্যমের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তখন বহুজনের দ্বারা বহু সনদে তা বর্ণিত থাকে ফলে একটি মৌলিক হাদীস বহু সংখ্যক সনদের কারণে বহু সংখ্যক হাদীসে পরিণত হয়। যেমন :

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

একটি হাদীস। কিন্তু তা বর্ণিত আছে সাত শত সনদে। ফলে প্রত্যেক সনদকে পৃথকভাবে হিসাব করে সাত শত হাদীস রূপে তা গণ্য হয়েছে। (তাদভীনে হাদীস : মানাযির আহসান গিলানী)

তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ী যুগে হাদীসের 'সংখ্যার বিস্ফোরণ' ও 'স্তুপ গড়ে ওঠা' 'জোয়ার সৃষ্টি হওয়া' ইত্যাদি আক্রমণাত্মক বাক্যে বিদ্বিষ্টরা যে বিভ্রান্তিকে খোলাসা করতে চেয়েছেন, তার প্রকৃত চিত্র হচ্ছে এই। এ যুগে হাদীসের সনদ বেড়ে গেলো। সাহাবীদের ছাত্র ছিলেন অসংখ্য। একেক তাবেয়ীর ছাত্র ছিলেন হাজার হাজার। এমন কি লক্ষের কোটায়ও পৌঁছেছে। ফলে একটি হাদীস ছড়িয়েছে বহু মাধ্যমে। তৈরী হয়েছে বহু সনদ। বেড়েছে তার সংখ্যা। যা প্রকৃত পক্ষে মৌলিক হাদীসের বেড়ে যাওয়া নয়। এক হাদীসের প্রতিটি সনদকে মুহাদ্দিসগণ পর্যালোচনা করতেন। দুর্বল সনদকে বর্জন করতেন। বিশুদ্ধ সনদকে অবলম্বন করতেন। এ ক্ষেত্রে যাচাই ও সমালোচনার নীতি ছিলো অত্যন্ত কঠোর। যা হাদীসের শুদ্ধতা ও নিরাপত্তার জন্যে ছিলো প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই 'কঠোরতা'কে উইলিয়াম ম্যুর ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে চাইলেন। 'লাইফ অব মুহাম্মদ' গ্রন্থে দাবি করলেন- "মুহাদ্দিসগণ কী ধরনের হাদীস সমালোচনা ও যাচাই করতেন, তা পরিস্কার। এ নীতি এতো কঠোর ছিলো, যা গড়ে শতকরা নিরান্নব্বইটি হাদীসকে গ্রহণের অযোগ্য সাব্যস্ত করেছে।"

সাংঘাতিক ব্যাপার বটে! কোথায় তা সাব্যস্ত করলো, ম্যুর সাহেব তা যদি জানাতেন!! যদি সম্ভব হতো, অবশ্যই প্রমাণ হাজির করে ব্যক্তিগত মন্তব্যটিকে তিনি প্রতিষ্ঠা দিতেন। তার মতটিকে আমরা উড়িয়ে দিতে চাই না। ধরে নিচ্ছি প্রমাণ তার মনের ভেতর আছে। ধরে নিচ্ছি সেই প্রমাণ সর্বোচ্চ হাদীসগ্রন্থ- বোখারী শরীফ। ইমাম বুখারী তার সংগৃহিত ছয় লক্ষ হাদীস থেকে প্রায় নয় হাজার হাদীস বাছাই করে বোখারী শরীফে স্থান দিয়েছেন। এর অর্থ এই নয় যে, অন্য হাদীসগুলো অশুদ্ধ বা গ্রহণের অযোগ্য। ইমাম বুখারী তার গ্রন্থ সমাপ্ত

করে নিজেই বলেছেন– "বহু সহস্র সহীহ হাদীস এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে নি। এর মানে যে সব হাদীসকে তিনি গ্রন্থভুক্ত করেননি, সেগুলো 'অশুদ্ধ' বা 'অগ্রহণযোগ্য' নয়। তিনি তার নিজস্ব মানদণ্ডে কিছু হাদীস বাছাই করে স্বীয় গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সমস্ত সহীহ হাদীস গ্রন্থভুক্ত করার ইচ্ছা তার ছিলো না। গ্রন্থকে তিনি যেভাবে সাজাতে চান, যে মানদণ্ডে স্থাপন করতে চান, তার অনুকূল হাদীসগুলো তিনি পেয়ে যাওয়ার পর অন্য সহীহ হাদীসের দিকে হাত বাড়াননি। প্রয়োজন মনে করেননি। উইলিয়াম ম্যুর কিংবা তার মতো প্রাচ্যবিদরা এ জাতিয় বিভ্রান্তি ছড়ানোর সময় সাধারণত প্রমাণ হাজির করেন না। কারণ পর্যালোচনায় তা টিকবে না। তারা যেনতেন প্রকারে সংশয় সৃষ্টি করার কাজেই 'যত্নবান' থাকেন।

আলফ্রেড গোয়েম, জোসেফ শাখত, মারগোলিয়থ, রবসন, ইউল ডুরান্ট, আর্থার জেফরি, গিব, ভনক্রেমার, মন্টোগোমারি ওয়াট, কেতানি, নিকলসন প্রমুখ এ ধারায় কাজ চালিয়ে যান। তাদের অবিসংবাদিত 'ইমাম' হলেন গোল্ডযিহার। দুই খণ্ডে রচিত তার মুসলিম স্টাডিজ গ্রন্থটিকে পরবর্তি সকলেই অনুসরণ করেছেন। গোল্ডযিহার ও শাখত ইসলাম গ্রন্থাবলি থেকে উপাদান সংগ্রহ করে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি ছড়িয়েছেন। অন্যেরা চোখ বন্ধ করে তাদের বক্তব্যের পুণরাবৃত্তি করেছেন। তারা ইসনাদের বিরুদ্ধে গোলানিক্ষেপ করেছেন। মুহাদ্দিসগণ এর গুরুত্বে যত জোর দিয়েছেন, তারা যত জোর দিয়ে একে দুর্বল আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসকে অগ্রহণযোগ্য বলার পথ খুজেছেন। এ জন্যে চরিত্র হরণ করেছেন মুহাদ্দিসগণের।

বিশেষ কৌশলে আঘাতের লক্ষ্যস্থল বানিয়েছেন তাদেরকে, যারা হাদীস সংকলন, সংরক্ষণ ও এর শাস্ত্রীয় বিকাশের ভিত্তিস্বরূপ। ধৃষ্ট আক্রমণ চালিয়েছেন আবু হুরায়রা রা. হুযাইফাতুল ইয়ামান রা. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.সহ মুহাদ্দিস সাহাবাদের উপর। পরবর্তি মুহাদ্দিসগণের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার দায়িত্ব একেকজন নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। গোল্ডযিহার কামান দাগিয়েছেন ইমামুল মুহাদ্দিসীন ইবনে শিহাব যুহরী রহ. এর মহান ব্যক্তিত্বের উপর। কেতানী আক্রমণ করেছেন ইমাম মালিক রহ. এর উপর। জোসেফ শাখত হামলা করেছেন ইমাম আওযায়ী ও ইরাকী মুহাদ্দিসীনে কেরামের উপর। স্প্রেঙ্গার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন আমিরুল মু'মিনীন ফিল হাদীস ইমাম বুখারীর উপর। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই তারা বুঝতে পারেন বড় শক্ত জায়গায় দাঁত বসিয়েছেন। অগ্রহণযোগ্য উৎস, উদ্ভট খেয়াল আর যথেচ্ছ বিভ্রান্তি দিয়ে কতক্ষণ কী করা যায়? উৎসাহী অনুকারীরা যদিও তাদের মিশনকে বহুমাত্রায় বিকাশ দিয়েছেন, কিন্তু হাদীস প্রেমিক শিক্ষিত দৃষ্টিবান মহলে তা প্রত্যাখাত ও

বর্জিত হয়েছে। জাস্টিজ মুহাম্মদ করম শাহ আল আজহারীর ভাষায়- "অবাক ব্যাপার, -হাদীসের ইতিহাস ও পর্যালোচনার অসংখ্য গ্রন্থ তাদের চোখে পড়লো না। এ বিষয়ক স্বতন্ত্র লাইব্রেরী তাদের নজরে আসলো না। নির্ভরযোগ্য উৎস, প্রামাণ্য ও আকর গ্রন্থাবলি তাদের দৃষ্টিআকর্ষণ করলো না। তাদের উপর হাদীস চর্চার ভূত সওয়ার হলে ভিত্তিহীন গ্রন্থ ও ফালতু উপাদানসমূহ খুজে বের করলো। (দিরাসাতুল ইস্তেশরাক : মুহাম্মদ করম শাহ)

হাদীসের পরেই তাদের মনোযোগের কেন্দ্র হলো ফিক্হ। এ ক্ষেত্রে ইহুদী প্রাচ্যবিদ জুসেফ শাখত বিস্তর কাজ করেন। 'দি ওরিজিন্স অব মুহাম্মেডান জুরিসপ্রোডেন্স' গ্রন্থে তিনি ইসলামী ফিক্হকে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছেন।

রিয়াদের কিং সাউদ ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডক্টর মুহাম্মদ মুস্তফা আল আজমী শাখতের জবাব দিয়েছেন মানাহিজুল মস্তাশরিকীন ফি দিরাসাতিল ইসলামিয়া গ্রন্থে। ডক্টর আজমীর মতে- 'শাখত চেয়েছেন ইসলামী শরীয়ার মূলোৎপাটন করতে। ইসলামী আইনের ইতিহাসকে পুরোদমে ধ্বংস করে দিতে।'

শাখতের অনুকরণ করেছেন পরবর্তি প্রাচ্যবিদরা। তারা তার গ্রন্থকে বলতে গেলে এ বিষয়ে সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে তাদের অন্যান্য অনুকরণীয় ব্যক্তি হচ্ছের- ডেভিড স্যান্টিলামা। ইতালির প্রাচ্যবিদ। ইসলামী শরীয়াকে অবলম্বন করে সিভিল এন্ড কমার্শিয়াল ল প্রবর্তনে তার ভূমিকা বিশাল। ফিক্হ বিষয়ক বহু গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। নিকুলাস এগডিনেস। ১৯৮১ সালে ফিক্হ বিষয়ক তার বই লাহোর থেকে ছাপা হয়। শেলডন এ্যামস- লন্ডন ইউনির্ভার্সিটির রোমান সিভিল ল এর প্রফেসর। তাদের বক্তব্য কোনো না কোনো ভাবে শাখতের প্রতিধ্বণি করে।

শাখতের দাবি হচ্ছে- 'প্রথম হিজরী শতকের বিশাল অংশে পারিভাষিক অর্থে ইসলামী ফিকহের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। আইনের বিষয়টা মুসলমানদের কাছে ছিলো একান্তই গুরুত্বহীন। ধর্মের গন্ডির বাইরের বিষয়। 'ফর দি লিগ্যাল জাস্টিজ' গ্রন্থে তিনি দাবি করেন- ফিকহ বিষয়ে একটি হাদীসও হুজুর সা. থেকে বিশুদ্ধ উপায়ে বর্নিত বলে মেনে নেয়া যায় না।'

শাখতের গ্রন্থটি খুবই প্রশংসিত হয় প্রাচ্যবিদ মহলে। গিব বলেন- 'ইসলামের সভ্যতা ও শরীয়া সম্পর্কে যে কোন গবেষণার জন্যে বইটি ভিত্তি হিসেবে গণ্য হবে।' কোলসন বলেন- 'তিনি ইসলামী শরীয়ার এমন ধারণা দিয়েছেন, যা ব্যাপক অর্থে অনস্বীকার্য। (উদ্ধৃতি- আল ইস্তেশরাক ওয়াদ দিরাসাতুল ইসলামিয়া : ডক্টর আবদুল কাহহার দাউদ আবদুল্লাহ)

প্রাচ্যবিদ প্রশংসা করছে, করুক। শাখত তার বিশাল পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ভুলে গেলেন ফিকহের উৎস হচ্ছে কুরআনের পাঁচশত আয়াত। এ সব আয়াতের বিষয়বস্তু হচ্ছে শরয়ী বিধি-বিধান।

তাহারাত (পবিত্রতা) হালাল (বৈধ) হারাম (অবৈধ) সালাত (নামায) সওম (রোযা) যাকাত, হজ্জ, নিকাহ (বিবাহ) তালাক, বুয়ূ' (ব্যবসা-বাণিজ্য) হুদুদ, কেসাস, তা'জিরাত (ইসলামের শাস্তি বিধান) ইত্যাদি। হাদীসসমূহ এসব আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন মাত্র। এগুলোই ফিক্হের একেক অধ্যায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফিক্হ বিষয়ক যে কোনে গ্রন্থ হাতে নিলে এ সত্যের বাস্তবতা স্পষ্ট হবে।

কিন্তু মুশকিল হলো শাখত সাহেব হাদীসকে অস্বীকার করেই দাবীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। তাকে অস্বীকার করতে হবে কুরআনের 'আহকামাত' বিষয়ক পাঁচ শো আয়াতকে।

ফিক্হ বিষয়ক হাদীসসমূহ অস্বীকার করে শাখত সাহেব যে ঝুঁকি নিলেন, তাতেই তার প্রকল্পের আয়ু ফুরিয়ে গেছে। কারণ এ বিষয়ক হাদীসসমূহ অত্যন্ত মজবুত ও সুপ্রমাণিত। সিহাহ সিত্তার কিতাবসমূহের কথাই ধরা যাক। এতে কোনো বানোয়াট হাদীস নেই। নীতিসম্মত সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফয়সালা এটাই। সিহাহ সিত্তার প্রতিটি গ্রন্থের প্রধান অংশ ফিকহ বিষয়ক। তিরমিযী, আবু দাউদ নাসায়ী তো একান্তই ফিকহ প্রধান গ্রন্থ। বুখারী-মুসলিম-ইবনে মাযাহ থেকে ফিকহ বিষয়ক হাদীস বাদ দিলে গ্রন্থগুলোর অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে যায়। প্রফেসর শাখত 'ইন্ট্রোডাকশন' গ্রন্থে স্বীকার করেছেন 'বুখারী-মুসলিমকে এক কথায় অগ্রহণযোগ্য বলা যাবে না।' বুখারী-মুসলিম যদি এক কথায় অগ্রহণযোগ্য না হয়, তাহলে গ্রন্থ দু'টির প্রধান অংশ ফিক্হ বিষয়ক হাদীসসমূহ 'এক কথায় অগ্রহণযোগ্য' হয় কোন পাপে?

প্রথম হিজরী শতকের বিশাল অংশ ফিকহের কোনো অস্তিত্বই যদি না থাকলো, তাহলে মুসলমানরা নামায আদায় করতেন কীভাবে? রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আদায় করতেন কীসের ভিত্তিতে? না কী হিজরী 'প্রথম শতকের বিশাল অংশ' জুড়ে এগুলো তারা আদায়ই করতেন না? এ সময় কি বিচার কাজ পরিচালনা হতো না? কোনো মুসলমান বিয়ে করতেন না? ব্যবসা করতেন না? কোনো জিহাদ হয় নি? গণিমতের মাল বন্টিত হয়নি? যুদ্ধ বন্দিদের মুক্তি বা শাস্তিদানের ঘটনা ঘটেনি? দুই মুসলমানের ঝগড়া হয়নি? চাষাবাদ হয়নি? কারো উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টিত হয়নি?

শাখত সাহেবরা আশা করি ইতিবাচক জবাব দেবেন! অন্তত এই জায়গায় ইতিবাচক জবাবের জন্যে তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বলবো- কুরআন-

হাদীসের যে নীতির ভিত্তিতে এসব সম্পন্ন হয়েছিলো, সে নীতিই হচ্ছে ফিক্হ। এর মানে ফিক্হের অস্তিত্ব ইসলামের একেবারে সুচনা থেকেই ছিলো। মুসলিম জীবনের প্রয়োজনীয় বিধান নাযিল হতো, আর শরয়ী আইন তথা ফিকহের বিকাশ সাধিত হতো।

কিন্তু শাখত সাহেবের কথা হলো শরীয়া আইন গঠিত হয়েছে রোমান আইনের অনুকরণে। তার সাথে সুর মেলান গোল্ড যিহার, ভনক্রেমার, শেলডন এ্যাম প্রমুখ। তাদের দাবি- মুহাম্মদী আইন হচ্ছে রুমান আইনের সংস্কৃতরূপ। ওটাকে আরব রাজ্যসমূহের রাজনৈতিক পরিস্থিতি মতো সাজানো হয়েছে। এটা মূলত জাস্টিনিয়ান আইন ছাড়া কিছুই নয়। একে কেবল আরবী পোশাক পরানো হয়েছে।'

দাবির প্রেক্ষাপট তৈরীর জন্যে তিনি আইনবিষয়ক হাদীসসমূহ অস্বীকার করেছিলেন। আর দাবিকে প্রমাণের জন্যে অলীক এক কল্পচিত্র দাড় করান। সেটা হলো

১. ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে আরব-রোমান যোগাযোগ বিদ্যমান ছিলো। ফলে আরবরা রোমান আইন দ্বারা প্রভাবিত হয়।
২. ইহুদী-খ্রিস্টানরা আরবে রোমান আইন স্থানান্তর করে।
৩. শরীয়া আইন প্রবর্তিত হয় আরবদের কিছু উরফ বা রেওয়াজ দ্বারা।
৪. রোমান কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান ছিলো আলেকজান্দ্রিয়া, কায়সারিয়া ইত্যাদিতে। সে সব এলাকা জয় করে মুসলমানরা সেখানকার শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হন।
৫. রোমান প্রেইটর পদ্ধতি ও ইসলামী বিচার পদ্ধতিতে রয়েছে সাদৃশ্য।
৬. ফিকাহ-ফুকাহা শব্দ দু'টি রোমান ভাষা থেকে গৃহিত।

কথাগুলো এতোই স্থুল ও উদ্ভট, শরীয়া আইন সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির কাছে যা হাস্যকর। ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে তার কাছে পরিস্কার–

১. ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে আরবরা বর্বর জীবন যাপন করতো। তাদের জীবনযাত্রায় আইন ও রীতি-নীতির কোনো সম্পর্ক যদি থাকে, সেটা হলো দ্বীনে হানিফের। যার প্রবর্তক ইবরাহীম আ.। তারা এর নীতিসমূহকে গোত্রীয় প্রথা দ্বারা পরিবর্তিত করে নেয়। মূর্খতা ও কুসংস্কারের ফলে এক পর্যায়ে তাদের গোটা জীবন জাহেলিয়াতের পেটের ভেতর চলে যায়। রোমান আইনের সাথে তাদের দূরতম কোনো সম্পর্ক ছিলো, ইতিহাসের প্রমাণ্য কোনো গ্রন্থ একথা বলে না। হঠাৎ করে প্রাচ্যবিদরা বলতে শুরু করলেই সেটা সত্য হয়ে যায় না। ইতিহাস যা বলে, সেটা হচ্ছে রোমান আইন আরবের ধারে-কাছেও আসতে

পারেনি। মিসর ও সিরিয়া রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েও রোমান আইন গ্রহণ করেনি। তারা আকড়ে ধরেছিলো স্থানীয় আইন। গাসসানরা রোমান সংস্কৃতির দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হলেও রোমান আইন কখনো গ্রহণ করেনি। আরবরা রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করতো বাণিজ্যের জন্যে, ফিরে আসতো পণ্য বিনিময় করে। রোমান জীবনযাত্রার আদলের সাথে আপোষ করেনি তাদের জীবনাচার। রোমানরা তাদেরকে আপন প্রভাব বলয়ে নেয়ার বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। কারণ আরবরা নিজস্ব সংস্কৃতি ও স্বাধীন আইনের নির্দেশে পরিচালিত হতো।

২. ইহুদীরা রোমান আইন আরবে স্থানন্তর করবে কেন? তারা তো রোমান আইনকে কখনোই মেনে নেয় নি। ৭০ খ্রিস্টাব্দে রোমানদের সাথে তাদের সংঘর্ষের ফলে ইহুদী-রোমান সংঘাত সেই যে দানা বাঁধে, তা আর কখনো হ্রাস পায়নি। তারা রোমানদেরকে বরাবরই ঘৃণা করেছে। তাদের আইনকে বহন করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাবার প্রশ্নই উঠে না। আরবে ইহুদীরা ছিলো সংখ্যালঘু, নগণ্য ও অনুল্লেখ্য। যারা প্রভাব বিস্তার করবে, এটা চিন্তাও করা যায় না। তারা তো মদিনায় টিকে থাকার জন্যে একের পর এক ষড়যন্ত্র করে চলছিলো। আউসও খাজরাজের দ্বন্ধ ও সংঘাতে নিজেদের টিকে থাকার সুযোগ প্রশস্ত করছিলো। খ্রিস্টানরা থাকতো আরবের সীমান্ত এলাকায়। গ্রাম্য ও বেদুঈন জীবনে ছিলো আকণ্ঠ মজ্জমান। রোমান আইন তাদের জীবনেই প্রবেশ করতে পারেনি। তারা আবার অন্যকে এর দ্বারা প্রভাবিত করবে?

৩. শরীয়া আইনের মূল ভিত্তি চারটি –

এক. কুরআন
দুই. হাদীস,
তিন. ইজমা,
চার. কিয়াস।

এগুলো একান্তই ইসলামের বিষয়। ইজমা ও কিয়াসের ধারণা উৎসারিত কুরআনের আয়াত থেকে। বিকশিত রাসূলের হাদীস থেকে। ফিক্‌হের পরিভাষাসমূহ আরবী। আরবী শব্দ হলেই সেটা আরবদের জাহেলী যুগের প্রভাব হয়ে যায় না। জাহেলী প্রভাব ও শিরক মুক্ত শব্দাবলিকে ইসলাম গ্রহণ করেনি। বর্জন করেছে। যার অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে কুরআনে, হাদীসে, শরীয়ার প্রতিটি শাখায়।

৪. আলেকজান্দ্রিয়া, কায়সারিয়া হাররান ইত্যাদিতে গ্রীক লাইব্রেরী ছিলো। জান্দিশপুরেও ছিলো। কিন্তু ইসলামের কালে নয়। ইসলামের বিজয়ের বহু

আগে এসব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে যায়। গ্রীক সভ্যতাই যখন আত্মহত্যা করলো, তখন গ্রীক প্রভাবের বাইরে এককালের বিজিত এসব অঞ্চলে গ্রীক শিক্ষারপ্রভাব থাকার প্রশ্ন উঠে না। পরে রোমানরা সেগুলোকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত করে। কিন্তু কালক্রমে সেগুলো অস্তিত্ব হারায়। ৩৯১ সালে আর্কবিশপ থিউফিলাসের আদেশে রোমন সম্রাট থিউডরাস এগুলো ধ্বংস করান। ইসলামের আগমন হয় এর তিনশ বছর পরে। তখন এসব প্রতিষ্ঠানের নাম-গন্ধও ছিলো না। (আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী : শিবলী নোমানী)

এসব এলাকায় ইসলামের বিজয় সংগঠিত হয় মূলত ওমর রা. এর শাসনামলে। কিন্তু শরীয়া আইন তার আগেই আপন অবকাঠামো নির্মাণ সম্পন্ন করেছে। সে আইন তার পূর্ণতা, সৌন্দর্য ও জীবনবোধকে প্রতিফলিত করার জন্যে সে সব এলাকায় গিয়েছিলো। কোনো 'বিজাতীয়' রীতি ও প্রথাকে গ্রহণ করার জন্যে নয়। রোমান আইন লিখিত ছিলো হিব্রু ভাষায়। মুসলমানরা হিব্রু ভাষা জানতেন না। এক যায়েদ ইবনে সাবিত রা. হিব্রু ভাষা শিখেন বিশেষ প্রেক্ষাপটে। কিন্তু কোন ফকীহ হিব্রু শিখেছিলেন, এমন দৃষ্টান্ত নেই। হিব্রু জানা কিছু ইহুদী মুসলমান হলেও তাদের বংশে কোনো ফকিহের জন্ম হয়নি। হিব্রু গ্রন্থাবলির আরবী অনুবাদ হয় আব্বাসী শাসনামলে। খলীফা মামুনের সময়ে। অনুদিত গ্রন্থগুলো ছিলো বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক। ডক্টর যুহদী ও বদরান দীর্ঘ গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন– আরবরা একটিও আইনবিষয়ক হিব্রু গ্রন্থ অনুবাদ করেনি। কারণ তাদের আইন অন্যসব আইনের ক্ষুদ্রতা, তুচ্ছতা ও প্রতিবন্ধি রূপ স্পষ্ট করে দিয়েছিলো।

৫. রোমান প্রেইটর পদ্ধতি রোম থেকেই বিলুপ্ত হয়ে যায় ইসলামের আগমনের চারশো বছর আগে। কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ গায়ের জোরে সিরিয়ায় এ পদ্ধতির উপস্থিতি দাবি করলেও গীবনসহ ইউরোপের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকরা এর বিলুপ্তির ইতিহাস প্রকাশ করে দিয়েছেন। প্রেইটর পদ্ধতিতে বাদী-বিবাদী উভয়ে বিচারক নির্ধারণ করতো। উভয়ের দাবি সামনে পেশ করতো। বিচারক নির্দিষ্ট ফরমে লিখার নির্দেশ দিতো। ফরমে আকা থাকতো কীভাবে মামলার রায় দেয়া হবে, তার চিত্র। অথচ ইসলামে বিচারক নিয়োগ দেবে রাষ্ট্র। প্রেইটর পদ্ধতির সাথে ইসলামের মিল এতটুকুই যে, উভয় পদ্ধতিতে বাদীকে দলীল পেশ করতে হয়। কিন্তু শরীয়া আইনে এ নিয়ম এসেছে হাদীস থেকে। হুজুর সা. এর জীবদ্দশায় তা স্থায়ী বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানরা যখন আলেকজান্দ্রিয়া- কায়সারিয়ায় যান, এ নিয়ম সাথে করেই নিয়ে যান। রোমান আইনে প্রাপ্ত বয়স্ক হবার বয়সসীমা মেয়েদের জন্য ১২ বছর, ছেলেদের জন্যে ছিলো ১৪ বছর। ইসলামে ছেলে-মেয়ে উভয়ের বয়স সীমা ১৫ বছর। কিছু

প্রাচ্যবিদ বলতে চান– ইসলাম এ বয়সসীমা ধার করেছে রোমান আইন থেকে। সেটা কীভাবে? ১২ আর ১৫ কি এক? ১৪ আর ১২ কি এক? ছেলে-মেয়ের ভিন্নতা আর উভয়ের বয়সভিত্তিক সমতা কি এক?

শাশ্বত সাহেবদের কল্পনাশক্তির উর্বরতা বটে! সবকিছুকে দারুণভাবে গুলিয়ে ফেলতে এমনই কল্পনাশক্তির দরকার। কিন্তু কল্পনাশক্তি যেখানে কিছুই করতে পারে না, সে জাগয়ার নাম সত্য। অমোঘ, নির্মম ও অনিবার্য সে। প্রয়োজনে সে ক্ষমাহীন। এ ক্ষেত্রে সত্য হলো– আইনটির উৎপত্তি হুজুর সা. এর জীবদ্দশায়। ১৪ বছর বয়সে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. ওহুদ যুদ্ধে অংশ নিতে চাইলে হুজুর সা. অনুমতি দেননি। পরের বছর খন্দক যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হয়। তখন ইবনে ওমরের রা. বয়স ছিলো ১৫ বছর। এ থেকে সূচিত হয় শিশু ও বয়স্কদের পার্থক্য।

৬. ফিকহ ও ফুকাহা শব্দ দু'টি রোমান ভাষা থেকে গ্রহণ করা হয়েছে- দাবিটি গোল্ডযিহারের। অথচ কুরআন মাজিদে ফিকহের মূলধাতু ব্যবহৃত হয়েছে কমপক্ষে বিশ বার। হাদীসে ব্যবহৃত হয়েছে অসংখ্যবার। কুরআনই একে স্বতন্ত্র গুরুত্ব দিয়ে পরিভাষার পর্যায়ে নিয়ে যায়। হাদীস তাকে প্রতিষ্ঠা দেয়। ফিকহের গুরুত্ব ও ফুকাহার মর্যাদ পরিস্কার করে দেয়। ফলে কুরআন-হাদীসের পাঠক মাত্রই শব্দ দু'টিকে স্বতন্ত্র মাহাত্মে দেখতে থাকেন। ইসলামী সমাজ জীবনে তার সম্মান নিশ্চিত হয়ে যায়। ফকিহগণ শুধু শব্দ দু'টিকে যথাস্থানে স্থাপন করেছেন। সাহাবাদের রা. জীবনে ফিকহ ও ফুকাহা ছিলো এক মহিমান্বিত অন্বেষা। 'তফক্কুহ' এর জন্যে নিয়োজিত ছিলো তাদের জ্ঞান সাধনা। সকলেই জানতেন ফিকহ ও ফুকাহা ইসলামী জ্ঞানশাস্ত্রের মহোত্তম অধিষ্ঠান।

রোমান শব্দ থেকে একে আমদানী করতে হবে– এমন অবকাশ রাখেনি কুরআন-হাদীস। কেউ যখন এর রোমান উৎসের দাবি করেন, সেটা উদ্ভট প্রলাপের মতো শোনায়। শরীয়া আইনকে রোমান আইনের জাতক হিসেবে প্রচার করার ঘোড়ারোগ প্রথম দেখা দেয় ইতালিয় আইনজীবি ডেমিনিলো জেতসকির মাথায়। দাবিটি তিনি করেন ১৮৬৫ সালে প্রকাশিত তার এক বইয়ে। তারপর আর যান কোথা? হৈ হৈ কাণ্ড শুরু হলো। রৈ রৈ ব্যাপার ঘটে চললো। সকল প্রাচ্যবিদই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দাবিটা করতে থাকলেন। পাঠ্যগ্রন্থে লেখা হতে থাকলো ইসলামী আইনের রোমান প্রভাবের অনুচ্ছেদ। দাস্য স্বভাবের বহু মুসলিম এ নিয়ে বগল বাজাতে থাকলেন।

কিন্তু তাতে সত্যের লেশমাত্র থাকলে ফিকহের ইতিহাসে এর উল্লেখ থাকতো। ফিকহের প্রতিটি দিককে আগাগোড়া পর্যালোচনা করা হয়েছে। শরীয়ার যে সব

বিষয় পূর্ববর্তি আসমানী কিতাবের সাথে মিলে, সেগুলো স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সে সব নিয়ে স্বতন্ত্র অধ্যায় দাড় করানো হয়েছে। এখানে লুকোচুরির কোনো সুযোগ নেই। ইসলামের প্রতিটি বিষয় স্বচ্ছ-পরিস্কার। রোমান আইন থেকে যদি ফিক্‌হ উৎপত্ত হতো, সেটা অবশ্যই উল্লেখ করা হতো। কিন্তু খোদাপ্রদত্ত জীবনবিধানের বিধি বিধান একটি পরিত্যক্ত, বর্ণবাদী আইন থেকে গৃহিত হবার প্রশ্নই অবান্তর। এ প্রশ্নকে এক মুহূর্তের জন্যে প্রশ্রয় দেয়া ইসলামের ঐশী সত্যের প্রতি আস্থাহীনতা টেনে আনে। ফলে আমরা এই অবান্তর বিষয়টাকে উপেক্ষা করতেই পারি।

কিন্তু ইহুদী-খ্রিস্টানরা কথাটি তো আরো আগে বলতে পারতো। তেরশো বছর পরে একজনের মাথায় তা আসলো। এর আগে কতো অজস্র ইসলাম বিদ্বেষী কতো অজস্রভাবে ইসলামকে আঘাত করতে সচেষ্ট হলো। কতো ভ্রান্ত, উদ্ভট ও ভিত্তিহীন অভিযোগের তীর নিক্ষেপ করলো ইসলামের সীমানায়। রোমান আইন যদি ইসলামী আইনকে বিন্দু পরিমাণ প্রভাবিত করতো, তাহলে এ নিয়ে তারা পাড়া মাত করতে কসুর করতো না।

কিন্তু উনবিংশ শতকে এসে এমন কোনো উদ্ভট তত্ত আবিষ্কার না করে তাদের আর চলছিলো না। কেন চলছিলো না, তা স্পষ্ট করছেন মোস্তফা আস সাবায়ী- "যখন তারা দেখলো এমন বিশাল আইনের ভাণ্ডার, যা ইতোপূর্বে কোনো জাতির ছিলো না। সেই সমৃদ্ধ আইন কীভাবে ইসলামের হতে পারে!! এ আইনের মাহাত্ম সম্পর্কে অবগত হয়ে তারা হতভম্ব হয়ে গেলো। যেহেতু তারা রাসূলের সা. নবুওতে অবিশ্বাসী, তাই তাদের এই দাবি ছাড়া পথ ছিলো না যে এই মহান ও বিশাল ফিক্‌হ শাস্ত্র অবশ্যই রোমান আইনের সাহায্যপুষ্ট। অর্থাৎ এটি তাদের, পশ্চিমাদের থেকে নেয়া।" (আল ইস্তেশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকুন : সাবায়ী)

এর মানে দাঁড়াচ্ছে, এ আইনের বিশালতা-ব্যাপকতা ও মাহাত্মের একটি মাত্র ব্যাখ্যা রয়েছে। সেটা হলো– হুজুর সা. এর রেসালতের সত্যতা। এ সত্যতা না জানলে শরয়ী আইনের উৎস ও ইতিহাস সম্পর্কে অনুমান সাপেক্ষ উড়োকথার বাজার গরম হতে বাধ্য। কিন্তু অনুমান সাপেক্ষ, মতামতের অসঙ্গতি মানুষকে স্বস্থি দেয় না। তাই বহু প্রাচ্যবিদ বাস্তবতার গভীরে যেতে চেয়েছেন। এবং এর উৎসে মানবমেধার উপস্থিতি খুজে পাননি। রোমান আইনের সাথেও এর কোনো লক্ষ্যযোগ্য মিলও দেখেননি। বরং ধাপে ধাপে আছে দূরত্ব, ভিন্নতা ও স্বাতন্ত্র। স্বভাবে, স্বরূপে উভয় আলাদা। মাত্রা ও চরিত্রে উভয়টি ভিন্নতর। একটির সবগুলো পালক সীমাবদ্ধ মানুষের চিন্তা ও মেধার স্বাক্ষর বহন করছে। আরেকটির প্রতিটি বর্ণ স্বাক্ষ্য দিচ্ছে সীমাহীন, মহাপ্রজ্ঞাময় সত্তার প্রজ্ঞা ও

নির্দেশনার। অতএব প্রাচ্যবিদ মায়েশ বললেন- রোমান আইন ও শরীয়া আইনে দূরতম ও সাদৃশ্য নেই। কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। কারণ একটি মানব রচিত আইন। আরেকটি ঐশী প্রত্যাদেশ। (আল ইসলামিয়া ওয়াল ইস্তেশরাকিয়া : ডক্টর ইব্রাহীম আওয়াদ)

শরীয়া আইন রোমান আইনের দ্বারা প্রভাবিত নয়। এটা স্বতন্ত্র আইন। শাখত ও তার সঙ্গীরা ভুল বিচার করছেন– এমনটিই উচ্চারিত হলো ন্যালিনিউ ওলফ, নোলডে, এ্যারমেনজুস প্রমূখের কণ্ঠে। (ঐ)

মুস্তফা আস সাবায়ী লিখেন– "লাহাইয়ে অনুষ্ঠিত তুলনামূলক ধর্ম আইন সম্মেলনে যে সব সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়– তার মধ্যে এটাও ছিলো যে, নিঃসন্দেহে ইসলামী ফিকহ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আইন। এটা অন্য আইনের সাহায্যপুষ্ট নয়। এ সিদ্ধান্তে মতলববাজ প্রাচ্যবিদদের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। একইভাবে তা ন্যায়পরায়ণ সত্যসন্ধানী গবেষকদের আশ্বস্ত করেছে। (আল ইস্তেশরাক ওয়াল মুস্তাশরিকুন : সাবায়ী)

কিন্তু তারপরেও শাখতের অনুগামী অন্ডারসন, ফিতজগ্রান্ড, কোলসন, বোসর্থ সহ অনেকেই সেই মিথ্যাকে বাজারজাত করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। নানাভাবে তারা প্রত্যাখাত সেই প্রোপাগাণ্ডা রাষ্ট্র করে চলছেন। তারা খুব জোর দিয়ে বলছেন– ইসলামী ফিকহ এককালে মুসলমানদের কাজে এসেছিলো। কিন্তু বর্তমান সংকট সমাধানের সম্ভাব্যতা তাতে নেই় পরিবর্তিত পরিস্থিতির মোকাবেলায় পরিবর্তিত ব্যবস্থাপত্র দরকার। শরীয়া আইন অপরিবর্তিত, অচল, অনড়। অপরদিকে সময় তার স্রোতধারায় বহু দূর চলে এসেছে। এখন সংকটসমূহ সমকালীন। কিন্তু ফিকহে নেই সমকালীনতা। অতএব শরীয়া আইন এ যুগে অচল।

তাদের অভিযোগের জবাব অত্যন্ত নির্ভীক ও দালিলিকভাবে দিয়েছেন ডক্টর আবদুল হামিদ মুতাওয়াল্লী। তার "আশ শারিয়াতুল ইসলামিয়া ওয়া মাত্তয়াক্বিফু উলামাইল মুস্তাশরিকীন" গ্রন্থে অভিযোগটির সকল ডালপালা কর্তন করা হয়েছে। বস্তুত ইসলামী ফিক্‌হ সমকালীন এবং চিরকালীন। তার মধ্যে নেই কোনো বন্ধ্যাত্ব। সারাক্ষণ সচল। দুনিয়ায় যত আইন ছিলো, আছে, শরীয়া আইনই এদের মধ্যে সবচে গতিশীল। সকল যুগে সে চলমান। সকল পরিস্থিতিতে তার উপযোগ। যুগ-যুগান্তে তার অবাধ বিহার। কোনো কালে কোথাও যদি তার উপযোগিতায় কোনো ত্রুটি বা অচলাবস্থা দেখা দেয়, সেটা আলেমের ব্যাখ্যার কারণে। শরীয়া আইনের দুর্বলতার কারণে নয়।

এ আইন কীভাবে অচল হতে পারে? কুরআন বিধি-বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহ এসেছে সাধারণভাবে। সামগ্রিক ধাচে। বিস্তারিত ব্যাখ্যার দিকে তা যায়নি।

অর্থাৎ মামলার মৌলিক ধারাটা উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে সমাধান করা যায় যে কোন প্রেক্ষাপটে। যে যুগে তা সংগঠিত হবে, সে যুগের আলোকে। এসব ধারায় আছে যে কোন যুগ ও পরিস্থিতিতে বিচারের সুযোগ। আর বিচারের কাজটা কেবল আঞ্জাম দিতে পারবেন বিশেষজ্ঞ ফকীহ। যুগ পাল্টাবে, অপরাধের ধরণ পাল্টাবে, পরিবেশ-পরিপ্রেক্ষিত পাল্টাবে, কিন্তু ইসলামী আইনকে পাল্টাতে হবে না। তার মূল সূত্রটি বজায় থেকে যাবে।

এতে আছে এমন কিছু বিষয়, যা স্থায়ী। অপরিবর্তনীয়। অটল। অমোঘ। কোনো ফকীহ এর বাইরে যেতে পারবেন না। আবার প্রচুর বিষয় আছে পরিবর্তনযোগ্য। সময়ের বাস্তবতার আলোকে যার অবয়ব পাল্টাবে। আধুনিক বিষয়ের স্পষ্ট বক্তব্য ইসলামে না থাকলেও আছে এমন সব তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য ও ইঙ্গিত– যার ভিত্তিতে গবেষণা করে আজ বা আগামী কালের সমস্যা সমাধান করা যায়। জীবন ও জগতের অকথিত মামলার মিমাংশা করা যায়। জটিলতার নিরসন করা যায়। কুরআন-হাদীসের আওতায় চিন্তা-গবেষণা দ্বারা নতুন সৃষ্ট আইনী জিজ্ঞাসা ও সমস্যার সমাধান আবিষ্কার করা যায়। এই গবেষণার নাম ইজতেহাদ। যা ইসলামী আইনের কালজয়ী গতিশীলতার ও চিরন্তন কার্যকরিতা নিশ্চিত করে।

ইসলামী আইনের প্রয়োগিকতা আজ কি অতীতের মতো সমান কার্যকর নয়? তাকান ঐ সব রাষ্ট্রের প্রতি, যারা ইসলামী দণ্ডবিধি প্রয়োগ করছে। সে সব দেশের অপরাধ চিত্র দেখুন। আর দেখুন সর্বোন্নত পশ্চিমা দেশসমূহের অপরাধের চিত্র। বিশাল পার্থক্য ধরা দেবে। দেখতে পাবেন- কোথায় মানুষের জীবন অধিক নিরাপদ? সম্পদ ও ইজ্জত অধিক নিরুপদ্রব? কোথায় অপরাধের মাত্রা ক্রমহ্রাসমান? কোথায় ক্রমবর্ধমান? কোথায় নারীরা ধর্ষিতা-লুণ্ঠিতা ও অপহৃতা হচ্ছে প্রতিনিয়ত? কোথায় মাদক-ইভটিজিং, অশ্লীলতা, ডাকাতি, চুরি, ইত্যাদির মাত্রা কম?

যদি একজন ব্রিটিশ জাগ্রত বিবেক নিয়ে এই তুলনা ও পর্যালোচনা করে, তাহলে মুক্তচিত্তে সে শরীয়া আইনের শ্রেষ্ঠত্ব, উপযোগিতা ও অপরিহার্যতা স্বীকার করবে। অথচ পৃথিবীর কোথাও শরীয়া আইন সঠিক ও পূর্ণরূপে কার্যকর নয়। এ আইনের পূর্ণ সুফল পেতে হলে তাকে সম্পূর্ণরূপে কার্যকর করতে হয় এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হয়। কিন্তু কোনো আসুস্থ, রাজতান্ত্রিক ও অনুন্নত রাষ্ট্র যখন মাত্র একটি ক্ষেত্রে শরীয়া আইন বাস্তবায়ন করছে, এতেই তার সুফল ও কল্যাণকারীতা বিস্মিত করছে বিবেকবান পৃথিবীকে। এ কী শরীয়া আইনের চিরন্তনতার একটি ঝলক নয়? যদি সামাজিক-সংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তারই নির্দেশনায়

পরিচালিত হতো কোথাও– তাহলেই তার কল্যাণকারীতার প্রকৃত চিত্র পৃথিবী দেখতে পারতো আরেকবার!!

সেটা যাতে বাস্তবে সংগঠিত হতে না পারে, সেজন্য প্রাচ্যবিদ ও তাদের দাস-দাসীরা শরীয়া আইনের বিরুদ্ধে সারাক্ষণ তেতে রয়। তৈরী করে মিথ্যার পাহাড়। মানবতার হেফাজতে তার প্রয়োজনীয় কঠোরতাকে অমানবিকতা আখ্যায়িত করতে চায়। আবার তাকে ভেতর থেকে বিকৃত করতে সচেষ্ট থাকে। মুসলিম জীবনে তার আবেদনকে শূন্যের কোটায় নামিয়ে আনার ব্যর্থ প্রয়াস চালায়। একে উপস্থাপন করতে চায় আধ্যাত্মবিরোধী এক ধারা হিসেবে। তাসাউফকে দাঁড় করাতে চায় এর প্রতিকূলে। অথচ ফিকহ ও তাসাউফ হচ্ছে দেহ ও আত্মার মতো। ফিক্হ যদি হয় দেহ, তাসাউফ তার আত্মা। একটি থেকে আরেকটিকে বিচ্চিন্ন করলে কেউ বাঁচাবে না। কিন্তু প্রাচ্যবিদরা উভয়টিকে বিচ্ছিন্ন করে এবং মুখোমুখি দাঁড় করায়। তারা তাসাউফের পক্ষ নেয়। ফিক্হের বিরুদ্ধে রণসজ্জা দেখায়। আসলে তারা কারোই পক্ষে নয়। উভয়ের মৃত্যু নিশ্চিত করতে চায়।

বিকৃতির জন্যে তাদের সবচে' পছন্দের বিষয় হলো তাসাউফ। একে তারা লাওয়ারিস সম্পত্তির মতো যথেচ্ছ ব্যবহার করতে চান। ফিক্হের মতো তাসাউফকে তারা ভিন্ন ধর্মের দান হিসেবে দেখাতে চান।

এইচ মার্টেন ও গোল্ডযিহার দাবি করেন– বেদান্ত মতবাদ ও বৌদ্ধ দর্শন থেকে তাসাউফের উদ্ভব।

ভনক্রেমার, নিকলসন প্রমুখের দাবি– খ্রিস্টধর্ম ও নিউ-প্লেটোনিক মতবাদ থেকে তাসাউফের উৎপত্তি।

ব্রাউন ও তার অনুসারীদের দাবি– পারসিক প্রভাবের ফলে জন্ম নেয় তাসউফ।

কীভাবে বেদান্ত মতবাদ থেকে জন্ম হবে তার? বেদান্ত মায়াবাদ আর সুফিদের জগতভাবনার ব্যবধান আকাশ-পাতাল। বেদান্তিকরা এ জগতকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়। তাসাউফ এ জগতের বাস্তবতা স্বীকার করে। সুফিদের কাছে এ জগত পরম সুন্দরের প্রকাশ। বেদান্তিকদরে কাছে এ জগৎ অর্থহীন বিভ্রম। তাসাউফের কাছে এ জগত মহামূল্যবান। এ জীবনের সাধনাই মহাজীবনের ভিত্তি। বেদান্তিকরা তাত্তিক দিক থেকে বলতে চান জীবন মূলত অলীক। তাসাউফের কাছে জীবন মূল পুঁজি- কল্যাণের, সৎকর্মের। প্রবৃত্তির দাসত্বে যে জীবন কাটায়, সে নিজেকে কেবল অসার বানায়। বেদান্তিকরা হতাশার চাষ করেন। তাসাউফ দয়ার আশা ও ক্রোধের ভীতি দিয়ে জীবনকে সাজায়। তারপরও কোথায় সাদৃশ্য উভয়ের?

সুফি সাধকরা কৃচ্ছ্রতা ও সংযমী জীবন যাপন করেন। রাসূলে কারীমের সা. জীবন তাদেরকে এটা শিখিয়েছে। ভারতীয় যোগী ও ঋষীদের থেকে তা শিখতে হবে কেন? তাদের মধ্যে কৃচ্ছ্রতা দেখেই তাকে জোর করে ঋষিদের সাথে মিলাতে হবে কেন? পৃথিবীর কোন সাধক কৃচ্ছ্রতার জীবন যাপন করেন না? মহান ব্রত উদযাপনে কে সংযমী জীবন কাটান না? দার্শনিক, সমাজ সংস্কারক, দেশ দরদী রাষ্ট্রনায়ক- সকলেই একই পথের যাত্রী.। তাহলে তারাও কি যোগীদের থেকে এসব শিখেছেন?

কীভাবে বেদান্ত মতবাদ থেকে জন্ম হবে তার? বৌদ্ধদের 'নির্বাণ' ও তাসাউফের 'ফানার' সাদৃশ্য দিয়ে প্রমাণ করা অসম্ভব। নির্বাণ আগাগোড়া নেতিবাদী। ফানা আগাগোড়া ইতিবাচক। ফানা সুফিদের আধ্যাত্মিক উর্ধ্বগতির শেষ স্তর নয়। চিরন্তন সত্যে জাগরণ তাদের পরবর্তি কামনা। বৌদ্ধদের নির্বাণ আত্মবিলোপেই শেষ। পরবর্তি কোনো স্তর নেই। নির্বাণ মানুষের প্রকৃতি বিরোধি পথ দিয়ে হাটে। প্রকৃতির বিনাশ কামনা করে। ফানা মানবপ্রকৃতির ইতিবাচক বিকাশের পথে হাঁটে। তার মহত্তম উদ্ভাস কামনা করে। নির্বাণ লালন করে না চিরন্তন সত্তার প্রেম। ফানা হচ্ছে চিরন্তন সত্তার প্রেম প্রেম আর প্রেম।

কীভাবে ভারতীয় ভাবধারা থেকে জন্ম হবে তার? যোগী-ঋষীবাদ তো নিরেট শিরিক। ইসলাম তো এর ধ্বংশ নিশ্চিত করতে চায়। তাসাউফ তো তার সবচে নিরাপোষ অধ্যায়। বৌদ্ধমতবাদ তো ইসলামী জীবনদর্শনের বিপরিত। সেখানে দুই দ্বন্ধমুখর সু ও কু এর পরাক্রমশালী শক্তি। কিন্তু তাসাউফ দেখে জড় ও অধ্যাত্মিক জগতে একেরই বির্বতন। ভিক্ষুরা তো মোক্ষ লাভে প্রত্যাখান করে সব স্বাভাবিকতা। তাসাউফ স্বাভাবিক জীবনে সাধনার উচ্চস্তরে আরোহণ করতে বলে। বৌদ্ধ মতবাদ তো খোদাকেই চিনে না, চিনায় না,চিনাতে চায়ও না। মোক্ষ ও মুক্তির কথা বলে। কিন্তু খোদাহীন মোক্ষ ও মুক্তির বাযবীয় ধারণাকে প্রথমেই নস্যাত করতে চায় তাসাউফ।

কীভাবে ভারতীয় চিন্তাধারা থেকে জন্ম হবে তার? ভারতে তো মুসলমানরা আসেন নবম শতকের পরে। কিন্তু তাসাউফ তো জন্মলাভ করে মদীনায়, রাসূলে কারীমের সা. জীবন থেকে। কুরআনের শিক্ষা ও নির্দেশনা থেকে। আসহাবে সুফফার নমুনা থেকে। তা তো বিস্তৃত হয় আবু বকর রা. ও আলী রা. এর রূহানী সূত্রে। তা তো বিকশিত হয় মদীনার ইসলামী সমাজে। তা তো চূড়ান্ত রূপ নেয় হাসান বাসারীর (ওফাত : ৭২৮) জীবনে। আবু হাশিমের (ওফাত : ৭৭৭) সাধনায়। ইব্রাহীম ইবনে আদহামের আত্মত্যাগে (ওফাত : ৭৭৭) রাবেয়া বাসারীর (ওফাত : ৭৪৯) জীবনাচারে। ভারতে যখন ইসলাম এলো,

তাসাউফ তখন চূড়ান্ত যৌবনে। সে প্লাবিত করছে গোটা জগত্। সকল চিন্তা ও মতাদর্শ প্রভাবিত হচ্ছে তার ফল্গুধারায়।

মার্টেল সাহেবদের দাবি কোনো দলিল পেশ করে না। শুধু জানায় সাদৃশ্যের কথা। উভয়ে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কীসের সাদৃশ্য? কোথায় সাদৃশ? প্রাচ্যবিদ নিকসলন তাই তাদের এ দাবিকে অবান্তর হিসেবে চিত্রিত করেছেন।

তবে কি তাসাউফের জন্ম খ্রিস্ট্রিয় প্লেটোবাদ থেকে?

কীভাবে সেখান থেকে উৎপত্তি হবে তার?

খ্রিস্টপূর্ণ ৪২৭ অব্দে জন্ম নেয়া প্লেটোর বিরস, ধুসর ও মরুভূমি সদৃশ দর্শনের ভেতর থেকে জন্ম নেয় নয়া প্লেটোবাদ। ধর্মের খোদা সত্তাসম্পন্ন, গুন সম্পন্ন। কিন্তু প্লেটোর খোদা নির্গুণ এক মহা চেতনা! প্লটিনাস এই নির্গুণ চেতনাকে সত্তা থেকে অভিন্ন ব্যক্তিত্ব রূপে আখ্যায়িত করেন। প্লেটোর দর্শনকে অবলম্বন করে তিনি প্রেমমার্গের দিকে অগ্রসর হন। তিনি এ জগতের বস্তুসমূহের জন্ম ও বিকাশকে বলেছেন আইডিয়া। বহিঃপ্রকাশের তিনটি স্তর। যথা– আত্মন্ময় জগত, প্রাণীজগত ও বস্তুজগত। আবার পরমাত্মার দিকে প্রত্যাবর্তনের স্তর তিনটি : ইন্দ্রিয় অনুভূতি, মার্জিত জ্ঞান ও পরমাত্মায় সমাধি। প্লটিনাস বলেন জগতের সবকিছুই শাশ্বত, চিরঅক্ষর অব্যয়। কারণ তা গঠিত স্থায়ী ফর্ম (আকৃতি) ও মেটার (পদার্থ) দ্বারা। এখানে সাফল্যের কাজ হচ্ছে মাত্র তিনটি– সঙ্গীত বা শিল্পকলা, প্রেম ও দার্শনিকতা।এর কোন দিকটি ইসলামের অনুরুপ? সৃষ্টিজগতকে চিরঅক্ষয় মানলে তো মুসলমানই থাকা যাবে না।

প্লটিনাসের মতবাদ ইউরোপে বিস্তার করে বিরাট প্রভাব। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে তার পদচ্ছাপ পড়ে গভীরভাবে। আরবের কোথাও এর প্রভাব কখনো বিস্তৃত হয়নি। এ মতবাদ প্রচারের সময় পারসিকদের সাথে রোমানদের যুদ্ধ চলছিলো। দীর্ঘস্থায়ী এ যুদ্ধ মতবাদটিকে পারস্য ও আরবের আশাপাশে আসতে দেয়নি। কোনো কোনো প্রাচ্যবিদ দাবি করেন জাস্টিনিয়ানের আমলে নিউ প্লেটোবাদী দার্শনিকদের ইউরোপ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হলে তারা আশ্রয় পান নওশেরওয়ার দেশে। ফলে তাদের থেকে এ মতবাদ প্রাচ্যে ছড়িয়ে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো– এসব দার্শনিক রাজনৈতিক আশ্রয় পেলেও তাদের দর্শন পারসিক রাজত্বের কোথাও আচড় ফেলতে পারেনি।

জীবনবোধ, স্রষ্টাচিন্তা, অধ্যাত্মভাবনা, জগতদর্শন, খোদাপ্রাপ্তির পথ, কর্ম ও রূপরেখা– এগুলোর সমন্বয়েই তো তৈরী হয় আধ্যাত্মিক মতবাদ। কিন্তু নিউপ্লেটোবাদ প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলামের প্রতিকূল। তাসাউফের সাথে এর দূরত্ব ব্যাপক। তাহলে তার দ্বারা তাসাউফ প্রভাবিত হলো কোথায়? কীভাবে? সে

প্রভাবের লক্ষণ কোথায়? আলামত না থাকলে কীভাবে তা প্রমাণিত হবে? এর জীবনবোধ, লক্ষ্য ও পদ্ধতির সাথে তো সংঘাত করছে ইসলাম। এর মূল ভাবনাভীতকেই তো প্রত্যাখান করছে ইসলাম। এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়াকে তো জাহেলিয়াত হিসেবে দেখে ইসলাম। কিন্তু তারপরও কীভাবে কাঠাল জন্ম নিতে পারে তালগাছ থেকে? কিংবা মানুষ জন্ম নিতে পারে পাথর থেকে?

এমনটি যদি সম্ভব হতো, তাহলেই নিউপ্লেটোবাদ থেকে তাসাউফের জন্মতত্ত হয়তো পায়ের তলে মাটি পেতো।

কিন্তু এ দাবির চেয়ে আরো হাস্যকর হলো– পারসিক ভাবধারা থেকে তাসাউফের জন্মতত্ত। ইংরেজি পণ্ডিত ই.জি ব্রাউন তো পরিস্কার দাবি করেন- তাসাউফের জনক পারসিকগণ। সেটা কীভাবে? ব্রাউন ব্যাখ্যা করেন– আরবরা ছিলো সাংস্কৃতিক দিক থেকে নিকৃষ্ট। পারসিকরা ছিলো উৎকৃষ্ট। সামরিকভাবে আরবরা জয়ী হয় তাদের উপর। কিন্তু সাংস্কৃতিক সংঘর্ষ চলতে থাকে। এতে উৎকৃষ্ট সংস্কৃতি হয় জয়ী। বিজয়ী আরবরা পারসিক সংস্কৃতি অনুসরণ করে। সামরিক পরাজয়ের ফলে পারসিকদের মধ্যে জেকে বসে হতাশা ও মরমীবাদ। ফলে অধিকাংশ সুফি পারস্যের বুকে জন্ম গ্রহণ করেন। এ ছাড়া পারসিকদের ধর্মমত চিন্তাধারা ও ভাবধারায় একটি আধ্যাত্মিক স্বকীয়তা বিদ্যমান। জাতি হিসেবে তারা আর্য অন্তর্মুখী। আরবরা সেমিটিক- বহির্মুখী। আরবগণ প্রত্যক্ষবাদী, পারসিকগণ ভাববাদী। প্রত্যক্ষবাদ ভাববাদের কাছে পরাজিত হলে জন্ম নেয় সুফিবাদ। (উদ্ধৃতি– মাসাদিরুল মা'লুমাত : ইব্রাহীম আন নামলাহ)

পারস্যের মুসলিম, চিন্তাবিদ ইব্রাহীম আন নামলাহ এ বিভ্রান্তিকে চূড়ান্ত অনৈতিহাসিক ও কল্পনাবিলাস বলে অভিহিত করেছেন। আসলেই তাই। ইতিহাস প্রমাণ করে ইসলামের রাজনৈতিক জয়ের প্রেক্ষাপট তৈরি করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জয়। পরিস্থিতি এমন ছিলো না যে পারসিকরা ইসলাম গ্রহণ করলো আর সাংস্কৃতিকভাবে তাদের পুরণো কুসংস্কার ও শিরকী সংস্কৃতির অনুসরণ করে চললো। ইসলাম তার সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য দিয়ে পারসিকদের এতোই পরাভূত করেছিলো যে– যারা মুসলমান হয়নি, তারাও ইসলামের অধিনস্থতা কামনা করলো। পারস্য জয়ের পর অচিরেই এমন সময় এলো, যখন মুসলমানরা অধিবাসীদের নিরাপত্তা দিতে পারছিলো না। তারা বহু এলাকার কর্তৃত্ব তখন ছেড়ে আসেন স্বেচ্ছায়। যরথুস্টরা তখন কাদছিলো। তারা কামনা করছিলো– মুসলমানরা অচিরেই তাদের শাসক হয়ে ফিরে আসবেন। প্লেগের প্রাদুর্ভাবে মুসলিম সেনাবাহিনী যখন চরম দুর্দিনে, পারসিকরা চাইলেই মুসলমানদের হারিয়ে দিতে পারে, তখনও তারা মুসলমানদের কল্যাণকামী

থেকেছে। তাদের উপর চড়াও হয়নি। কারণ হলো ইসলামী সংস্কৃতি তাদের মনকে অধিকার করে নিয়েছিলো।

চতুর প্রাচ্যবিদরা ইসলামী সংস্কৃতিকে আরব সংস্কৃতি আখ্যায়িত করে তাকে জাতীয়তাবাদী ব্যাপার হিসেবে চিহ্নিত করতে চায়। পারসিক সংস্কৃতির সাথে তার দ্বন্দ্ব দেখাতে চায়। নৃতাত্ত্বিক ও ভৌগলিক ভিন্নতার রেখা টেনে দিয়ে দেখাতে চায় মুসলমানরা সেই সময়েও ভৌগলিক-গোষ্ঠিতান্ত্রিক ও নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের দ্বারা চালিত হতেন। অথচ মুসলমানদের একমাত্র জাতীয়তা গড়ে দিয়েছিলো ইসলাম। আরবরা যেমন ইসলাম গ্রহণ করে শুধুমাত্র মুসলমান হয়েছিলেন, পারসিকরাও ইসলাম গ্রহণ করার পরে মুসলমান ছাড়া আর কিছুই হতে চাননি। তারা আরবদের আরব হিসেবে নয়, বিজয়ী হিসেবে নয়, বরং ইসলামের বাহক হিসেবে সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনাদর্শের শিক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে নেন। ইসলাম যে সংস্কৃতির নির্দেশ দেয়, সেটাকে নিজেদের করে নেন। সেখানে সাংস্কৃতিক সংঘাতের প্রশ্নই ছিলো না। বরং এ ছিলো একটি পরাক্রমশালী জীবনী শক্তির মহাস্রোত, যার উদ্দাম উত্তাল ও সমুন্নত মাহাত্মে পৃথিবী প্লবমান,যার বিশিষ্টতা ও অনন্যতার আশ্চর্য বিস্তারে তৃণ খণ্ডের মতো ভেসে যাচ্ছিলো রোমান, পারসিক কুসংস্কার ও সাংস্কৃতিক জাহেলিয়াত। যে সব সংস্কৃতি মানবতাহীন ভাবধারা ও পাশবিক আকাঙ্খাসমূহের দুঃসহ ভার বইতে না পেরে বিপর্যয়ের চরম পঙ্কে খাবি খাচ্ছিলো, মানুষের ভেতরের মানুষ এখান থেকে পাচ্ছিলো না কোনো খাদ্য, কোনো পানীয়, কোনো পথ্য। তার নিশ্বাস হয়েছিলো রুদ্ধপ্রায়। তার ফুসফুস ক্ষয়ে যাচ্ছিলো বিষের প্রভাবে। এসব সংস্কৃতি মানুষের অধঃপাত ও হৃদয়ের বন্দিত্বের প্রতীক হিসেবে বেঁচেছিলো। সে পুষ্টি খুজছিলো বর্বরতায়, অজ্ঞতায়, পাশবিকতায়। পরিণত হয়েছিলো জীবনের অভিশাপে। এমন এক সংস্কৃতি যুদ্ধ করা দূরে থাক, ইসলামের মুখোমুখি দাঁড়াবারই হিম্মত রাখতো না।

বহুত্ববাদ, অবতারবাদ, জন্মান্তরবাদ প্রভৃতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এসব সংস্কৃতিকে ইসলাম দেখেছে জাহেলী যুগের অবশেষ হিসেবে। যারা গোড়ায় ছিলো পচন, দেহের সর্বত্র ছিলো জীবাণূদের দাপাদাপি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গিয়েছিলো ক্ষয়ে, হাড়-গোড়ের বন্ধন হয়েছিলো ছিন্নপ্রায়। মানবতাকে তাদের দেয়ার মতো কিছুই ছিলো না। ইসলামের প্রবল প্রাণশক্তির তোড়ে তাদের একমাত্র ভবিতব্য ছিলো– ময়দান ছেড়ে দেয়া। তারা জীবনের রাজপথ ছেড়ে গলি-ঘুপচিতে আশ্রয় নিলো। অন্ধকারের অপবিশ্বাস ও অলীক ভাবধারা নিয়ে তুষ্ট থাকলো। সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনের জাগরণের বিপরীতে চোখ বন্ধ করে বালিতে মুখ গুঁজে রইলো।

ইতিহাসের কপাল! আজ কিছু প্রাচ্যবিদের মুখে শুনতে হচ্ছে সেই সব সংস্কৃতি হয়েছিলো জয়ী! ইসলামকে দিয়েছিলো তাসাউফ। তারা দেখে না- ইসলাম ও তাসাউফ দৃষ্টি ও দৃষ্টিশক্তির মতো। তারা দেখে না কুরআনের বিপুল সংখ্যক আয়াত, যা তাসাউফের উৎস। তাদের চোখে পড়ে না অসংখ্য হাদীস, যেখানে তাসাউফ আপন অবয়বে দণ্ডায়মান। আপন মহাত্মে প্রদীপ্ত। আপন ঐশ্বর্যে গরিয়ান।

এ ব্যাপারে তাদের আচরণ এক কথায় দৃষ্টি ও বুদ্ধিপ্রতিবন্ধির মতো। প্রতিটি অধ্যায়ে তারা বিভ্রান্তি রটায়। প্রতিটি প্রেক্ষাপটে বিদ্বেষ ফলায়। প্রতিটি বাঁক ও মোড়ে ছড়িয়ে দেয় ভিত্তিহীন প্রলাপ।

যার নজির ছড়িয়ে আছে বিপুল সংখ্যক ইংরেজি, জার্মান ও ফরাসী গ্রন্থে। আমরা শুধু ইংরেজি ভাষার প্রসিদ্ধ কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করবো। যা থেকে বুঝা যাবে তাদের কাজের মাত্রা ও পরিধি।

১৯১৩ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত টমাস আর্নল্ডের দি প্রিচিং অব ইসলামে তাসাউফ নিয়ে বিভ্রান্তিকর ব্যাখ্যা পেশ করা হয়।

১৯২১ অক্সফোর্ড প্রেস থেকে ছাপা হয় রেনল্ড এ নিকলসনের স্টাডিজ ইন ইসলামি মিষ্টিসিজম। এ গ্রন্থে তাসাউফকে ইসলামের বাইরের বিষয় হিসেবে প্রতিপন্ন করা হয়। উন্নত কলা ও বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন ডাইমেনশন দাঁড়ায় এ গ্রন্থে। বিকৃতির বহুমাত্রিক উপাদান হয় একত্রিত।

এ ধারার কাজ হচ্ছে–

- মিস্ট্রিক্যাল ডাইমেনশন অব ইসলাম– শিমেল (নর্থ ক্যারোলিন ইউনিভার্সিটি)
- ওরিয়েন্টাল মিস্টিসিজম– এফ. আই পালমার (লন্ডন)
- সুফিজম– এ.জে. আরবেরী (লন্ডন ও নিউইয়র্ক)
- এ হিস্ট্রিক্যাল এনকুয়ারী দি অরিজিন এন্ড ডেভলপমেন্ট অব সুফিজম- এ.জে আরবেরী (নিউইয়র্ক)
- এন ইন্ট্রোডাকশ অব সুফি ডকট্রিন– ডি.এম. ম্যাটসন (প্যারিস)
- এ কম্পারেটিভ স্টাডি অব দি পিলোসাপিক্যাল কনসেপ্ট অব সুফিজম- থাশিহুক ইয়ুথুস (টুকিউ)
- রিডিং ফর দি মিস্টিক অব ইসলাম– মার্গারেট স্মিথ (লন্ডন)
- হিন্দু এন্ড মুসলিম মিস্টিজম– আর.সি. জেনার (নিউইয়র্ক)
- দি প্যাশন অব আল হাজ্জাজ – হার্বার্ট ম্যাশান (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস)

- ক্রিয়েটিভ ইমেজিনেশন ইন দি সুফিজম অব ইবনে আরাবী– ক্রবিন হেনরি (প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস)
- আল মুহাসেবী এন্ড ইয়ারলি মিস্টিক অব বাগদাদ- মার্গারেট স্মিথ (আমস্টার্ডাম)
- ইবনে তাইমিয়াস শরাহ অন দি ফুতুহুল গাইব- জর্জ মাকডেসি (আমেরিকান জার্নাল অব এ্যরাবিক স্টাডিজ)
- সিমনানি অন ওয়াহদাতুল উজুদ ইন কালেক্টর পেপারস অব ইসলামিক ফিলসফি এন্ড মিষ্টিজম -হারমান ল্যান্ডল্ট (তেহরান)
- শায়খ আহমদ সেরহিন্দি এন আউট লাইন অব হিজ টুথ এন্ড হিস্ট্রি- এম.সি. গিব (কানাডা)
- স্টাডিজ ইন ইসলাম ইন ইন্ডিয়া বিফর শাহ ওয়ালিউল্লাহ– ফ্রীল্যান্ড এবোল্ট,(প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস)
- দি হিস্ট্রি অব ইরান– এ. জে আরবেরী (লন্ডন)
- কিতাবুল লুমআ– সম্পাদনা : এ.আর নিকলসন (নিউয়র্ক)
- ইনসাইক্লোপেডিয়া অব রিলেজিয়ন এন্ড এথিকস (নিউইয়র্ক)

এ হচ্ছে কয়েকটি মাত্র গ্রন্থের নাম। যা একই লয়ে, একই লক্ষ্যে বহু প্রক্রিয়ায়, বহু শিরোনামে তাসাউফকে চরমভাবে বিকৃত করেছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি অপেক্ষাকৃত উদার নিকলসন থেকে। তিনি তার স্টাডিজ ইন ইসলামিক মিস্টিজমে ইরানের সুফি আবদুল করিম জিলির নাম করে ইবনুল আরাবীর বোধ, প্রভাব ইত্যাদিকে যথেচ্ছ বিকৃত করেন। এমন কি হাত চালিয়েছেন সুফির সংজ্ঞায়ও।

তার বয়ান– "সুফি সেই, যে ফানা হয়ে যায় এবং খোদার সত্তায় জীবিত হয়। এই তাৎপর্যে ফানা হওয়া মানে খোদার সাথে একাকার হওয়া। সারকথা– মুসলিম সুফিতত্ত্বের আসল গন্তব্য– খোদা হয়ে যাওয়া। খোদাতে মিলিত হয়ে যাওয়া।"

ইসলামী জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন– এটা কতো ভয়াল বিকৃতি। গোটা ইসলামের ভীতকেই আঘাত করছে এই বক্তব্য। তাওহীদকে করছে অস্বীকার। শিরিকের সদর দরোজা খুলে দিচ্ছে। কিন্তু কাজটি করা হচ্ছে সুফিবাদের নামে। ফানাকে বিকৃত করে। এ বিকৃতি একান্তই তার উদ্ভাবন। ইসলামী টেক্সট কি ফানার পরিচয় দেয়নি? দিয়েছে। মুজাদ্দিদে আলফে সানীর রহ. স্পষ্ট ভাষ্য– 'ফানা-বাকার অভিজ্ঞতা খোদার সত্তায় অংশী হওয়া নয়। মোটেও নয়। কারণ মোরাকাবার সময়কে সুফি যাপন করেন স্বপ্নের মতো।

তখন নিজেকে হারিয়ে খোদার আলোয় লুপ্তি অনুভব করেন। তা একান্তই স্বপ্নের মতো। বাস্তবে নয় মোটেও। কেননা এতে নেই কোনোই বাস্তবতা। যেমন তুমি স্বপ্ন দেখলে রাজা হয়ে গেছো। এর মানে এই নয় যে তুমি সত্যিই রাজা হয়ে গেছো। তেমনি সুফি দেখে খোদার আলোয় মিশে গেছে। নিজে পরিণত হয়েছে আলোতে। এর মানে সে খোদা হয়নি। মোটেও না। (মকতুবাতে ইমামে রাব্বানী, প্রথম অধ্যায়)

শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর রহ. ভাষ্য– "ফানার অবস্থায় সাধকের বিশেষ অবস্থা লোহার টুকরা আগুনে তপ্ত হবার মতো। আগুনের তাপে লোহা অগ্নিময় হয় হয় প্রচণ্ড মাত্রায়। তাই বলে সে আগুন হয়ে যায় নি। সে লোহাই। কিছুক্ষণ পরে শীতল হয়ে যাবে। সে যদি এই অবস্থায় খোদাতে হারিয়ে যাওয়া অনুভব করে, সেটা ধারণার দর্শন। বাস্তবের ব্যাপার নয়। (হুমআত)

প্রাচ্যবিদরা কিন্তু এ সবের ধার ধারে না। তারা জেনে-বুঝেই ইসলামের বিকৃতি ও ভুল উপস্থাপণে নিয়োজিত। অতএব জিহাদকে তারা পেশ করবে সন্ত্রাস হিসেবে। জিহাদই যেহেতু তাদের সম্রাজ্যবাদী ও ক্রুসেডীয় খায়েশকে বারবার পদাঘাত করেছে, তাই এর বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশ ও ক্রোধ সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। জিহাদকে তারা যেকোনো মূল্যে সন্ত্রাস হিসেবে অভিহিত করতে চায়। বিপজ্জনক ও ধ্বংশাত্মক হিসেবে চিত্রিত করার জন্যে ইসলামের ইতিহাসকে বিকৃত করে। সর্বত্র খুজে বেড়ায় বিকৃত উপলব্ধি। ঘটনার টুকরো, দৃশ্যের খন্ড, উদ্বৃতির অংশ ইত্যাদিকে হাতে নিয়ে শুরু করে হাতিঘোড়া কারবার। একটি ঘটনার প্রেক্ষাপট বলবে না। কার্যকারণ চাপা দেবে, শত্রুদের প্রকৃতি ও ধ্বংশকারীতা আড়াল করবে। মুসলমানদের আত্মরক্ষার্তে গৃহিত পদক্ষেপকে আগ্রাসন বানিয়ে ফেলবে। প্রতিপক্ষের আগ্রাসী ভূমিকাকে দেখাবে নিছক প্রতিক্রিয়া হিসেবে। গোটা যুদ্ধ যে ধ্বংশকারিতা সম্পন্ন করে, কৌশলে তার দায় চাপিয়ে দেবে মুসলমানদের উপর। জিহাদী চেতনাধারী সুলতান ও বীরদের চরিত্র হণন করবে। গগণবিদারী চিৎকারে বলতে থাকবে ইসলাম প্রচারিত হয়েছে শক্তি প্রয়োগে। তরবারির জোরে। জবরদস্তির ফলে। ইসলাম পৃথিবীকে উপহার দিয়েছে চরমপন্থা ও উগ্রবাদ। সকল মুসলমান সন্ত্রাসী নয়, কিন্তু সকল সন্ত্রাসীই মুসলমান। ইত্যকার অজস্র ধাচের প্রোপাগাণ্ডা পরিবেশ দুষণের মাত্রাকে হার মানিয়ে ছড়িয়ে পড়বে। .....

কিন্তু ইতিহাস যখন বলতে শুরু করবে, তাদের মিথ্যার বেলুনগুলো ফুটো হতে থাকবে। ইতিহাস বলবে, দেখো ক্রুসেড এবং প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পশ্চিমারা যত মানুষ হত্যা করেছে, ইসলামের গোটা ইতিহাসে সবগুলো যুদ্ধ মিলিয়ে তার সমান মানুষ নিহত হয়নি। তাহলে কারা সন্ত্রাসী?

ইউরোপে ধর্মের নামে যে সন্ত্রাস পরিচালিত হয়েছে, ধর্মীয় আদালত কায়েম করে ইহুদী ও মুসলমানদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে, সাগরে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়েছে, খ্রিস্টান না হলে সর্বপ্রকার নির্যাতন চালানো হয়েছে, পাদ্রীদের বিরুদ্ধে কথা বললে বিজ্ঞানীদের হত্যা করা হযেছে, এমন কোনো লাঞ্চনার দাগ ইসলামের গায়ে লাগেনি।

মধ্যযুগে ধর্মের নামে এক শো বছরের যুদ্ধ, তিন শো বছরের যুদ্ধ, মিথ্যা রটিয়ে ধর্মান্ধ উস্কানী তৈরী ও অবিরাম চার শো বছর ধরে মুসলিম জাহানের শান্তিকামী মানুষের উপর আগ্রাসন, পাইকারী গণহত্যা, বারবার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, ধর্মের নাম করে যাবতীয় জ্ঞানচর্চা ও বিদ্যালয় নিষিদ্ধ ঘোষণা, ইতিহাসের এসব কলঙ্ক ইউরোপের কামাই, ইসলামের নয়।

গোটা পৃথিবীকে নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নেয়া, নিজেদেরকে আল্লাহর পুত্র আর জগতের অন্য মানুষকে বর্বর মনে করা, অন্যায়ভাবে যে কোন দেশ দখলকে বৈধ মনে করা, অধিবাসীদের উপর উৎপীড়নকে ন্যায্য মনে করা এবং হত্যা, ধ্বংস ও লুটপাটের অভিযানকে সভ্য বানাবার অভিযান আখ্যায়িত করে চূড়ান্ত অমানবিকতার নিদর্শন খ্রিস্ট্রিয় ইউরোপে বিদ্যমান। ইসলামের ইতিহাসে নেই।

গোটা রেড ইন্ডিয়ান জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া, অস্ট্রেলিয়ান আদিবাসীদের হত্যা করে তাদের মাংস কুকুরকে খাওয়ানো, ডাইনী ঘোষণা করে নির্মম নিধন, যুগ যুগ ধরে নরমাংস আহার, নারীদের প্রাণের অস্তিত্ব অস্বীকার- এসব বর্বরতা খ্রিস্টিয় ইউরোপের ইতিহাস, ইসলামের নয়।

স্বাধীন, সভ্য ও উন্নত জাতি সমুহের স্বাধীনতা হরণ, উপনিবেশ স্থাপন, আফ্রিকার কালো মানুষকে দাস বানানো, দুনিয়া জুড়ে দাস ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী, দখলিকৃত দেশসমূহে পৈশাচিক শোষণ, ভাষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি হরণ, হত্যা, জোরপূর্বক ধর্মান্তর, ইত্যাদি অমানবিকতা খ্রিস্টিয় ইউরোপের খাসলত। ইসলামের নয়।

গোটা জাতিকে বাসভূমি থেকে উচ্ছেদ, বর্ণবাদের লালন-পোষণ ও বিস্তৃতি, বিজ্ঞান চর্চার নামে বিশ্ববিধ্বংসী অস্ত্র উৎপাদন ও তার ব্যবহার, সভ্যতার সূতিকাগার পরিবারে ধস নামানো, মানুষের হৃদয়বৃত্তির বিপর্যয় সাধন, নারী স্বাধীনতার নামে নারীদের পণ্য ও যৌনদাসীতে পরিণত করা, অশ্লীলতাকে শিল্প হিসেবে চিত্রিত করণ, এসবই খ্রিস্ট্রিয় ইউরোপের আমলনামা।

ধর্মগ্রন্থের যথেচ্ছ বিকৃতি, বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ধর্মের যুদ্ধ, পাদ্রীদের খেয়াল-খুশি ও স্বার্থের নির্দেশে ধর্মের রূপায়ন, শত শত বছর ধরে গীর্জা কেন্দ্রীক অবাধ

দুর্নীতি ও পাপাচার, ভিন্নধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও হিংস্রতা- এগুলো খ্রিস্টিয় ইউরোপের বৈশিষ্ট, ইসলামের নয়।

ধর্ম ও নৈতিকতা থেকে রাজনীতিকে পৃথক করে তাকে পশুত্বের চারণভূমিতে পরিণত করা, জাতীয়তাবাদের নামে জাতিতে জাতিতে দ্বেষ, শত্রুতা ও ক্ষুদ্রতার বিস্তার, সমাজবাদের নামে অমানবিক শ্রেণি সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যচর্চা, পুঁজিবাদের নামে শোষণ, লুণ্ঠন ও ধনিকপূজা, গণতন্ত্রের নামে মাথাগোণা জাহেলিয়াত ও সংখ্যাগরিষ্টের সন্ত্রাস- এসবই মানবতার প্রতি পাশ্চাত্যের উপহার!!

চরম আত্মকেন্দ্রিকতা ও বস্তুতান্ত্রিকতা, চরম কামদাসত্ব ও প্রবৃত্তিপূজা, চরম ইহজাগতিকতা ও দাম্ভিকতা, চরম চাতুর্থ ও উপযোগবাদ, চরম স্বার্থচিন্তা ও নীতিরহিত মিস্টিকতা- মানবমনের জন্যে এগুলোই পাশ্চাত্যের অনুদান!

একদিকে তারা আবিস্কার করেছে উন্নত যোগাযোগ পদ্ধতি, অসংখ্য যান্ত্রিক হাতিয়ার। অপরদিকে উপহার দিচ্ছে হিরোশিমা-নাগাসাকি। একদিকে পৃথিবীকে নিয়ে এসেছে হাতের মুঠোয়, অপরদিকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করেছে মানুষ থেকে। একদিকে মানুষের স্বাধীনতার তারা উচ্চকণ্ঠ বিঘোষক, অপরদিকে প্রত্যেককে বন্দি করে দিচ্ছে কামনার কারাগারে। একদিকে চন্দ্রজয়ের নামে পেটানো হচ্ছে ঢাক-ঢোল, অপরদিকে আত্মজয়ের সকল পথে তৈরী করেছে পাচিল। একদিকে তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জ্ঞানের আদান-প্রদান হয়েছে সহজতর, অপরদিকে তথ্যের প্রবাহ ও জ্ঞানের ক্ষেত্রগুলোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানবতাহীন সাম্রাজ্যবাদের দখলদারী। একদিকে বৈশ্বিক সংহতি ও পরস্পরের পাশে দাঁড়াবার উদ্যোগ চলমান, অপরদিকে মানুষকে বিপন্ন করার যাবতীয় আয়োজন হচ্ছে সম্পন্ন।

দুর্বল জাতিসমূহের সংহতিকে ভেঙে চুরে তাদেরকে পরিবেশন করা হচ্ছে। শত শত বছর ধরে মুসলমানদের রক্ত পানেই ওদের পুষ্টি নিশ্চিত হচ্ছে। মুসলমানদের বিরুদ্ধে বীভৎসতায় ওদের সামর্থ প্রতিফলিত হচ্ছে। মুসলমানদের সম্পদ লুট, স্বাধীনতা হরণ ও বিনাশ সাধনে ওদের শক্তি নিয়োজিত হচ্ছে। ইসলাম ও ইসলামের ইতিহাসের বিকৃতি সাধনে ওদের বুদ্ধিবৃত্তি নিরন্তর নিয়োজিত। ওদের কর্মকাণ্ড, ইতিহাস, প্রকৃতি,প্রবৃত্তি ইত্যাদি নিয়ে মুসলমানরা যদি গবেষণা করতেন, তাহলে বেরিয়ে আসতো বিপজ্জনক সব চিত্র। বিকশিত হতো জ্ঞানের নতুন শাখা-প্রতীচ্যবাদ। মুসলিম স্কলারদের ভাবতে হতো না শুধু ইস্তেশরাক নিয়ে। বরং একধাপ এগিয়ে 'ইস্তেগরাব' এর নামে চিন্তার নতুন অধ্যয়নকেন্দ্র গড়ে তুলতেন। ইস্তেশরাক মোকাবেলায় এ পদ্ধতি হতো খুবই কার্যকর। বুদ্ধিবৃত্তিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক লড়াই নতুন বাঁক নিতো। তারুণ্যের মধ্যে

হীনমন্যতার পরিবর্তে আত্মবোধ ও জাতীয় সচেতনতা তৈরী হতো। শিক্ষার মাধ্যমসমূহে জেঁকে বসা প্রাচ্যবিদদের চৈন্তিক আধিপত্য চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতো। তারা বিনা প্রশ্নে উদ্বৃত হতেন না। তাদের ভ্রান্তির বাক ও আক্রমণের ছকসমূহ ভূগোলের রেখার মতো স্পষ্ট থাকতো।

কোনো কোনো মুসলিম চিন্তাাবিদ তাদের চৈন্তিক ও তাত্তিক আগ্রাসনকে উপেক্ষার নজরে দেখেন। আশা করেন মুসলিম জীবনে তা বড় অর্থে কোনো পরিবর্তন আনবে না। কিন্তু পরিবর্তন যে হচ্ছে এবং বিপর্যয় যে চারদিকে হুংকার দিচ্ছে, সেটা বুঝতে হলে বালির তল থেকে উটপাখির মাথাকে বাইরে নিয়ে আসতে হবে। আজ মুসলিম জাহানে ইসলাম যে সব মহল থেকে প্রশ্নবিদ্ধ, আক্রান্ত ও উপেক্ষিত হচ্ছে, সে সব মহল প্রাচ্যবিদদের চিন্তার ফেরিওয়ালা। ইসলামের উপর আপত্তি তুলার জন্যে তাদেরকে ভাবতে হয় না, গবেষণা করতে হয় না। তাদের ভাবনাসীমানয় যা আসে না, সেসব বিষয়েও প্রাচ্যবিদরা শত প্রক্রিয়ায় গবেষণাকর্ম সেরে রেখেছে। তাদের এতো দিনের যোগানো বারুদ মুসলিম নামধারী একটি শ্রেণির চিন্তার গোলাঘর দখল করেছে। সেখান থেকে যে সব আওয়াজ উচ্চরিত হচ্ছে, তা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহের প্রতি চ্যালেঞ্জের নামান্তর।

এই শ্রেণির চিন্তায় জ্ঞানতাত্তিক যে সব খানাখন্দ তৈরী হয়েছে, তা ভরাট করার কাজ সম্পন্ন হয়নি দীর্ঘদিন। সেখানে ফাটল দেখা দিয়েছে। ফাটলে জায়গা করে নিয়েছে হিংস্র শ্বাপদ। তাদের অনেকের জ্ঞানপিপাসা স্বচ্ছ ও শীতল পানির তালাশে কাতর হলেও কোনো বিশ্বস্ত হাত ইসলামের পেয়ালায় তাদের সামনে তা উপস্থাপন করছে না কিংবা উপস্থাপিত হলেও যথাযত পরিমাণে হচ্ছে না, আরো পিপাসা রয়ে যাচ্ছে, আরো শূণ্যতা রয়ে যাচ্ছে।

আবার ইসলামী চেতনারাজ্যের একটি আবেগী ও হঠকারী ধারা তাদেরকে বারবার ঠেলে দিচ্ছে দূরে, আরো দূরে। অপরিণামদর্শী তৎপরতা তাদের কাছে ইসলামকে হাজির করছে সেই অবয়বে, যে অবয়ব তারা দেখেছে প্রাচ্যবিদদের রচনায়। ফলে ওদের দাবি কার্যক্ষেত্রে দলীল পেয়ে যাচ্ছে। শিক্ষিত, উচ্চচিন্তার একটি জ্ঞানতাত্তিক অংশ ইসলামের সীমানার বাইরে ডেরা গড়েছে। সৃজনশীলতা, গণসংযোগ ও চিন্তানৈতিক মাধ্যমসমূহ তাদের হাতে থাকায় তাদের ভাবনা ও বক্তব্য অষ্টপ্রহরে নিনাদিত হচ্ছে। প্রতিমুহূর্তের বাস্তবতাকে প্রভাবিত করছে। মুসলিম দেশসমূহের শাসকশ্রেণী ও প্রভাবশালী মহল ওদেরই প্রভাব বলয়ের বাসিন্দা। ফলে মুসলিম জীবনের 'ইসলামী সীমানা' চতুর্দিক থেকে শত্রুকবলিত হয়ে পড়েছে। এর প্রহরীরা বাস্তবতাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে

বাস্তবভাবে বিচার করে না। "চিকিৎসকরা" আজকের অসুখ গতকালের অসুখ নয় জেনেও দাওয়াই দেন সেটাই, যা গতকালও অসফল প্রমাণিত হয়েছে। নিজেদের এই ব্যর্থতার দায় তারা পুরোটাই চাপিয়ে দেন রোগীর উপর। ফলে রোগী তার প্রতি আস্থা তো পোষণ করেই না, বরং নিজের সুস্থতার শত্রু হিসেবে তাকে ভাবতে থাকে। চিকিৎসক নিজের অকার্যকর দাওয়াইকে উপস্থাপন করেন ইসলাম হিসেবে। শত্রুরাও এটাই চায়। তারা তাদের ব্যর্থতাকে ইসলামের ব্যর্থতা বলে চিত্রিত করে। অসুখী অংশটিকে "উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলিম জনগোষ্ঠি" হিসেবে অভিহিত করে। উভয়ের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছিন্নতার রেখা টেনে দেয়। ইসলামকে হাজির করে এ শ্রেণির চাহিদার মোকাবেলায় দুর্বল হিসেবে।

উইলিয়াম পোকের বক্তব্য এক্ষেত্রে ভালো দৃষ্টান্ত। তিনি লিখেন– "ইসলামের মূল দুর্বলতা হলো উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলিম জনগোষ্ঠির সঙ্গে ইসলামের বিচ্ছিন্নতা।" (ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব মিডিল ইস্ট স্টাডিজ, এপ্রিল, ১৯৭৫)

প্রাচ্যবিদরা এ শ্রেণিকে উস্কে দিতে চান। সুন্নাহকে 'প্রাচীণ রক্ষণশীল কাঠামো' হিসেবে দেখাতে চান। দ্বীনের উসুলসমূহকে 'মুসলিম যাজকদের ভাবনাভিত্তিক ধর্মজ্ঞান' বলে অভিহিত করেন। মুসলিমদের সামাজিক দুঃখবোধের জন্যে দায়ী করেন উভয়কে। হ্যামিল্টন গিবের ভাষায়– "এখানেই আছে এর সবচেয়ে শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান অনুসারীদের অসন্তুষ্টির কারণ। এবং ভবিষ্যত বিপদের বিষয়টিও অত্যন্ত পরিষ্কার। কোনো ধর্ম শেষ পর্যন্ত ভাঙন রোধ করতে পারে না। যদি অনুসারীদের ইচ্ছার উপর এর দাবি এবং বুদ্ধির উপর এর আবেদনে বিশাল ব্যবধান অব্যাহত থাকে।"

"মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত এখনো আধুনিকতাবাদীদের পরামর্শ অনুযায়ী দ্রুত সংস্কারের পদক্ষেপ নেয়ার পক্ষে নয়। কিন্তু আধুনিকতার বিস্তৃতি একটি সতর্ক সংকেত যে, সংস্কার অনির্দিষ্টকালের জন্যে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না।" (স্টাডিজ ইন দি সেভিলাইজেশন অব ইসলাম : স্যার হেমিল্টন গিব)

ভালোই করেছেন হ্যামিল্টন গিব। নিজেদের কাজের ধরণ ও লক্ষ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এবার আমাদেরকে নিজেদের দায়িত্ব ও কাজ বুঝে নিতে হবে। #

ইসলামের ইতিহাস ও বিকৃতির দন্ত-নখর

আজকের বিশ্ব, আজকের সভ্যতা কিংবা আজকের সংকটের সুতায় ধরে টান দিলে অনিবার্যভাবে এর ভিত্তিমূল গ্রথিত আছে যে মাটিতে, সেখানে টান পড়বে। বলাবাহুল্য এই মাটিরই ডাক নাম হচ্ছে ইতিহাস। অতএব আজকের যা বিশ্ব সংকট, তা মূলত অতীত থেকে চলে আসা ঘটনাচক্রের পরবর্তী পর্যায়। প্রতিটি ঘটনা যেহেতু আরেকটি ঘটনার মা হতে চায় এবং প্রতিটি ক্রিয়াই যেহেতু কুস্তির জন্যে আরেকটি প্রতিক্রিয়ার দিকে দৌড়ায়, তাই অতীতের ঘটনাচক্রের সাথে তার ঔরষজাত হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান সংকটের রূপ ও ধরনের ভিন্নতা থাকাটা একান্ত স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে ঘটক-অনুঘটকের ভিন্নতা স্থান পাত্র এমনকি সংকটের ভরক্ষেন্দ্রের উদল-বদল বৃষ্টির স্থান বদলের মতো। যা সর্বত্রই এক, কী উৎপত্তিস্থলের ক্ষেত্রে, কী ফোটা ফোটা বর্ষণের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ যে কোন সংকট, তা বৈশ্বিক হোক বা আঞ্চলিক, পরিবেশগত হোক বা প্রতিবেশগত, বর্ণভিত্তিক

হোক বা ধর্মভিত্তিক-তার অতীত ভিত্তিমূল না থেকেই পারে না। এর পাশাপাশি মানুষ যেহেতু স্বভাবগতভাবেই প্রতিশোধপরায়ন এবং জাত্যাভিমানী, তাই কৈশোরে প্রতিবেশির বাড়ীতে দুষ্টুমী করতে গিয়ে কানমলা খাওয়ার বদলা যেমন সে নিতে চায়, তেমনি তার বাপ-দাদা কার হাতে মার খেয়েছিল, এর একটা শক্ত প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে সে সাধ্য-সমস্ত কুশেশ অব্যাহত রাখে। এই ব্যাপারটা যুগপথভাবে আদিম ও আধুনিক। অর্থাৎ মানুষের যখন অক্ষরজ্ঞান ছিলো না, উন্নত ঘরবাড়ী ছিলো না, তখনো এই ব্যাপারটা ছিলো। এবং এখনও যতই আধুনিক হচ্ছি, এই ব্যাপারটি হাজির হচ্ছে নতুন নতুন অবয়বে। নবতর প্রক্রিয়ায়। যন্ত্রবিশ্বের অভিনব উৎকর্ষের সাথে পাল্লা দিয়ে।

এখন যেখানে এসে এটা দাঁড়িয়েছে, তা যন্ত্রভিত্তিক বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের মতোই শীর্ষস্থানের অধিকারী, অন্য য কোন সময়ের চেয়ে। কিন্তু এই শীর্ষস্থানে দাঁড়িয়ে থাকার গূঢ় অর্থ ঠের পাওয়া যত সহজ, সরলভাবে এর বয়ান উপস্থাপন অত সহজ নয়। কেননা বর্তমানে ব্যাপারটার সাথে বহুবিধ অনুষঙ্গ এসে জুড়িয়েছে। আহামরি ও ওজনধারী অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার কাজে সাঙ্গ করার ক্ষেত্রে। সর্বোপরি ব্যাপারটার উপর ভর করেছে বর্ণবাদী রাজনীতি ও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের কুঠিল চক্র। যার ফলে কোনো জাতি, ধর্ম কিংবা গোষ্ঠীর ইতিহাসের ধারাপরিক্রমায় রাজনৈতিক স্বার্থ ও স্বার্থ প্রত্যাশী শক্তি বা রাষ্ট্রের বৈশ্বিক ভিউ এসে মিলিত হয়ে ইতিহাসকে নিজের নিয়ন্ত্রণ ও পছন্দ মতো করে নেয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্যনীয়।

এর একটা নজির আমরা লক্ষ্য করতে পাারি আফ্রিকার ইতিহাসের ক্ষেত্রে। সেখানকার জনপদগুলোকে আবর্জনার স্তুপ এবং অধিবাসীদের অমানুষ হিসেবে চিত্রিত করার ক্ষেত্রে উপনিবেশিক বুদ্ধিজীবিদের উৎসাহ এবং প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে পরিদৃষ্ট হয়েছে। আধূনা আফ্রিকান বুদ্ধিবৃত্তির পূরোধা ব্যক্তিত্ব চিনু আচেবে তার 'হোম এক্সাইল' গ্রন্থে এ বিষয়ক তথ্যাবলি উপস্থাপন করেছেন এবং বিস্তর আলোচনা করেছেন। মোটা দাগে যে কথাটা তার পর্যালোচনা থেকে বেরিয়ে আসে, তা হচ্ছে ইতিহাস বিকৃতির পেছনে সক্রিয় আছে নির্জলা এক স্বার্থবোধ। সেটা যুগপথভাবে বাণিজ্যিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় স্বার্থ। স্বাংস্কতিক ও ধর্মীয় স্বার্থ আফ্রিকার ক্ষেত্রে মৌলিক ছিলো না, মৌলিক ছিলো দাস ব্যবসার ক্ষেত্রকে বিস্তৃতকরণ ও তার স্থায়িত্ব নিশ্চিতকরণ। দেখা গেলো এই বিকৃতির ফলে আফ্রিকায় এমন সব বুদ্ধিজীবিও মাথা বের করলেন, যারা আফ্রিকানদের এই মন্ত্রণা শুনাতেন যে, পশ্চিমাদের দাস হওয়াটাই আমাদের জন্যে অনেক কিছু। অমানুষ থেকে এতে করে তো তাদের স্পর্শ পেয়ে মানুষ হতে পারবো।

আফ্রিকার ইতিহাস সংক্রান্ত প্রচুর গবেষণা হয়েছে। চারশো বছর ধরে আফ্রিকা বিষয়ে লিখিত পাঁচ শতাধিক গ্রন্থ ঘাটাঘাটি করে দুজন গবেষক দেখতে চেয়েছেন এসব বইয়ে সেখানকার ইতিহাসকে কীভাবে চিত্রিত করা হয়েছে। তারা তাদের গবেষণার সারবস্তু তুলে ধরেছেন 'দ্য আফ্রিকান দ্যাট নেভার ওয়েজ' গ্রন্থে। এতে দেখা গেলো আফ্রিকা বিষয়ে লেখকদের প্রাথমিক রচনাবলি ছিলো নির্দোষ মুসাফিরের চোখে দেখা সরল আফ্রিকা। তারপর একটা বিশেষ সময় থেকে এগুলো হয়ে উঠতে লাগলো ভয়াবহ। এক প্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তারা আফ্রিকানদের এমনভাবে চিত্রিত করতে লাগলো যে ওরা মানব নয়, দানব বা ওই জাতীয় কিছু। বলাবাহুল্য এই বিশেষ সময়টা ছিলো ইংল্যান্ডে দাস ব্যবসার যৌবনকাল। অতএব হিসাব মেলাতে অসুবিধা নেই যে আফ্রিকার জনগণ, সমাজ-সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপনের উদ্দেশ্য ছিলো উপনিবেশিক বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তির জন্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্র তৈরি ও দাসব্যবসার পুষ্টি যোগানো।

দাসব্যবসা এখন নেই, কিন্তু স্বার্থের ব্যাপারটা রয়ে গেছে। বর্তমান বিশ্বে এ স্বার্থের হিসাব-নিকাশই তৃতীয় বিশ্বের উৎপীড়িত জনতাকে শক্তিমানদের রোষের মুখে অসহায় মেষশাবকের মতো নিক্ষেপ করছে। এই প্রেক্ষাপট রচনার ক্ষেত্রে বিকৃত ইতিহাসের ভূমিকা অবশ্যই মোটা দাগে চিহ্নিত করা যায়। এক্ষেত্রে বিপজ্জনক ব্যাপার হলো বিশ্বসংকটের মূল জায়গাটায় বিকৃত ইতিহাসের বারুদ এতোটাই গভীরভাবে সংযুক্ত যে এক থেকে আরেককে পৃথক করার চেষ্টা পণ্ডশ্রম হতে বাধ্য।

কান ধরে টান দিলে যেভাবে মাথা চলে আসে, তেমনি আজকের শক্তিমানদের বিকৃত আচরণ নিয়ে কথা বলতে গেলে অনিবার্যভাবে চলে আসে তাদেরই নিযুক্ত লোক ও পূর্বসূরীদের হাত দিয়ে বিকৃত হওয়া ইতিহাস ও এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বলতে ইসলাম ও খ্রিস্টবিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, এর প্রকৃতি ও আজকের সংঘাতপূর্ণ বাস্তবতা। আজকের বিশ্বে ইসলাম মানেই খ্রিস্টবিশ্বের জন্যে বিপদ, এরকম একটা মিথ্যাকে খুবই চাউর করা হয়েছে। আফ্রিকার ক্ষেত্রে যেটা লক্ষ্য করা যেতো, সেখানকার জীবন ও জনগণকে অমানুষিক পর্যায়ে উপস্থাপন করা, তার চেয়ে আরেকটু অগ্রসর হয়ে এখন ইসলাম মানেই বর্বরতা এবং মুসলমান মাত্রই হিংস্র হিসেবে তাদের কলমে চিত্রিত হচ্ছে।

এর ফলে ইতোমধ্যেই পাশ্চত্যে ভয়ানকভাবে ইসলাম ফোবিয়া সৃষ্টি হয়েছে এবং মানববিশ্বের দু'টি অংশকে পরস্পরের বিরুদ্ধে ভীতিজনকভাবে লেলিয়ে

দেয়া হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা বহুবিধ বিপদের কারণ হিসেবে মাথা উত্তোলন করলেও এটা মূলত হাজার বছর ধরে পাশ্চাত্যের ব্যাপক অংশে বদ্ধমূল কুসংস্কারের মতো বিরাজ করে আসছে। ঐতিহাসিক উইলফ্রেড কন্টিওয়েল স্মিথ তার বিশ্ববিখ্যাত 'ইসলাম ইন মর্ডান হিস্ট্রি' গ্রন্থে বিষয়টার উল্লেখে লিখেছেন- "ইতিহাসের গতিধারা এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে, যাতে গোড়া থেকেই পাশ্চত্যের সাথে অন্যান্য সভ্যতার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ইসলামের সাথে। তেরশো বছর যাবত ইউরোপ ইসলামকে প্রায়ই তার একটা প্রবল শত্রু ও ভীতি হিসেবে দেখেছে। তাই এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মীয় নেতার তুলনায় পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ সা. খুবই নিম্নস্তরে স্থান পেয়েছেন এবং পৃথিবীর সবধর্মের মধ্যে ইসলামের মর্মোপলব্ধি পাশ্চত্যে সব চইতে কম।"

এই যে ইসলাম প্রবল শত্রু হিসেবে দেখা, ইসলামের নবীকে নিম্নস্তরে স্থান দেয়া, ইউলফ্রেড সাহেব তো সহজ করে কথাটা বলে ফেলেছেন, কিন্তু এই শত্রু হিসেবে দেখাটা ইউরোপে কী ভয়ানক বিকৃত ভাবধারা সৃষ্টি করেছে এবং এর পিছনে কতো বিপজ্জনক ও মিথ্যা রটনার ইন্ধন রয়েছে, সেটা সাধারণভাবে ঠের পাওয়া রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। ঠের অবশ্য কেউ কেউ পেয়েছিলেন। যারা পেয়েছিলেন, তারা বিস্ময় আর আশ্চর্যের ঘোরে এমনও মূল্যায়ন করেছেন যে হিরোশিমা নাগাসাকির ধ্বংসলীলার চেয়েও বড় নৃশংসতা ইতিহাসের উপর দিয়ে বয়ে গেছে। বলাবাহুল্য সেটা বিকৃতি আর মিথ্যার নৃশংসতা।

এই নৃশংসতা উপলব্ধি করে থাকবেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যক্ষ জনাব আবুল কাশেম আবদুল শহীদ। ১৯৫৪ সালে ম্যানচেস্টারের অদূরবর্তী বোস্টন শহরে শিক্ষারত থাকাকালে বিলাতের এক লাইব্রেরীতে এ রকম এক মিথ্যাচারের নমুনা দেখতে হয় তাকে। তিনি এক খৃস্টান ঐতিহাসিকের লেখা বই পড়ছিলেন, যাতে ইসলাম সম্পর্কে এই উপসংহার টানা হয়েছিলো যে, 'হযরত মুহাম্মদ সা. আরবের এক বিকৃত মস্তিস্ক উচ্চাভিলাসী লোক ছিলেন। তিনি মুর্খ লোকদের মধ্যে প্রচার করেন আজব ধর্মটি। যে কেউ মিসরে গিয়ে তার নমুনা দেখে আসতে পারো। মহামেডানগণ কানে হাত দিয়ে বিড়বিড় করে চেচায়, এটাই তাদের ধর্মানুষ্ঠান। সাবধান! এ রকম লোকের ধাপ্পাবাজী থেকেক দূরত্ব বজায় রেখো।'

জনাব আবদুশ শহীদ আর কী করবেন? প্রকাশকের কাছে পত্র মারফত প্রতিবাদ জানালেন।তিনি জানতেন না এ রকম প্রচারণা ইউরোপে একান্তই স্বাভাবিক। সংঘবদ্ধ একটি গোষ্ঠীর মাধ্যমে চর্চিত হয়ে আসছে শতাব্দীর পর

শতাব্দী। চিঠি লিখে ভাবছিলেন প্রকাশক ভুল স্বীকার করবেন। সত্যের প্রতি বিশ্বস্ত হতে চাইবেন। কিন্তু তিনি অবাক হলেন, যখন প্রকাশকের চিঠি পেলেন। যাতে ঐতিহাসিক গ্রন্থের লম্বা এক ফর্দ উল্লেখিত হয়েছে এবং প্রকাশক দৃঢ়তার সাথে লিখেছেন যে উক্ত পুস্তকে বর্ণিত কথাগুলো এই সকল ইতিহাস গ্রন্থের সারসংক্ষেপ মাত্র। গ্রন্থকার বা প্রকাশকের কোনো দোষই এতে নেই।

দোষ অবশ্য থাকার কথা নয়। কারণ বিদ্যালয়ে যখন শিশুদের সামনে এমনতরো তথ্য পরিবেশিত হয়, এদের মধ্য থেকে কেউ যদি বড় হয়ে দশ টন মিথ্যা সম্বলিত একটা ইতিহাসের বই লিখে বসে, তার দোষ হবে কেন? এ ছাড়া তার পিছনে আছে ইতিহাসের নামে মিথ্যাচারের অজস্র দৃষ্টান্ত এবং প্রলুব্ধকারী বাস্তবতা।

এই প্রলুব্ধকারী বাস্তবতার জ্বরে আক্রান্ত হোয়াইট হাউসের বড় কর্তা থেকে শুরু করে গ্রীক সাইপ্রাসের স্কুল ছাত্রটি পর্যন্ত। জ্বরটা ছড়ানো হয় বহুভাবে। কখনো সুক্ষ্মভাবে, কখনো একেবারে স্থুল, কদাকার প্রক্রিয়ায়। এই জ্বরে যারা আক্রান্ত হয়, তাদের মানসিকতা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, সেটা বিচার করবেন আপনিই। আমি শুধু জ্বরের মাত্রাটা আঁচ করার জন্যে কতিপয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরবো।

বিগত শতকের সত্তর দশকে গ্রীক সাইপ্রাসের খণ্ডকালীন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন ড. ফ্রিক্সোজ প্রেড্রিক। তিনি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বাচ্চাদের নিয়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতেন।

একটা অনুষ্ঠানে তিনি প্রশ্ন করলেন– বলতো যিশুকে হত্যা করেছে কারা?

বাচ্চাদের উত্তর– তুর্কীগণ (তথা মুসলমানরা)

প্রেড্রিক হাসতে হাসতে বললেন, না, ঠিক বলোনি। যিশুকে হত্যা তুর্কীরা করেনি। কিন্তু এরা আমাদের জাতীয় শত্রু। তোমরা তাদেরকে চিনতে পেরেছো। এজন্যে আমি তোমাদেরকে পূর্ণ নম্বার দেবো।

অতঃপর তিনি প্রশ্ন করলেন– যখন তোমরা বড় হবে, তখন তোমার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ কিভাবে নেবে?

একজন ছাত্র লাফিয়ে উঠলো– 'একডজন তুর্কীর খণ্ডিত মস্তক আপনাকে আমি এনে দেবো।' সে উত্তর দিলো।

'ইয়াননি! তুমি আমাকে কী এনে দেবে?– পেড্রিকের প্রশ্ন।

ইয়াননি দাঁড়লো। তার চোখে একরাশ ঘৃণা। 'আমি একশত তুর্কীর খণ্ডিত মস্তক নিয়ে আসবো। তারপর সেগুলো আগুন দিয়ে পুড়াবো।

এবার তিনি প্রশ্ন করলেন– 'থিয়োডিরো! তুমি কী আনবে?

বালকটি দাঁড়ালো। তার চেহারায় ছিলো ক্রোধের চিহ্ন। বললো– আমি আপনার কাছে কোন তুর্কীর খণ্ডিত মস্তক আনবো না। কেননা তারা অতি ঘৃণ্য। আমি আমার পিতার উপদেশ অনুযায়ী তাদেরকে এদেশ থেকে একেবারে তাড়িয়ে দেবো। (সূত্র– ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, মুসলিম বিশ্বসংখ্যা)

এই যে হত্যার উসকানি আর ঘৃণার প্রচার, এক্ষেত্রে মি. ফ্রিক্সেজকে উগ্রচণ্ড রাজনীতিক জ্ঞান করে বিচ্ছিন্ন সাব্যস্থ করার কোন কারণই নেই। বরং তিনি সেই উত্তরাধিকারের যথার্থ ধারক, যাকে এড়িয়ে গেলে ইউরোপীয় প্রাচ্যদর্শনের ঐতিহ্য থেকেই তাকে বিচ্ছিন্ন হতে হতো। সেই উত্তরাধিকারের বয়ান পেশ করেছেন লিউপোল্ড উইস (পরবর্তীতে মুহম্মদ আসাদ)।

তিনি তার 'ইসলাম এট দি ক্রস রোড' গ্রন্থে লিখেছেন 'প্রাচ্যবিদদের ইসলাম বিদ্বেষ মূলত একটি মৌরসী স্বভাব এবং প্রকৃতিগত অভ্যাস। ক্রুসেডের যুদ্ধসমূহের ফলে এ প্রভাব পাশ্চাত্যবাসীদের মন-মগজে বদ্ধমূল হয়ে গেছে।'

এই প্রকৃতিগত অভ্যাস কতটা বিকৃতভাবে ইতিহাসের নামে প্রকাশিত হয়েছে, তার অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে আছে প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবিদের লেখাজোখায়। এদের মধ্যে বিস্ময়করভাবে এমন সব ব্যক্তির উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়, যাদেরকে ঐতিহাসিক হিসেবে আধুনিক পৃথিবীতে উচ্চতর মূল্য দেয়া হয়।

দৃষ্টান্ত হিসেবে স্যার উইলিয়াম ম্যুরের উল্লেখ করা যায়। ১৮৫৭ সালে তার 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' যখন প্রকাশিত হয়, ইউরোপে সাড়া পড়ে যায়। তিনি সেই গ্রন্থে হযরত মুহাম্মদ সা. সম্পর্কে এমন সব অলীক কথাবার্তা লিখেন, বিদ্বেষে অন্ধ না হলে যা লেখা সম্ভব নয়। তিনি লিখেন হযরত মুহাম্মদ সা. প্রতিরাত্রে ঘুমাবার আগে মূর্তি পূজা করতেন। তিনি নাকি তার এক ক্রীতদাসের কাছ থেকে ধর্ম শিক্ষা করতেন। হযরত মুহাম্মদ সা. তায়েফ কেন গিয়েছিলেন এ বিষয়ে উইলিয়াম ম্যুর লেখেন– মক্কাবাসীকে কীভাবে আক্রমণ করা যায় এবং সন্ত্রাস সৃষ্টি করা যায়, এ বিষয়ক ষড়যন্ত্র পাকাবার জন্যে তায়েফ সফর করেছিলেন। ইসলামে শুকর মাংস কেন নিষিদ্ধ, এ বিষয়ে উইলিয়াম ম্যুরের উর্বর মস্তিস্ক মিথ্যাচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি লিখেন– 'একদিন মুহাম্মদ নিজ বুযুর্গী দেখাবার জন্যে কয়েকটি জলপাত্র ভূগর্ভে লুকিয়ে রাখেন। হঠাৎ একদল শুকর মাটি খুড়ে সেগুলো বের করে দিলে মুহাম্মদ সা. রাগে অন্ধ হয়ে শুকর মাংস নিষিদ্ধ করেন (নাউযুবিল্লাহ)

আশ্চর্য! এতোসব নির্জলা মিথ্যে ইউরোপীয়দের কাছে বরেণ্য একজন ঐতিহাসিক লিখে প্রচার করলেন। অথচ ইতিহাস জানা অজস্র বুদ্ধিজীবি সেটা পড়লেন, কেউই এইসব ইদ্ভট কাহিনীর প্রতিবাদে সংবাদপত্রে একটি চিঠিও লেখলেন না। উল্টো দেখা গেলো পত্র-পত্রিকায় গ্রন্থটাকে নিয়ে ব্যাপকভাবে ঢাল-ঢোল পিটানো হলো।

কিন্তু মিথ্যা এক সময় প্রতিরোধের শিকার হয়। মুসলিম চিন্তাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৭১ সালে লাইফ ওফ মুহাম্মদ সা. নামে শক্ত এক জবাবী গ্রন্থ লিখেন। তিনি প্রমাণ করেন উইলিয়াম ম্যুরের অভিযোগগুলো উদ্ভট, ভিত্তিহীন ও প্রলাপ ছাড়া কিছুই না। ১৮৭১ থেকে ১৮৭৬ সাল অবধি ম্যুর সাহেব চেষ্টা করেন প্রমাণ্য ইতিহাস থেকে তার বক্তব্যের কোনো সমর্থন পাওয়া যায় কী না? কিন্তু ব্যর্থতাই ছিলো তার জন্যে অবধারিত। ১৮৭৭ সালে তিনি তার গ্রন্থটাকে সংশোধন করে নিলেন।

কিন্তু সংশোধন যারা করেননি, তাদের মিথ্যাচার এখনো চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এবং তাদের আওলাদ-উত্তরসূরীর সংখ্যা বানের পানির মতো বেড়ে চলছে। এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ পূর্বসূরীদের থেকে কয়েক ডিগ্রি অগ্রসর। হোক বিদ্বেষের প্রচারে, হোক মিথ্যার জাল বুননে। তাদের অনেকেই টমাস কুডকে হার মানাতে প্রয়াসী, যিনি তার হিষ্ট্রি অফ চার্লস দি গ্রেট গ্রন্থে লিখেছেন - 'আরবগণ মুহাম্মদ নামক এক পুতুল প্রতিমার পূজা করতো। মুহাম্মদ সা. নিজের জীবনে স্বহস্তে এই পুতুলটি নির্মাণ করেন। একে অভঙ্গুর করার জন্যে এক বিশপের সাহায্যে ও যাদুমন্ত্রের দ্বারা এর মধ্যে ভয়ঙ্কর রকমের এক শক্তি প্রবিষ্ট করে দেন যেন পুতুলটি খ্রিস্টানদের প্রতি আশ্চর্য রকমের হিংসা ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ করে। সাহস করে কোনো খ্রিস্টান এর নিকটে যেতে চাইলে গুরুতর বিপদের সম্মুখীন হতো। এমনকি কোনো পাখিও এর উপর দিয়ে উড়ে যেতে চাইলে আহত অবস্থায় ভূপাতিত হতো এবং সঙ্গে সঙ্গে মারা যেতো।'

নিশ্চিতভাবেই লেখক এটা জেনে থাকবেন যে ইসলামে মূর্তি পূঁজা হারাম। এ থেকে আত্মরক্ষাই মুসলমান হিসেবে গণ্য হবার পূর্বশর্ত। আরব থেকে শুধু নয় বরং মূর্তিপূজা, মানবতাকে উদ্ধার করা ছিলো হুজুর (সা.) এর প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু তারপরও লেখক এ কাহিনী ফাঁদলেন, এর কারণ বিদ্বেষ ও শত্রুতা ছাড়া কী-ই বা হতে পারে?

দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হলো পরবর্তী ঐতিহাসিকদের অনেকেই এই জাতীয় মিথ্যাচারকে প্রমাণিত করতে কুশেশ চালালেন। ওর্ডারিক ভাইটালসের মতো

বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক তার 'ইংলিশ হিস্টোরি' গ্রন্থে মুসলমানদের মধ্যে প্রতিমা পূজা আবিষ্কার করেন। তার বক্তব্য হলো– 'ফিলিস্তিনের স্ত্রীলোকেরা তাদের ভাগবান মুহাম্মদ এর কাছে প্রার্থনা করলো– সকল প্রশংসা আমাদের ইশ্বর মুহাম্মদ এর জন্য। দয়াময় তিনি। আনন্দ ধ্বনি করো। তার উদ্দেশ্যে বলিদান করো। তবেই আমাদের ভীষণ শত্রুদল দমিত ও বিনাশপ্রাপ্ত হবে।'

ভাইটালস ধরে নিয়েছিলেন তার বক্তব্য ইউরোপ-আমেরিকায় সানন্দে গৃহিত হবে। হলোই তাই। গৃহিত হলো কুরআন সম্পর্কে উদ্ভট বক্তব্যও। সবাই জানেন মুশরিক আরবদেরও সামর্থ হয়নি কুরআনের শুদ্ধতা দিয়ে চ্যালেঞ্জের। কোরআনই বরং তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করেছিলো কোরআনের শুদ্ধতার সমকক্ষ হবার জন্যে। অথচ কে-না জানে, সেই সময়ে আরবরা ছিলো কবিত্ব, অলংকার ভাষা শাস্ত্রীয় পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর উৎকর্ষের অধিকারী। এটা স্বতঃসিদ্ধ বিষয় এবং কায়িন রবিনের মতো ইউরোপীয় পণ্ডিতের তো আরো ভালোভাবেই জানার কথা। যে কায়িন ইসলামের ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করবেন বলে আরবি ভাষা শিক্ষা করলেন এবং বুৎপত্তি অর্জন করলেন। কিন্তু সেই কায়িন আল লুগাতুল কাদিমা ফিল গারাবিল বিলাদ' গ্রন্থ লিখলেন 'কোরআন মাজীদে শব্দগত ও ব্যাকরণগত বহু ভুল রয়ে গেছে।' ভুলগুলো কী যদিও তিনি উল্লেখ করেননি এবং তার পূর্বেও কেউ এটা করতে সক্ষম হননি। কিন্তু কায়িন এর পরের লাইনে লিখলেন– 'মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে এই ভুলের সংশোধন করতে থাকে। তারপর এখনও ভুল রয়ে গেছে।' (নাউযুবিল্লাহ)

এতো গেলো একটা দিক। কিন্তু তারচেও বিপজ্জনক ব্যাপার ঘটে যখন ইসলামী জীবনাদর্শের সত্যতা আক্রান্ত হয়। গোল্ডযিহার সাহেব ইসলামী জীবনাদর্শের খোদাপ্রদত্ত হওয়াকে তো বটেই, এমনকি এর মৌলিকত্বকেও আক্রমণ করলেন। তিনি আরবি ভাষা শিখে বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ লিখেন। আল আকীদাতুশ শরীয়া ফিল ইসলাম গ্রন্থে তিনি বয়ান উদগীরণ করেন– 'মানবজাতি সম্পর্কে ইসলামের পেশকৃত অধিবিদ্যা নতুন কিছু নয়। কেননা ইসলামের শিক্ষা ব্যবস্থা হেলেনীয় চিন্তা-দর্শনের উন্নত রূপ। এর আইন ব্যবস্থা রোমান আইন প্রসূত। এর রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইরানের রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত এবং এর তাসাউফের উপর রয়েছে বেদান্ত দর্শন এবং নিউপ্লেটো দর্শনের ছাপ।'

প্রচারণাটা যদিও কল্পনাপ্রসূত, কিন্তু তা বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্যে খুবই কার্যকর। পাশ্চাত্যের বহু বুদ্ধিজীবি এ রকম প্রচারণার মাধ্যমে ময়দান উত্তপ্ত করে তুলছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মুহাম্মদ কুতুব ইসলাম দি মিসনডার্স্ট

রিলিজিওন গ্রন্থে এ জাতীয় প্রচারণাকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং প্রতিটি বিভ্রান্তির খোলস উন্মোচন করে এর অসার ও কদাকার চিত্র তুলে ধরেন।

আশ্চর্য! এর পরপরই ইউরোপে কিছু কণ্ঠস্বর জেগে উঠলো, যা স্পষ্ট উচ্চারণে সত্যের স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছিলো। বিশ্ববাসী শুনলো ইসলামের শিক্ষা ও জীবনদর্শন কোরআন থেকে উৎসারিত বলে এমন জায়গা থেকে আওয়াজ উঠেছে, যেখানে ইতোপূর্বে ইসলামের মৌলিকত্ব নিয়ে সংশয় ছড়ানো হয়েছিল। বলিষ্ঠভাবে ইসলামের খাঁটিত্ব ও অকৃত্রিমতাকে প্রমাণ করছেন এমন সব লোক, সংশয়বাদীদের চেয়ে পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞানে যারা কোনো অংশেই কম নন। এদের মধ্যে প্রফেসর জার্মেনাস, ডক্টর জনসন, প্রফেসর এল.ভি ভিজিলিয়োন উল্লেখযোগ্য। তারা ইসলামী শিক্ষা, ইসলামী আইন, ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও ইসলামী আধ্যাত্মব্যবস্থার ঐশী উৎস সম্পর্কে দৃঢ়তার সাথে স্বাক্ষী প্রদান করেছেন।

প্রফেসর এল.ভি ভিজিলিয়ান এ সম্পর্কে বলেন– 'কোরআন, যা না মুহাম্মদ সা. এর নিজের রচনা। ... তাতে আমরা পেয়েছি জ্ঞানের বিপুল সম্ভার। যা সবচেয়ে বুদ্ধিমান লোকদের, সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের এবং দক্ষতম রাজনীতিকদের সামর্থ বহির্ভূত।' কোরআনী জ্ঞানের উৎস সম্পর্কে তিনি বলেন– 'এর উৎস থাকতে পারে শুধু তার মধ্যেই, যার জ্ঞানের অন্তর্ভূক্ত আকাশ ও মাটিতে যা কিছু আছে সবই। (সূত্র : এল.কে সিদ্দিকী বার এট ল,– সত্য সমাগত)

এরপর একদল বুদ্ধজীবি পুর্ণ মনোযোগ দিলেন পূর্ব থেকে চলে আসা সেই বিকৃতির প্রতি, যার উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম মানেই দানবীয় কাণ্ড কারখানা এবং মুসলমান মানেই বন্য, সন্ত্রাসী ও ভয়ানক জীব, এমনতরো প্রচারণা। তারা ইসলামী জীবনাদর্শের বিস্তারকে লুট, ডাকাতি ও যাবতীয় বর্বর কর্মকাণ্ডের ফলাফল হিসেবে প্রচার করতে থাকেন। তারা ইতিহাস বিশ্লেষণের নামে আকাশ ফাটানো নিনাদে যা বলতে থাকেন, তার সারাৎসার হলো ইসলামের শক্তি অর্জন মানেই খৃস্টধর্মের কবর রচিত হওয়া। গণহারে তখন খ্রিস্টানদের হত্যা করা হবে। নাগরিক অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা কিছুই থাকবে না। কেননা ইসলামের গোটা ইতিহাস খ্রিস্টান-ইহুদীদের নাগরিক অধিকার হরণের কাহিনী। মুসলমানদের বিজয় ও শাসন মানেই পঞ্চম শতাব্দীতে রোম নগরী লুণ্ঠনকারী কিংবা হালাকু-চেঙ্গিস বাহিনীর ক্ষমতা অর্জন ছাড়া কিছুই নয়। যা ইতিহাসে কেবলমাত্র রক্ত ও লাশের আয়োজন করেছে।

বিভ্রান্তি ছড়ানোর সময় তারা আবেগ, উত্তেজনা ও চাতুর্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রয়োগ করেন। কিন্তু একথা ভুলে যান যে ইসলামের গোটা ইতিহাসে বিভিন্ন

অভিযানে মোট নিহত ব্যক্তিবর্গ ইউরোপে সংঘঠিত দু'টি বিশ্বযুদ্ধে নিহতদের চেয়েও কম। ইসলাম তার অধীনস্থ অধিকাংশ দেশই জয় করেছে যুদ্ধযাত্রা ছাড়াই। সেখানকার নিপীড়িত মানুষ মুক্তির জন্যে ইসলামকে আপনার করে নিয়েছিলো। আর যেসব ক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিলো, সেখান থেকে এমন একটি ঘটনাও প্রমাণ্য সূত্রসহ উল্লেখ করতে পারেননি, যাকে গণহত্যা বলা যায়। অন্তত নিজেদের উত্থাপিত দাবীর পক্ষে দলিল হিসেবে হলেও কল্প-কষ্টের বুনন ছাড়া সত্যি সত্যিই কোনো ঘটনা যদি হাজির করতেন, তাহলে এর আড়ালে মুখ লুকাবার একটা সুযোগ তাদের জন্যে খোলা থাকতো।

এর পাশাপাশি আবেগের তোড়ে অনেক সময় তারা ভুলে গেছেন যে ইসলামে ইহুদী খ্রিস্টানদের আহলে কিতাবী বলে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। ঈসা মসীহ ও মূসা আ.কে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত প্রতিনিধি হিসেবে বিশ্বাস করাকে ঈমানের শর্ত সাব্যস্থ করা হয়েছে। পবিত্র কোরআনে গোটা এক সূরাই মরীয়ম তথা মা মেরির নামে স্থিরিকৃত। আল্লাহর রাসূল সা. স্বয়ং মদীনার ইহুদীদের সাথে রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকারনামার মাধ্যমে তাদের অধিকার, মর্যাদা ও রাষ্ট্রের প্রতি তাদের কর্তব্য নিশ্চিত করেন। সেই অঙ্গীকারের ভিত্তিতে বারবার বিশ্বাসঘাতকতা ও রাষ্ট্রের প্রতি বারবার হুমকি সৃষ্টি না করা পর্যন্ত আহলে কিতাবীরা নাগরিক অধিকার সার্বিক নিরাপত্তা ও সম্মান লাভ করে আসছিলো। ইসলামের আদর্শ সময়ে তো বটেই, এমনকি রাজতান্ত্রিক সময়ে ও খলিফারা আহলে কিতাবীদের সাথে সম্প্রীতি-উদারতা ও ইনসাফপূর্ণ নীতি অবলম্বন করেন। বিবেকবান ঐতিহাসিকরা যা স্বীকার না করে পারেননি।

কিন্তু ইতিহাস বিকৃতির সান্ত্রী সেপাইরা এর ধার ধারবেন কেন? তারা লেখার টেবিলে বসে ইসলামের ইতিহাস বলতে নৃশংস সব ঘটনা আবিষ্কারে এমন যোগ্যতা প্রদর্শন করেছেন যে তাদের ঘাম ঝরানো প্রচেষ্টা ও মিথ্যাচারের সৃজনীশক্তি দেখে অবাক হতে হয়। তাদের ছড়ানো উদ্ভট কাহিনীগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে বামপন্থীদের অন্যতম গুরু, লেনিন, কার্ল মার্কস, ট্রটস্কি ও গোর্কির সহকর্মী, মি এম এন রায় তার দি হিষ্টোরিক্যাল রুল অব ইসলাম গ্রন্থে লিখেন– 'আবেগবিহীন ও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণের ফলে এখন ইতিহাস থেকে কীংবদন্তি ওআর ভয়ংকর সব কল্পকথা নিশ্চিহ্ন হয়, তখন এটি সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামের উত্থান মানব জাতির জন্য অভিশাপ নয়, আর্শীবাদ।'

অহেতুক নয় মি রায়ের এই মন্তব্য। কেননা পিরিনিজ পর্বতমালা থেকে হিমালয়ান ভূখণ্ড পর্যন্ত ইসলাম যে মানচিত্র রচনা করেছিলো, মানবতা, ইনসাফ ও সমৃদ্ধির এ ছিলো অভূতপূর্ব এক পরিমণ্ডল। যেখানে ছিলো ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে

গোটা মানব গোষ্ঠীর জন্যে ছিলো নিরাপদ জীবন যাপনের নিশ্চয়তা। স্যার থমাস আর্নল্ড লিখেছেন– 'মুসলিম শাসনামলে খ্রিস্টানদের জীবন, সম্পদ কিংবা চার্চের কোনো অবনতি হওয়া তো দূরের কথা, মুসলমানদের প্রজা হবার পর নেস্টোরিয়ানদের ধর্মীয় কার্যকলাপ আরও জোরদার হয়। তারা নতুন বলে বলীয়ান হয়। খলিফাদের শাসনামলে দেশের অভ্যন্তরে তারা নিরাপত্তার যে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলো, এতে তারা দেশের বাইরে খ্রিস্টান মিশনারী পাঠাবার সুযোগ পায়। ভারত এবং চীনেও মিশনারী পাঠানো হয়। ... অন্য খ্রিস্টানরা যদি অনুরূপ তৎপরতা দেখাতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাতে মুসলমানদের দোষ দেয়া যায় না। মুসলিম সরকার সব কিছুই সহ্য করে এবং একে অপরকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখে। (দি প্রিচি ওফ ইসলাম)

ইসলামের প্রথম যুগে খ্রিস্টানেরা বিশেষ করে শহরে বসবাসকারী খ্রিস্টানেরা তাদের জান-মাল ও ধর্মীয় বিশ্বাসের এতো বেশি নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা পেয়েছিলো যে এ সুযোগে তারা যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিলো এবং বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছিলো। (প্রাগুক্ত)

থমাস আর্নল্ড অনেকের কথা উল্লেখ করেছেন, যারা খলিফার দরবারে প্রতিপত্তিশালী হয়েছিলেন। উদাহরণ হিসেবে সালমাওরাহ ও ইব্রাহীম ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা উল্লেখ করা যায়, যারা মুসলমানদের উযির ছিলেন এবং একজন ছিলেন রাষ্ট্রীয় ধন ভাণ্ডারের উযির। একবার ইব্রাহীম অসুস্থ হয় পড়লে খলিফা আল মুতাসিম তার গৃহে গমন করেন। ইব্রাহীম মারা গলেে খলিফা এতোই শোকিভভুত হয়ে পড়েন যে তিনি তার লাশ দরবারে নির্য়ে আসার আদেশ দেন এবং সেখান থেকেই শোক মিছিল শুরু হয়। থমাস আর্নল্ডের মতো– 'এ রকম সম্প্রীতি মুসলিম শাসনামলে একান্তই স্বাভাবিক ছিলো (প্রাগুক্ত)। উত্তর আরব ইরাক এবং সিরিয়ায় গীর্জা নির্মাণ করার জন্যে খলিফাগণ নির্দেশ দিয়ছিলেন এবং তারা এর জন্য চাঁদাও দিয়েছিলেন। অথচ এ সময় ইসলামকে ক্রমাগত খ্রিস্টানদের আক্রমণের মোকাবেলা করতে হয়েছিলো এবং খ্রিস্টান বাইজেন্টাইন ও মুসলমানদের মধ্যে একটানা যুদ্ধ চলছিলো। (প্রাগুক্ত)

খ্রিস্টান এবং মুসলিম বিশ্বের মধ্যকার ক্রুসেডের ভয়াবহ সময়েও মুসলিম পক্ষ আহলে কিতাবীদের সাথে মানবিক ও উদার আচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। অসহায় ক্রুসেডারদের শিবিরে যখন দুর্ভিক্ষ, রোগ এবং শত্রুর তীর ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে, তখন গ্রীকরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অন্য কোনো উপায় না দেখে পাঁচ-ছয় হাজার ক্রুসেডার পালাবার চেষ্টা করে। ... মুসলমানরা তখন রোগীর শুশ্রুষা এবং ক্ষুধার্তের খাদ্য নিয়ে এগিয়ে আসে।

ক্রুসেডারদের কাছ থেকে বলপূর্বক চাতুরি করে যেসব ফরাসী মুদ্রা গ্রীকরা কেড়ে নিয়েছিলো, মুসলমানদের অনেকে কিনে নিয়ে তা অকৃপণভাবে দান করেন। ভিন্নধর্মী মুসলমান এবং স্বধর্মী খ্রিস্টানদের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য ছিলো আকাশ-পাতাল। গ্রীকরা তাদের বলপূর্বক খাটিয়েছিলো, নির্মমভাবে প্রহার করেছিলো এবং তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিলো। এ বৈষম্যের জন্যেই অনেকেই স্বেচ্চায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ... মুসলমানদের সেবা ছিলো তৃপ্তিকর এবং তারা কাউকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্যও করেনি (দি প্রিচিং ওফ ইসলাম) ক্রুসেডাররা জেরুসালেম দখল করে যদিও সর্ববয়স, সর্বলিঙ্গ ও সর্বশ্রেণির মানুষকে হত্যা করে (হিট্রি, হিস্ট্রি ওফ দি এ্যারাবস), যদিও তাদের বর্বরতায় জেরুসালেমের পথে প্রান্তরে মানষের খণ্ডিত হাত মাথা ও পায়ের পাহাড় গড়ে উঠে (রেইমুনডাস দ্য এ জাইলস, দি হিস্ট্রি ওফ জেরুজালেম) কিন্তু মুসলমানরা তা পুনর্দখল করে সমস্ত বন্দি খ্রিস্টানকে মুক্তি দিয়ে দেন। দরিদ্রদেরকে মুক্তি দেন মুক্তিপণ ছাড়াই (হিট্রি, হিস্ট্রি অফ দি অ্যারাবস)

ইউরোপে মুসলমানদের প্রবেশ ও ক্ষমতাগ্রণ এই ধারাবাহিকতাকে আরো বেগবান করেছিলো। সেখানকার নিপীড়িত মানুষ মুক্তির জন্যে ইসলামকে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ করেছিলো। খ্রিস্টধর্মের নামে নিপীড়নের শিকার অসহায় জনগণের কাছে ইসলাম ছিলো নব জীবনের দরোজা। মি. এডলফ হেলকেরিচের ভাষায়– 'যারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে অস্বীকৃতি জানাত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গৃহিত হতো। সে জন্যে আক্রমণকারী আরবদেরকে সাধারণ মানুষ গ্রহণ করেছিলো উদ্ধারকর্তা হিসেবে। খ্রিস্টধর্ম গ্রহণকারী উৎপীড়িত ক্রীতদাসরাও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। (দি মেসেজ ওফ মুহাম্মদ সা.)

থমাথ আর্নল্ডের ভাষায়– 'আরবদের বিজয়ের দিনগুলোকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার বা ধর্মীয় উৎপীড়নের কোনো ঘটনা দেখা যায় না। (দি প্রিচিং ওফ ইসলাম)।

এই যাদের অতীত ইতিহাস , হাজার বছর যে সম্প্রদায়গুলো পারস্পরিক অঙ্গীকার ও সহমর্মিতা নিয়ে বসবাস করলো, আজকের পৃথিবীতে তাদেরই এক বিশাল অংশ পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে বিশ্বাসই করা যাচ্ছে না– এরাই এক সময় পৃথিবীতে ধর্মে ধর্মে সহবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলো। এই বিশ্বাস করতে না পারার অন্যতম কারণ ইতিহাস বিকতি। বিকৃতিটা খ্রিস্টবিশ্বের হয়েছে মূলত এবং যে অন্ধ বিদ্বেষ ও স্বার্থের প্ররোচনায় ক্রুসেডাররা জেরুসালেমের সর্বশ্রেণির নাগরিক হত্যায় মেতে উঠেছিলো, সেই একই প্রণোদনা তাদেরকে প্ররোচিত করছে ইসলামের ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়কে রক্তাক্ত, সন্ত্রাসময় ও নারকীয় বলে অভিহিত করতে।

এই মনোবৈকল্যে আক্রান্ত ঐতিহাসিকরা শত শত বছর যাবত সুসংগঠিতভাবে মানব বিশ্বের গৌরবময় সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের কালখণ্ডগুলোকে যাচ্ছেতাই কামড়িয়েছেন। ফলতঃ তা বিকৃত ও চর্বিত শস্যদানার মতো আবেদনহারা অবস্থায় পড়ে আছে বিস্মৃতির পথের ধারে। তা যে ধর্মে ধর্মে নৈকট্যের বাতাবরণ তৈরি করবে, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে পরস্পর নিকটস্ত করবে, সেই প্রাণশক্তি তিরোহিত অবস্থায় তার কাঁতরানিই শুধু বাতাসে শোনা যায়। এর পাশাপাশি তার মাধ্যমে যেহেতু স্বার্থের প্রতিভু ও অপশক্তির প্রেতাত্মারা ইসলাম ও খৃস্ট বিশ্বকে সংঘাতে লিপ্ত করতে চায়, তাই ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে এমন সব ইন্ধন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখেছে, যা প্রতিহিংসার বহ্নিশিখায় সভ্যতার শস্যক্ষেতকে ভস্ম করে দিতে উদ্যত।

প্রোপাগাণ্ডাজীবিরা মিডিয়ার মাধ্যমে প্রত্যহ সেই আগুনের জ্বালা ছিটান। মানুষ প্রতি প্রত্যুষেই কিছু কিছু আগুন গ্রাস করে, সে ক্রোধান্ধ হয়। শিক্ষার নামেও আগুন ছড়ানোর নজির কম নয়। বই-পত্রের মাধ্যমেও তা চলছে। ডানে, বামে, চারদিক আচ্ছন্ন করে, বৃষ্টি বর্ষণের মতো, ঘূর্ণির বিস্তারের মতো। অতএব এর ফল ও অল্প-স্বল্প প্রকাশ না পেলে তো হয় না।

ফল প্রকাশ পাচ্ছে বলেই তো চরমপন্থী, মারদাঙ্গা ও ইহুদীবাদী খ্রিস্টবাদী বা ইসলামের নামে জঙ্গীবাদ। ফল প্রকাশ পাচ্ছে বলেই চতুর্দিকে নিরাপত্তাহীনতা। ধর্মে ধর্মে অবিশ্বাস, সংঘাত ও সন্ত্রাস। খ্রিস্টবিশ্বে আজ একজন মুসলিম আতংকিত অবস্থায় রজনী যাপন করে,' কখন তার উপর জুলুমের খড়গ নেমে আসে। হরণ করা হয় তার নাগরিক অধিকার। আবার একজন ইহুদী বা খ্রিস্টানও কোনো মুসলমানকে সহজে গ্রহণ করতে চায় না। মনে করে আমাকে হত্যা করার জন্যে তার মধ্যে কোনো একটা কারসাজি নিশ্চয়ই আছে। এর কারণ সে শুনেছে ইসলাম মানেই বর্বরতা ও সন্ত্রাস এবং মুসলমান সন্ত্রাসী জাতি। এই প্রচারণার পালে বাতাস দিচ্ছে সাম্রাজ্যবাদ ও যায়নবাদ। যারা পৃথিবীর নিরাপত্তা ও শান্তির পথে নতুন নতুন সংকট সৃষ্টি করে চলছে। মুসলমানদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। এবং ইতিহাস বিকৃতির জন্যে দালালদের প্রতিপালন করছে।

এই সব দালাল মুসলিম দুনিয়ার অসংখ্য সমস্যার গোড়ায়। নিজেদের প্রভুদের তুলনায় তারা ইসলাম বিদ্বেষে এক কাটি সরস থাকতে চায়। এই সব দালাল শুধু ইসলামের দুশমন নয়, তারা শান্তি ও মানবসংহতির শত্রু। সাম্প্রদায়িকতার নামে এ দেশে প্রচ্ছন্ন ইসলাম বিদ্বেষ ছড়াচ্ছে এরাই। শত শত বছর ধরে এ দেশে হিন্দু- মুসলিম শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করছে, অসাম্প্রদায়িকতার

গলাবাজির প্রয়োজন পড়েনি। এখনও সেই সহাবস্থান বহাল রয়েছে। কিন্তু ওরা চায় সম্প্রীতি না থাকুক। এ জন্যই ইতিহাস বিকৃত করছে, এবং কোথাও তিলের অস্তিত্ব খুজে পেলেই তাকে তাল বানাবার চতুর কৌশল অব্যাহত রাখছে। এমনই চলছে দেশে দেশে, গোটা বিশ্বে। এসব চলছে বলেই অবিশ্বাস, ভীতি, ঘৃণা ও হানাহানির বারুদ ধর্মে ধর্মে। সর্বত্রই সংকটের ভরকেন্দ্রে আছে এই সব মিথ্যা। সাম্প্রদায়িকতার আগুন, বর্ণবাদের বিষ, জাতিগত উচ্ছেদ ও বিনাশের উস্কানীর উস্কানীর মূলে আছে এইসব প্রোপাগাণ্ডা। যার ভিকটিম হচ্ছেন মূলত মুসলমানরাই।

কিন্তু এগুলো তো বন্ধ করতে হবে। আমরা যদি শান্তিপূর্ণ একটি পৃথিবীর কামনা করি, তাহলে বিকৃত ইতিহাসকে প্রত্যাখ্যান করে সত্যিকার ইতিহাসের পূণনির্মাণ করতে হবে। একে অন্যের প্রতি যেমন সম্মান প্রদর্শন করতে হয়, তেমনি অন্য ধর্মকেও সম্মান জানাতে শিখতে হবে। ধর্মপ্রবর্তকদের নামে বিকৃত প্রচারণা- যা কেবল শয়তানের ইচ্ছাকেই বাস্তবায়িত করে, এর বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত গড়ে তুলতে হবে। সংকীর্ণতা কেন, উদার আকাশই হোক আমাদের উঠান। ঘৃণা নয়, এখন সময় হলো হৃদয়ে সম্প্রীতির ফুল ফুটাবার।

(০৫-০৬-২০০৩)

প্রাচ্যবিদদের গরল ও গোলামদের ইসলাম চর্চা (১)

প্রাচ্যবিদদের নিয়ে কথা অনেক হয়েছে। তারা মুসলমান না হয়েও কুরআন হাদীস চর্চার জন্য আরবী শিখেছেন। কুরআন হাদীস ও আরবী সাহিত্য নিয়ে গবেষণায় তাদের অনেকেই জীবনপাত করেছেন। এক্ষেত্রে পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন অনেকেই। কেউ কেউ ইর্ষণীয় খ্যাতি ও উচ্চমানে উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাদের রচিত সীরাত, আরব ইতিহাস, আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ, ইসলামের পরিচয় পর্যালোচনা ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থাবলি দখল করে আছে আরব বিশ্বের বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস। তাদের তৎপরতার প্রতি উলামায়ে ইসলাম বরাবরই তীক্ষ্ণ নজর রেখেছেন। উলামায়ে ইসলামের পর্যবেক্ষনে দেখা গেছে প্রাচ্যবিদরা ইসলামী জ্ঞানচর্চার নামে যে বীজতলা তৈরী করেছেন, সেখানে ধানের চারা একটি গজালে আগাছা গজিয়েছে নিরান্নব্বইটি।

তারা যে কাজটি করেছেন, খুবই যত্ন ও সতর্কতার সাথে করেছেন। ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েই তারা বক্তব্য রেখেছেন। পাঠকের আস্থা আকর্ষণ করেছেন এবং অত্যন্ত সুকৌশলে ইসলামের বুনিয়াদে হামলা চালিয়েছেন। তাদের হামলা অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও সুগভীর। তাদের লক্ষ্য থাকে দ্বীনের প্রতি পাঠকের মনের গহীনতম কন্দরে সন্দেহের ধুলোবালি ছড়িয়ে দেয়া। খুব দূর থেকে তারা ধুলো উড়ানো শুরু করেন। সরাসরি কিছুই বলেন না, কিন্তু তাদের সর্বাত্মক চেষ্টা থাকে বক্তব্যের ইন্দ্রজালে পাঠক চিত্তকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করা, যে আচ্ছন্নতার ঘোরে সে উপলব্ধি করবে– কুরআন শরীফ মানবীয় চিন্তা-প্রসূত, দ্বীন ও রাজনীতি পৃথক বস্তু, রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানে ইসলামের কোনো সংযোগ নেই, ইসলাম কেবল একটি বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণ সংক্রান্ত কিছু রীতিনীতি, হাদীস বা সুন্নত বিশুদ্ধ নয় বা প্রামাণ্য নয়, নারী স্বাধীনতা জরুরী, তারা সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান, হিযাব-নিকাব নিছক সামাজিক প্রথা, ইসলামী ফিকহ শাস্ত্র রোমান আইন হতে গৃহিত এবং তারই প্রভাবে রচিত, তারই অনুকরণে বিন্যসিত আলেম-উলামাদের ইসলামী উপলব্ধি ধ্বংসাত্মক ও ভুল, তাফসীরের মূলনীতিসমূহ অগ্রহণযোগ্য, উলূমে ইসলামী পারস্য ভারত এবং গ্রীক দর্শন ও বিদ্যার দ্বারা সৃজিত ও বিন্যসিত, ইসলামী আধ্যাত্মিকতা প্রাচীন বৈরাগ্যেরই নতুন রূপ, ভাষা, দেশ ও অঞ্চল ভিত্তিক জাতীয়তাবাদ গ্রহণযোগ্য, প্রাচীন সভ্যতাসমূহের অনুকরণ গৌরবের।

অপরদিকে ইসলামের প্রাচীন মনীষীবর্গের অনুস্বরণ প্রতিক্রিয়াশীলতা, জিহাদ ইসলামে নেই, কিংবা জিহাদ নিছক সন্ত্রাস বা সহিংসতা, ইসলামের ইতিহাস রক্ত, হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞে ভরপুর। চালাক প্রাচ্যবিদ সরাসরি এরকম কিছু বলেন না। কিন্তু তার গ্রন্থ পাঠ করে পাঠকের উপলব্ধি হয় যে ঈমানের দাবীর সাথে এই গ্রন্থ কোথায় যেনো একমত হতে পারলো না। যে পাঠক এর দ্বারা প্রভাবিত হন, তার হৃদয়ে ঈমান আর আগের তেজে রাজত্ব করতে পারে না। সে পদে পদে হোঁচট খায়। এক পর্যায়ে হৃদয়ে বিদ্যমান ঈমানের ইমারত বিবর্ণ হতে থাকে, বিধ্বস্ত হতে থাকে।

প্রাচ্যবিদদের তৎপরতা কয়েক শতাব্দী ধরে চলমান। অতীতে তারা হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিন্তু বর্তমানে তাদের তৎপরতা যে মাত্রায় এগুচ্ছে, তা একেবারে নজিরবিহীন। প্রতিদিন পৃথিবীতে ইসলাম সম্পর্কে বহু গ্রন্থ রচিত হচ্ছে। এর নব্বই শতাংশই লিখছেন প্রাচ্যবিদ অথবা তার দ্বারা প্রভাবিত কোনো ব্যক্তি। ইসলাম বিষয়ক সাময়িকী, জার্নাল, ক্রোড়পত্র, ইত্যাদির অধিকাংশই প্রকাশিত হচ্ছে তাদের দ্বারা। ইন্টারনেটে তাদের তৎপরতা বিস্ময় সৃষ্টি করে। কোটি কোটি ওয়েব সাইট চালু করেছে তারা। জনপ্রিয় সার্চ ইঞ্জিন 'ইয়াহু'তে

ইসলাম লিখে সার্চ দিলে প্রায় দশ হাজার কোটির অধিক ওয়েবসাইট চলে আসে। গুগলে অবশ্য এ সংখ্যা প্রায় সাত কোটি। এমনিভাবে আল্লাহ, মুহাম্মদ সা., কুরআন ইত্যাদি লিখে সার্চ দিলে লক্ষ লক্ষ ওয়েবসাইট নানা রকম তথ্য নিয়ে হাজির হবে। অল্পসংখ্যক ব্যতিক্রম ছাড়ার এই সব ওয়েবসাইট ইসলামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে পাঠকের মগজ নষ্ট করছে।

কাদিয়ানী, রাফেজী, বাহাই ইত্যাদি নানা গোষ্ঠীর দ্বারা ইসলামের নামে স্বতন্ত্র ধর্মমত প্রচার ছাড়াও পুরনো প্রাচ্যবিদদের বক্তব্য ও বিশ্লেষণকে নানা রকম রঙ চড়িয়ে উপস্থাপন করে বিভ্রান্তির জ্বালামুখ খুলে দেয়া হচ্ছে। এইসব লেখা-জোখা পাঠ করছে আধুনিক চিন্তা-চেতনাধারী অসংখ্য লোক। প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি আশিলক্ষ মানুষ শুধুমাত্র ইন্টারনেটে ইসলাম সম্পর্কে সার্চ করে। প্রিন্টমিডিয়া ও বই-পত্রের স্মরণাপন্ন হচ্ছে কতো লক্ষ, তার কোনো হিসেব নেই। ইসলাম সম্পর্কে আগ্রহী অমুসলিমরা ইসলামকে জানার জন্য মূলত এই সব মাধ্যমের দ্বারস্থ হন। তারা আগ্রহ সহকারে ইসলাম সম্পর্কে পড়াশোনা শুরু করেন, কিন্তু পরিণতিতে হতাশা ও বিতৃষ্ণা নিয়ে কেউ কেউ পড়াশোনা বাদ দেন, আর অধিকাংশই ইসলামকে মানবতার জন্য এক আপদ হিসেবে চিন্তা করতে বাধ্য হন। তবে সঠিক তথ্য যাদের ভাগ্যে জুটছে, তারা সব ধরনের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে ঈমানের শামিয়ানাতলে ছুটে আসছেন।

সেক্যুলার ধারায় শিক্ষিত অধিকাংশ মুসলিম ইসলাম সম্পর্কিত ব্যাপারে 'মুস্তাশরেকীন'র বক্তব্যকে কান পেতে শুনতে আনন্দ পান এবং এতেই তারা অভ্যস্থ। এক্ষেত্রে মারগোলিউথ, পি.কে. হিট্টি, স্প্রেঙ্গার, গোল্ডযিহার, উইলিয়াম ম্যুর, বসওয়ার্থ স্মিৎ, লুইস লামায়া প্রমুখকে শ্রদ্ধা সহকারে উদ্ধৃতি করা হয়। এদের প্রত্যেকেই বিশেষজ্ঞ মর্যাদায় বরিত হন আবেগের সাথে এবং অতিআবেগের তোড়ে তাদের বক্তব্যে বিদ্যমান ফাঁক ও ফাকির বিষাক্ত উপাদান অমৃততুল্য হয়ে উঠে। মুসলিম বুদ্ধজীবিদের বিশাল এক অংশ তাদের জ্ঞান দর্শন চিন্তাকে অবলম্বন করে লেখনি ধারণ করেছেন। ফলে তাদের কলমে ইসলামের জীবনীসত্য যতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ লক্ষ্য করা গেছে এমন প্রচারণা, যার মূল উদ্দেশ্য ইসলামকে রুগ্নদেহ হিসেবে চিত্রিত করা। এদের মধ্যে মিসরের শায়খ মুহাম্মদ আবদুহ, ডক্টর ত্বহা হুসাইন, শায়খ আলী আবদুর রাজিক, তুরস্কের যিয়াগুক আলপ, ভারতের স্যার সৈয়দ আহমদ খান, নবাব আবদুল লতিফ, স্যার সৈয়দ আমীর আলী, আসফ আলী আসগর ফয়যী, পাকিস্তানের ড. ফযলুল রহমান থেকে নিয়ে ড. তারিক রামাদান কিংবা আরবের ড. আলবানী, প্রত্যেকেই ইসলামী শিক্ষার শাশ্বত ব্যাখ্যাকে পাশ কাটিয়ে প্রাচ্যবিদদের গরল উদগীরণ করেছেন।

এদের প্রচেষ্টা মূলত ইসলামকে তার ১৪ শ বছরের অনুসৃত অবস্থান থেকে সরিয়ে এমন সব প্রেসক্রিপশনের আলোকে ঢেলে সাজানো; যা নির্গত হয়েছে ক্রুসেডারদের আওলাদদের বিদ্বেষ বিষাক্ত মস্তক থেকে। তারা বরাবরই ইউরোপের বস্তুবাদ, জড়বাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদিকে ভারসাম্যপূর্ণ হিসেব দেখেছেন এবং পশ্চিমা জীবনচিন্তাকেই উপরে স্থান দিতে চেয়েছেন। মিষ্টি আবরণের মুক্তিচিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির দোহাই দিয়ে তারা আল কুরআনের প্রতিষ্ঠিত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধাচরণ করেছেন, হাদীস সুন্নাহর সার্বজনীন প্রথাগত গ্রহণযোগ্যতা ও উপযোগীতাকে অবজ্ঞা করেছেন, তাকলীদের বিরুদ্ধে সব ধরনের অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে ইসলামী জীবন যাপনের সুশৃঙ্খল প্রক্রিয়াকে নস্যাত করতে চেয়েছেন।

এরা সর্বক্ষণই ইজতিহাদের কথা বলে পাড়া মাত করতে উস্তাদ। ভাবখানা এমন যে, ইজতিহাদের রুদ্ধদ্বার খোলে দিয়ে ইসলামকে রক্ষা করতেই তারা জন্ম নিয়েছেন। অথচ তারা কেউই ইজতিহাদে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারেননি। এ যোগ্যতা অর্জনের চেয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টিতেই তাদের মনোযোগ ছিলো নিবদ্ধ। তারা দেখাতে চেয়েছেন আমাদের মহানবী সা. ও খেলাফতের সময় ইসলাম ছিলো খুবই উদার, প্রগতিশীল এবং যুক্তিনির্ভর ধর্ম। কিন্তু আমাদের ইমাম, ফকিহ ও মুজাদ্দিদদের হাতে ইসলাম সেকেলে, অযৌক্তিক, সংকীর্ণ, অচল ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়েছে। যা আমাদের বর্তমান দুর্বলতা ও অবমাননার জন্য দায়ী। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, মুসলিম বিশ্বের সকল অনিষ্টের মূলে রয়েছেন উলামা-মাশায়েখ ও ধর্মীয় পণ্ডিতবর্গ। তারা ধর্মীয় কর্তৃত্বের অপব্যবহার করছেন এবং ইসলামকে বদ্ধ জলাশয় বানিয়ে রেখেছেন। অতএব আধুনিকতাবাদীরা মোল্লাতন্ত্র নামে একটি উদ্ভট শব্দ প্রসব করেছেন এবং কথায় কথায় এর বিরুদ্ধে রণহুংকার ছেড়ে আলেমদের বিরুদ্ধে আক্রোশের মাত্রা জাহির করেছেন।

তারা এক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ইবনে হাম্বল, গাজালী সহ কাউকেই আক্রমণ থেকে বাদ রাখেন না। বিগত চৌদ্দশত বছরে বরেণ্য ইমামদের কেউই ইসলামকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেননি। এখন আধুনিকতাবাদীরাই ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা শিখে ফেলেছেন। তারা ইসলামের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পাশ্চাত্যের প্রচলিত বিষয়গুলোকে ইসলামের উপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর ইসলামের যে বিষয়গুলো পাশ্চাত্যের মতো করে দেখানো অসম্ভব, সেগুলোকে মূল্যহীনভাবে দুরে ছুঁড়ে ফেলেছেন অথবা আরোও অগ্রসর হয়ে কোনো উপদল সৃষ্টি করেছেন।

তারা ইসলামের বিভিন্ন দিক ও মানবতাবাদী আদর্শ সম্পর্কে অসংখ্য যুক্তি পেশ করেছেন, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আদর্শ হিসেবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বকে তুলে ধরার জন্য তা করেননি। বরং যেহেতু সাম্য, মানবতা ইত্যাদির ধারণা পাশ্চাত্যে সমাদৃত, তাই পাশ্চাত্যের পছন্দের ইসলামকে কেবল ব্যক্ত করেছেন। আধুনিকমনা এইসব ইসলামী চিন্তাবিদদের চাইতে অক্সফোর্ড বা ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচাইতে মেধাবী ছাত্রটিও পাশ্চত্যের প্রতি অনেক কম আস্থা পোষণ করে। এই সব আধুনিক ইসলামী চিন্তাবিদদের মধ্যে যারা অধিক চরমপন্থি, তাদের কাছে প্রাচ্যবিদদের বলে দেয়া অর্থই ইসলামের প্রকৃত অর্থ বা তাৎপর্য। পর্দাহীনতা যদি পাশ্চাত্যের পছন্দ হয়, তাহলে নারী স্বাধীনতার নামে পর্দাহীনতাই প্রকৃত ইসলাম। ধর্মনিরপেক্ষতা যেহেতু রেওয়াজ হয়ে গেছে, অতএব তাদের কাছে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা এ মানসিকতা ও লেখার সাথে পরিচিত আছেন, তারা জানেন যে কতো বশংবদ, হীন ও উদাসীন প্রকৃতির বক্তব্য এ বিষয়ে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এমনকি আইনের দিক দিয়ে যে সব বিষয় সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী, সেখানেও ইসলামাইজেশনের চেষ্টা করা হয়েছে। আবার জিহাদসহ বহু বিষয় ইসলামের অপরিহার্য হলেও সেগুলোর মূল আবেদনকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। মুজিযাকে অস্বীকার করা হয়েছে,তাসাউফকে প্রত্যাখান করা হয়েছে,আবার যখন ইউরোপ তাকে পছন্দ করতে শুরু করলো, তাকে বুকে তুলে নেয়া হয়েছে। তাদের কাছে হালাল হারামের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো উপযোগবাদ। যে বিষয়টি আজকের পৃথিবী তথা পশ্চিমারা গিলতে চায়, সেটাই প্রথম অগ্রাধিকার। তালাকের মাসআলা ওদের কাছে চরম বিরক্তিকর, ইসলামী শাস্তিবিধান ওদের চোখে চরম বিব্রতকর, অতএব তারা এসবের নামও মুখে নিতে রাজি নন।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো এই প্রকৃতির লোকেরাই ইসলামী দুনিয়ার গণসংযোগের অধিকাংশ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা মানুষের মন ও চিন্তার উপর এতোই প্রভাব খাটাচ্ছে যে তাদের সংখ্যার স্বল্পতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা থেকেও মানুষ অনেক দূরে। কিন্তু আশার ব্যাপার হলো ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ ও মুসলিম বিশ্বের আধুনিকতাবাদী সংখ্যালঘুরা যে মুহূর্তে তুঙ্গে আরোহণ করছে, সে মুহূর্তে পাশ্চাত্য সভ্যতাটাই নুঙ্গরহীনভাবে ঘুরে চলছে। সে জানে না তাকে কি করতে হবে বা কোথায় যেতে হবে। মৃত্যুরোগে মুর্ছাতুর উন্মাদের মতো এখন সে উদভ্রান্ত।। পূজারীরা একেই মনে করছে যৌবনের তেজ। কিন্তু যাদের দৃষ্টি খোলা, তারা ঠিকই ধরে ফেলেছে পশ্চিমের মরণ যন্ত্রণা।

এখন সেই সব 'চক্ষুষ্মান' তরুণকে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের কলমের নূরে দুনিয়ার মানুষ দেখুক ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত পশ্চিমা সভ্যতা নামক ভুল দেবতার অন্তঃসারশূণ্যতা। মানুষ জানুক ইসলামের বিরুদ্ধে তার রণহুংকারের অসারতা ও মদীনার ইসলামের জীবনীশক্তি। প্রাচ্যবিদ ও তাদের গোলামবাদীদের রচনাবলি স্তুপ স্তুপ মেঘের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের প্রচারণার ফুঁৎকার বিষ ছড়াচ্ছে চারদিকে। এর স্বার্থক মোকাবেলার জন্যে প্রতিটি পথ ধরে আলোর বাহনে চড়ে এগিয়ে আসতে হবে সত্যের সৈনিকদের। প্রচারের মোকাবেলায় প্রচার, যুক্তির মোকাবেলায় যুক্তি, বিভ্রান্তির মোকাবেলায় অভ্রান্ত প্রত্যাঘাত– এই হোক ওহীভিত্তিক জীবনদর্শনে সমর্পিত লড়াকুদের জিহাদ।

এই জিহাদ যখন ঘুর্নিঝড়ের মতো মিথ্যার আস্তানায় হানা দেবে, তখন খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে অন্ধকারের আস্তরণ, ফকফকা রোদের মতো হেঁসে উঠবে ইসলামের শাশ্বত বিজয়। বিদ্বেষ ও বিষাক্ত মিথ্যাচারে বিব্রত মানবতা সেই বিজয়ের প্রতীক্ষায় চাতকের মতো অধীর হয়ে আছে।

(০৩-০৮-২০০৫)

প্রাচ্যবিদদের গরল
গোলামদের ইসলাম চর্চা (২)

আজ যে পাশ্চাত্য ইসলামকে শত্রু সাব্যস্ত করে তার সময় কৌশল ও যুদ্ধাস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, এর পিছনে ইতিহাস বিকৃতির ভূমিকা বিশাল। দুষ্ট কর্মটি পাশ্চাত্যেই শুরু হয়েছিলো, এবং যারা শুরু করেছিলো, তারা যে ইতিহাস চর্চা করবে বলেই ইসলামের ইতিহাসে হাত দিয়েছিলো, তা নয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিলো অন্য কিছু। সেই অন্য কিছু জিনিসটা কী, তার একটা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো ক্রুসেডের যুদ্ধে।

ক্রুসেডে দেখা গেলো মুর্খ, আবেগপ্রবণ, তরুণ ও ধর্মান্ধ মানুষকে উস্কে দেয়ার ক্ষেত্রে ক্রুসেডের আয়োজকরা বিকৃত ইতিহাসকে আবহাওয়ায় ছড়িয়ে দিতে লাগলো। যা তাদের যাজকেরা রচনা করেছিলেন। সেই ইতিহাস ছিলো

মুসলমানদেরকে ডাকাত, দানব, মানুষখেকো ও হিংস্ররূপে উপস্থাপনের সজ্জিত বিবরণ। একটা জিনিস দেখানো হয়েছিলো, মুসলমানরা এলেই রেহাই নেই। আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেবে। ধরে ধরে খেয়ে ফেলবে। প্রচারণার উত্তাপ বাড়ানোর জন্য নানান কাহিনী তৈরী করে সেগুলোকে ইসলামের বৈশিষ্ট বলে প্রচার করা হলো। ফল দাঁড়ালো গোটা পাশ্চাত্য মৃত্যু আতঙ্কে কাঁপতে লাগলো। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ আকার ধারণ করলো। চারদিকে হৈ-হুল্লোড় শুরু হলো।

কিন্তু ক্রুসেড যুদ্ধের মৃত্যখেলায় মানুষকে লিপ্ত করার জন্য এটাই যথেষ্ট ছিলো না। সেজন্য আরেক দফা মাথা ঘামালো যাজকরা। তারা মানুষের লোভের প্রবৃত্তিকে উস্কিয়ে তুলবার কৌশল স্থির করলো। ইসলামী দুনিয়ার এমন সব বিবরণ তারা রচনা করতে লাগলো, যা দরিদ্র, ভুখা-নাঙা পাশ্চাত্যকে লোভের অদম্য লালায় প্লাবিত করার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো। তারা জীবনে না দেখলেও ইসলাম বিশ্বের জীবনযাত্রাকে উপস্থাপন করলো, দস্যুর কাছে গুপ্তচর যেভাবে বনিকের ধনবৃত্তান্ত সাজিয়ে সাজিয়ে উপস্থাপন করে, তেমনই।

তারা দেখালো ইসলামী বিশ্বে ভুনা গোশত, মদ আর খেজুর আঙ্গুরের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। ঘরে ঘরে এসব নিয়ে চলছে মহোৎসব। ঘরগুলোতে সোনা-দানা আর হিরে জহরতের পাহাড়। ঘরে ঘরে স্বর্গঅপ্সরীর নৃত্য চলছে। এর সবই তারা অর্জন করেছে খ্রিস্টানদের হত্যা ও বিতাড়িত করে। অতএব তাদের হাত থেকে এসব লুট করা ইশ্বরের পুত্রদের জন্য অপরিহার্য। ইশ্বরের শত্রুরা এমন বিলাসজীবনে ডুবে থাকবে, আর তার পুত্ররা যাপন করবে নিঃস্ব ও রিক্ত জীবন-তা হয় না।

তাদের এসব তৎপরতার ফলে ইতিহাস এমনভাবে কলুষিত হলো যে, ইসলামী বিশ্বের অধিকাংশ শাসকই চিত্রিত হলেন লুটেরা, ভোগবাদী, প্রজাপীড়ক, কামুক, মদ্যপ, নিষ্ঠুর ও অর্ধউন্মাদের পর্যায়ে। ইসলামের ইতিহাসটাই দাঁড়ালো অন্য সম্প্রদায়কে হত্যা ও বিতাড়ণের জ্বলজ্যান্ত বৃত্তান্তে। ইতিহাসে ছড়ানো প্রপাগাণ্ডার অধিকাংশই সৃষ্টি হয় ক্রুসেডের সময় গীর্জায় গীর্জায় যাজকদের হাতে। সেই যে তারা কাজটি করলো, তা পরে একটি প্রথা হয়ে গেলো। একে ধর্মতাত্ত্বিক জ্ঞান চর্চার একটি অংশ হিসেবে দাঁড় করানো হলো। এর একটি কারণ হলো ক্রুসেডে তাদের পরাজয়। যে মিশন নিয়ে তারা ইতিহাস বিকৃতিতে হাত দিয়েছিলো, সেই মিশনটা প্রচণ্ড মার খেয়ে অসংখ্য লাশ

আর যুগের পর যুগ ধারাবাহিক রক্তপাতের পরিণতি নিয়ে গোটা পাশ্চাত্যে একটি বিপর্যয় হয়ে বইতে আরম্ভ করলো। ফলে তাদের হিংসায় আচ্ছন্ন মানসিকতার সাথে যুক্ত হলো প্রতিশোধ স্পৃহাও। তাই যুদ্ধক্ষেত্রে মুসলমানদের হত্যা করতে না পারলেও বাড়িতে ফিরে এসে শান্তনা লাভ করতে চাইতো। আরেকটি ক্রুসেডের মাধ্যমে পরাজয়ের যন্ত্রণা প্রশমিত করতে চাইতো। মুসলিম বিশ্বকে কবরস্থ করার স্বপ্ন দেখতো। সে ক্ষেত্রে ইতিহাস বিকৃতির কাজটা আগে ভাগে করে রাখা যে কত বড় ফলদায়ক, সে অভিজ্ঞতা ইতোপূর্বে তাদের অর্জিত হয়েছিলো।

নতুন পরিকল্পনার ভিতর সাপের প্রাণ সঞ্চারিত হলো। সে যাত্রা করলো বাতাসে বিষাক্ত নিশ্বাস ছড়িয়ে। যাত্রাটা মহাসমারোহেই হয়েছিলো। যার প্রমাণ, সে সময় পাশ্চাত্যের কয়েকটি জেনারেশন ধারাবাহিকভাবে ইসলামের ইতিহাসকে আচঁড়াবার কাজে নখে বিষ লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। সে সময় যারা কথা বলতে শিখছিলো, তাদেরকে মুখস্ত করানো হচ্ছিলো মুসলিম নামক দানবদের বিপজ্জনক ঘটনাবলি। যারা শিক্ষিত হচ্ছিলো, তাদের একটি অংশকে উৎসর্গ করা হয়েছিলো প্রাচ্যবিদ হিসেবে। তারা আরবী ভাষা শিখতো, ইসলামের বিভিন্ন গলি-ঘুপচির বৃত্তান্ত তন্নতন্ন করে খোঁজাখুজি করতো। পরে এসবে বিকৃতির রঙ চড়িয়ে মারাত্মক একেকটা আকার দিয়ে বস্তার পর বস্তা বই পত্র রচনা করতো। তাদের কলম থেকে বেরিয়ে আসা বিদ্বেষ ইসলামের ইতিহাসতো বটেই, অন্যান্য বিষয়াবলিকেও আঘাত করতে বাদ রাখেনি। সে আঘাত গিয়ে পতিত হলো তাফসীরের উপর, দর্শনের উপর। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই সহস্র আঘাত করেও নিজেদের দাঁত ভাঙচুর করা ছাড়া অন্য কোনো ফলাফল তারা অর্জন করতে পারেনি।

ফলাফল অর্জন করতে পারেনি বললে ঠিক যেন বলা হয় না, বরং তারা অর্জন করেছিলো কিছুটা। এবং সেই কিছুর জের যে এখন বড় হয়ে কিম্ভুৎকিমাকার জন্তুরূপে চারদিক দাবড়ে বেড়াচ্ছে, সেটা সামনে ইঙ্গিত দিয়ে দেখাবো।

প্রাচ্যবিদদের এ তৎপরতা পাশ্চাত্যের সীমানা পেরিয়ে উল্লাস করতে করতে প্রাচ্যে এলো উপনিবেশিক যুগে। তারা এসে এমন ভান করলো যে, ইসলামী চিন্তা চেতনার পক্ষে খেদমতগীরি করার জন্যই দেশে দেশে তাদের উড়ে আসা। সে সময় পাশ্চাত্য এসে প্রাচ্যকে তো দখল করলই, সাথে সাথে দখল করতে

চাইলো প্রাচ্যের মানুষের মগজও। তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি, তাদের ভাষা-চিন্তাধারা, তাদের দর্শন-ইতিহাসকে মানুষের জন্য উন্নয়নের বিকল্পহীন টনিক ও একমাত্র সত্যরূপে উপস্থাপন করলো। সেই সাথে উপস্থাপন করলো তাদের তৈরি ইসলামের ইতিহাস। কোথাও কোথাও তাদের তৈরি ইসলামী জীবনদর্শন। পরিণতিতে যে মগজগুলো তাদের কাছে বিক্রি হয়ে গেলো, তারা পৃথিবীটাকে তো পাশ্চাত্যের চশমা দিয়ে প্রত্যক্ষ করলোই, এমনকি ইসলামের ইতিহাসকেও বলতে, পড়তে, দেখতে ও ভাবতে শিখলো পাশ্চাত্যের পদ্ধতিতে।

কুরআনকেও সেভাবে বিশ্লেষণ আরম্ভ করলো। হাদীসকেও। এতে করে কুরআনের নামে নতুন নতুন উদ্ভট চিন্তা, হাদীসের নামে চরম গর্হিত কথা-বার্তা ফিসফিস করে বাতাসে বাজতে লাগলো। তা বেড়ে এমন হয়েছে যে, আওয়াজ শুনা যাচ্ছে ইসলামের সংস্কার করতে হবে। এ রকম বিপজ্জনক চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমেরিকান গোয়েন্দা সংস্থার আলু মুলা খেয়ে একদল বিকি খাওয়া গোলাম র‍্যাডিকেল ইসলামের নামে চিল্লাচিল্লি করছে। তাদের দুঃসাহসের মাত্রা এতোটাই বেড়ে চলছে যে, কয়েকটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তারা প্রতিনিয়ত মুসলিম তরুণদের আহ্বান জানাচ্ছে মধ্যযুগীয় ইসলামকে ঝেড়ে ফেলে ইসলামের আধুনিক রূপরেখাকে আত্মস্থ করার জন্য।

অথচ মজার বিষয় হচ্ছে মুতাজিলীয় চিন্তার পুনরুজ্জীবিত করণকে তারা অন্যতম উদ্দেশ্য স্থির করেছে। নিজেদের পুরোপুরি আধুনিক জীবনধারার প্রতিনিধি বলে জাহির করলেও এই ভণ্ডদের কে বোঝাবে যে তাদের কথিত আধুনিক ধর্মের মৌল উপাদান মুতাজলীয় চিন্তাধারাটিই হচ্ছে মধ্যযুগে উদ্ভূত চরম প্রতিক্রিয়াশীল এক দুষ্টচক্রের মলমূত্র। যে চক্রটির জন্মসূত্র তৈরি হয়েছিলো গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল, প্লেটো ও সক্রেটিসের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিছানায়। ইতিহাসের পরিত্যক্ত গর্ত থেকে সেই আবর্জনাকে তুলে এনে জায়নবাদী থিংকট্যাংকের রোডম্যাপ অনুযায়ী সেই গোলামগোষ্ঠী একের পর এক ইতরামিপনা প্রদর্শন করে চলছে।

এদের মধ্য থেকে কেউ কেউ মহিলাদের ইমামতির অধিকার নামক শ্লোগান নিয়ে শোরগোল শুরু করেছে। এক মহিলা তো বীরদর্পে ইমামতি করে বুশ-ব্লেয়ারের চেলা-চামুণ্ডাদের কাছ থেকে আকাশ কাঁপিয়ে তোলা করতালি উপহার পেয়েছে। লোকগুলো কুরআন হাদীস সংস্কার করবে, এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা-

বার্তাও বলে বেড়াচ্ছে। পাশ্চাত্যের বড় বড় মিডিয়া তাদের সাক্ষাৎকার ছাপছে। ইসলামী চিন্তার প্রতিনিধি হিসেবে তাদের কপালে মার্কা এঁটে দিচ্ছে। মুক্তচিন্তার সৈনিক হিসেবে তাদের পক্ষে বাহবা ফাটাচ্ছে। তাদের তৎপরতা ও ক্রমাগত বিস্তার নিয়ে অন্য একদিন কথা বলা যাবে। আজ যে কথাটা বলতে চাচ্ছি, তা হলো প্রাচ্যবিদদের সেই তৎপরতা কাজ দিয়েছে। ক্রুসেডারদের সেই বিকৃতি বিফলে যায় নি। এটা যেভাবে মুসলিম বিশ্বে কতিপয় জারজ সন্তানের জন্ম দিতে পেরেছে, তেমনি পাশ্চাত্যেও এমন প্রজন্ম, যারা দিয়েছে ইসলামকে ঘৃণা করে, ইসলামকে ভয় পেয়ে বেড়ে উঠছে।

যার ফলে পুরনো সেই ক্রুসেড ডাইনোসরের মতো আজ পৃথিবীতে লম্ফ-ঝম্ফ করার শক্তি পাচ্ছে। যদি তা না হতো, তাহলে সারা বিশ্বকে বিশ্বায়নের নামে ছোট গ্রামে পরিণত করার ঘামঝরানো চেষ্টায় লিপ্ত থেকেও ইসলামের নাম শুনলেই সহনশীলতা ও উদারতার নীতিকে পদপিষ্ট করে পাশ্চাত্য কেন ক্ষুধার্ত হায়েনা হয়ে উঠে? কেন ধর্মে ধর্মে সংলাপের বিশ্ব উদ্যোগের গালে থাপ্পড় মেরে পোপ বেনেডিক্টের মতো পাওয়ারওয়ালা ব্যক্তি ক্রুসেডারদের ভাষা আবৃতি করে ইসলামের উপর হামলে পড়লো? কেন তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত দ্বেষ ও শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে ত্রয়োদশ শতকের বাইজেন্টাইন শাসকের দ্বারস্থ হতে গেলেন? কেন মানবতার ঘৃণার কাদায় চাপা পড়া ম্যানুয়েল দ্বিতীয় পারিও এর চরম গর্হিত মিথ্যাচারকে বর্তমান সময়ে ইসলাম বিরোধী প্রপাগাণ্ডার জন্য আদর্শ বলে গন্য করলো? কোন তত্ত্বের ভিত্তি করে পোপ ইসলামের নবীকে সা. অশুভের প্রতীক আখ্যা দেবার দুঃসাহস প্রদর্শন করলেন? কোন ইতিহাসকে দলীল বানিয়ে ইসলামকে অমানবিকতার কারখানা বলে অভিহিত করলেন?

মানুষ অবাক হয়ে লক্ষ্য করলো পোপের এই উস্কানিমূলক বক্তব্যের পরে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলে ইতালির প্রধানমন্ত্রী পোপের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদের বিরুদ্ধে চোখ রাঙালেন। তামাশামূলক একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বলা হলো পোপ যা বলেছেন তা বক্তব্য নয়, বক্তব্যের উদ্ধৃতি। অর্থাৎ সত্য বলেছেন। ডেইলি টেলিগ্রাফ আরো এক ধাপ এগিয়ে হযরত মুহাম্মদ সা. কে এমন এক জেনারেলেন সাথে তুলনা করলো, যিনি নিষ্ঠুরভাবে শত শত মানুষের শিরচ্ছেদ করতে পারেন। দ্যা টাইমস থলের গোপন বেড়াল বের করে দিয়ে বললো, পোপের কাছ থেকে এ বার্তাটি আরবদের জন্য শোনা প্রয়োজন ছিলো।

এসব যে হচ্ছে, তা নতুন নয়। পঞ্চাশ বছর পিছনে যান। ইসরাইলের সৃষ্টি, তাকে সহায়তা দান, তার বর্বরতাকে পোষকতা দান, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গত দাবী দাওয়াকে প্রভুত্ববাদী পাশ্চাত্য কর্তৃক ভেটো দান ....

আরো পিছনে যান। বিশ্বযুদ্ধ। ওসমানীয় সালতানাত ধ্বংস। তাকে টুকরো টুকরো করা। দেশে দেশে বিতর্কিত সীমান্ত নির্ধারণের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের স্থায়ী বীজ রোপন। জাতীয়তাবাদের শ্লোগান শিখিয়ে মুসলিম বিশ্বঐক্যকে তছনছ করে দেয়ার জন্য দেশে দেশে অগণিত, অসংখ্য দালাল সৃষ্টি, পাশ্চাত্যের এসব কর্মকাণ্ড ক্রুসেডের প্রতিশোধের মানসিকতা উৎকটভাবে প্রকাশ করে --------

আরো পিছনে যান। উপনিবেশিক যুগ। হাজার হাজার কপি কুরআন পুড়িয়ে দেয়া। লক্ষ লক্ষ আলেমকে নির্মমভাবে হত্যা। মুসলমানদের জন্য বুলেট আর হিন্দুদের জন্য ভালোবাসা। আফ্রিকান মুসলমানদের ধরে নিযে দাস হিসেবে বিক্রি করা। লিবিয়া, মিশর, সুদান, ইরাক, জাজিরাতুল আরব, ভারত উপমহাদেশে মুসলমানদের লক্ষ্য করে অসংখ্য অগণিত গণহত্যা, সব কিছুর পিছনে শুনবেন ক্রুসেডীয় কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে

আর অতীত হাতড়াতে চাই না। দেখাতে চাই যে পাশ্চাত্য ইতিহাসের প্রতিটি পর্যায়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেডারদের আচরণ করে আসছে এবং এ আরচণের পিছনে তারা যুক্তি হিসেবে, পরিপ্রেক্ষিত হিসেবে, কিংবা আবেগ হিসেবে বিকৃত ইতিহাসের উত্তেজক রটনাকে ব্যবহার করেছে। তারা এটাকে এতোটই প্রচার করেছে যে তাদের মধ্যে একটা বোধ তৈরি হয়ে গেছে যে, এসব মিথ্যে হবার নয়।

যে কারণে ইসলামকে গাল দিলে পাশ্চাত্যে হাততালি মিলে। রাসূল সা. কে ব্যঙ্গ করে কার্টুন ছাপলে পত্রিকার পাঠক সংখ্যা ভৌতিকভাবে বেড়ে যায়। ইসলাম ফোবিয়া নিয়ে রাজনীতিতে নামলে সহজেই সাফল্য আসে। ইসলামী বিশ্বের ইতিহাসকে নতুনভাবে আরেক ধাপ কলুষিত করতে পারলে সহজেই হিরো হয়ে যাবে। এই যে ওরহান পামুক নোবেল প্রাইজ পেলেন, তিনি তুরস্কের ইতিহাস নিয়ে লিখেছেন। ওসমানীয় সুলতানরা নাকি খ্রিস্টান, কুর্দি ও আমেরিকানদের যখন তখন গণহারে হত্যা করতেন। ব্যাস, তাকে নোবেল প্রাইজ দেয়া হলো। এতে ওরহানের 'কেডডিত এন্ড হিজ সন্স' বইটিতে বর্নিত

ইতিহাস বিকৃতিমূলক চিত্র অন্য অনেকের কাছে সত্যের সহোদর হিসেবে মনে হবে। ওরহানও আরো লেখবেন এ ধারায়। আরো তৈরি হবে বহু হত্যাকাণ্ডের সরস কাহিনী। এভাবেই মুসলমানরা হতে থাকবেন বিপজ্জনক। এভাবেই বিপজ্জনকরূপে চিত্রিত হয়ে আসছেন হাজার বছর ধরে নানা প্রক্রিয়ায়।

কিন্তু এখন সেই ধারাবাহিকতা আমাদের কণ্ঠনালীকে ঠেসে ধরতে উদ্যত। আমাদেরই প্রজন্মের কাছে ধীরে ধীরে সেটা দলিল হয়ে উঠেছে। তারাও সে সব শুনছে, শিখছে, পড়ছে। এ পরিস্থিতিটা শত্রুদের জন্য সুব্যাপক সহায়তা। এর ফলে যুদ্ধ ছাড়াই তারা যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে। হেরে যাচ্ছি আমরা। হেরে যাচ্ছে আমাদের প্রকৃত প্রাণসত্তা। মিথ্যার অন্ধকারে চাপা পড়ে যাচ্ছে ইতিহাসের রত্নতম দিগন্ত। এ পরাজয় ঠেকাতে হবে। থামিয়ে দিতে হবে বৈরী তরঙ্গ। উল্টিয়ে দিতে হবে স্রোতের গতি। উপড়ে ফেলতে হবে সত্যকে আবৃত করে ফেলা মিথ্যার আস্তরণ।

কাজটি সহজ, তা ভাবলে ভুল হবে। দিগন্তকে ঢেকে ফেলেছে যত আবর্জনা তা প্রথমে সরাতে হবে। তারপর শুরু করতে হবে মাটি খনন। অনেক গভীর পর্যন্ত যেতে হবে। যেখানে সত্যের সোনার খনি। যেখানে হিরে মোতি পান্নার সমাহার। সেই খনি আবিস্কার না করলে আমাদের প্রকৃত স্বরূপকে পৃথিবীর কাছে উদ্ভাসিত করা যাবে না। সেজন্য একটি প্রজন্মের জীবনকে যদি কোরবানী করতে হয়, হোক না। আমাদের ইতিহাসকে অন্ধকারের আলকাতরা দিয়ে ঢেকে ফেলতে যদি শত্রুরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম সপে দিতে পারলো, তাহলে আমরা আমাদেরই গুপ্তধন বের করে আনতে কেন পারবো না একটি প্রজন্মকে নবতর এক জিহাদের ময়দানে পাঠিয়ে দিতে? নিশ্চয়ই পারা উচিত। কেননা, আমরা বাঁচতে চাই। পরাজিত হতে হতে এবং মার খেতে খেতে এবার চাই জীবনের জন্য ঘুরে দাঁড়াতে।

কিন্তু ঘুরে দাঁড়াতে চাই বললেই ঘুরে দাঁড়ানো হয় না। এটা হটকারী হামলার মতো নয় যে সিদ্ধান্ত নিলাম এবং সুযোগ তৈরি করে জীবন দিয়ে দিলাম। এটা একটা অব্যাহত ধারাক্রম। শুরু করতে হবে, কিন্তু শেষ তার সহজে আসবে না। ইসলামের ইতিহাসের যে কোনো পর্যায়কে নিয়ে শুরু করা যায়। সাফল্য মাটির নিচে। দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আছে। যেমন বাংলাদেশে ইসলামের আগমনকে দৃষ্টান্ত দাঁড় করাতে পারি। সবাই জানতো ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মদ বখতিয়ার

খিলজীর ঘোড়ার দাপড়ে বাংলাদেশে ইসলাম এসে জায়গা করেছে। কিন্তু সেটা যে সত্যের পুরোটা নয়, তা প্রমাণ হলো এক কৃষকের আবিষ্কারে। কৃষক মাটি খুঁড়ে পেয়ে গেলেন এক মসজিদ। হিজরী প্রথম শতকের মসজিদ। সেই সূত্র ধরে খুঁজতে খুঁজতে দেখা গেলো বাংলাদেশে ইসলাম এসেছে রাসূলে কারীমের সা.'র জীবদ্দশায়।

বিষয়টা দু'টি কারণে উৎসাহব্যঞ্জক। প্রথমত ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে বের করার অভিযান শুরু হলে সাফল্যের উপাদান চতুর্দিক থেকে হাত বাড়িয়ে সহযোগিতা করবে। দ্বিতীয়ত সত্যের আবিষ্কারে মুহূর্তেই নির্বীর্য হয়ে যাবে হাজার বছরের বিভ্রান্তির অন্ধকার। কাজটি শুধু মুসলিম অমুসলিমের ভুল-বুঝাবুঝি অপনোদনেই সহায়ক হবে না; বরং সৃষ্টি করবে সৌহার্দ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের বলয়। নির্মাণ করবে শান্তিপূর্ণ এক আস্থার পরিমণ্ডল। এজন্য বলি বিদ্বেষ বিষাক্ত এই পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস নিকষ রাতের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে এলে বিশ্বশান্তি একটি সমুদ্র অতিক্রম করবে। সেই কাজে একটি প্রজন্মকে দাঁড়াতে হবে, যারা লড়াই করবে ইতিহাসের বুকের উপর চেপে বসা কালো রাতের বিরুদ্ধে।

(ডিসেম্বর, ২০১১ ঈ.)

প্রাচ্যবিদদের গরল গোলামদের ইসলামচর্চা (৩)

বিচারপতি ছিলেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হবার ভাগ্যও হয়েছিলো। সেই সুযোগে ইসলামী চেতনাকে যথাসম্ভব ঝাঁকুনি দেয়ার কুশেশ কম করেননি। বিসমিল্লাহির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হয়েছেন। ইসলামী আদর্শবাদী রাজনীতিকে কবরস্থ করার তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। পারেননি। কিন্তু তার ধর্মনিরপেক্ষ বিবেক অন্তত এ সান্ত্বনা পাবে যে, চেষ্টাটা তিনি করেছেন। কাজ-কর্মের দ্বারা একজন ধর্মনিরপেক্ষ নাস্তিক হিসবে নিজেকে প্রমাণ করলেন। তার কথা-বার্তা, লেখা-জোখা, জীবনধারা, সবই এ পরিচয়কে শক্তিশালী করলো। পরে যখন অবসরে গেলেন পুরোপুরি, প্রগতিশীলতার আবরণে নাস্তিকতার পোষাক তখনও তার গায়ে। লেখালেখির মাত্রা বেড়ে গেলো। বিশ্বাসী মানুষের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও ঈমানী চেতনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ফুঁসফুঁস করতো তার কলামগুলোতে। কিন্তু যাক!

হঠাৎ করে তিনি সেজে গেলেন ইসলামী চিন্তাবিদ ।! কোরআন বিশেষজ্ঞ! কোরআন শরীফের ভাষ্য লিখে ফেলেছেন। তবে কোরআন শরীফকে তিনি কোরআন শরীফ বলতে রাজী নন। একটি বই লিখেছেন, নাম দিয়েছেন– 'কোরান তথ্যকোষ'। ইসলামী জ্ঞান সন্ধানে তার সফর কাবার দিকে এগোয় না, ফলে তার জানা-শোনার উৎস হয় পেঙ্গুইন কিংবা অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত কোনো ঝকঝকে ইংরেজী বই। সীরাত নিয়ে নাকি তার কলম বেশ এগুচ্ছে। তার এসব কাজ-কাম একটি বিশেষ মহলকে খুবই আনন্দ দিয়েছে। যারা ইসলামের গন্ধ পেলেই হায় হায় করে উঠেন, তারাই তাঁর লেখা-জোখা ছাপছেন, প্রচার করছেন।

আমরা এর নিন্দা করি না। তবে এটা জানি যে, এই সব লোক ইসলামী বিষয়ে লিখতে বলে কী প্রসব করবেন, তাদের শষ্যক্ষেত্রে ধানের চারা কয়টা আর আগাছা কয় হাজার জন্মাবে, এ নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন পড়বে না। সমাধান মিলবে এ ধারায় তাদের পূর্বসূরীদের কীর্ত্তিকাণ্ড লক্ষ করলেই। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মুসলমান না হয়েও কোরআন তর্জমা করেছেন। যথেষ্ট বিভ্রান্তি সত্তেও তার এ প্রচেষ্টাকে আমরা বাহবা দেই। তবে তার তর্জমা যেহেতু নির্ভরযোগ্য নয়, তাই ভুলগুলোকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে নানা গ্রন্থে।

ইসলাম মানেন না কিংবা অন্য ধর্মাবলম্বী, এমন লোকদের ইসলাম চর্চা বহু পুরনো ব্যাপার। শত শত ইহুদী-খৃস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, শিক-জৈন ইসলাম চর্চা করেছেন। বহু মহৎ অবদান তারা রেখেছেন। বিশেষত পশ্চিমা পণ্ডিতদের একটা অংশ এ কাজে জীবনপাত করেছেন। তারা সীরাতসহ অন্যান্য বিষয়ে শত শত বই লিখেছেন। এদের একটা অংশ ছিলো সরাসরি ক্রুসেডার। কেউ কেউ ক্রুসেডের উত্তরাধিকার বহনকারী। ক্রুসেডাররা অস্ত্র দিয়ে ইসলামকে হত্যা করতে পারেনি। সেই আক্ষেপ ও অপ্রশমিত ক্ষোভ নিয়ে এরা কলমের খোঁচায় ইসলামের প্রাণসত্তাকে খুন করার কাজে নেমেছিলেন। এদের বর্ণনাপদ্ধতি ছিলো খুবই নান্দনিক, বিশ্লেষণপদ্ধতি ছিলো খুবই চাতুর্যপূর্ণ, কাজে ছিলো খুবই যত্ন, আঘাত ছিলো খুবই সুক্ষ্ম, কিন্তু এর প্রভাব ছিলো সর্বনাশা। সম্প্রতি যে সব সেক্যুলার মুসলিম বুদ্ধজীবি ইসলামী জ্ঞান চর্চা করতে অগ্রসর হচ্ছেন, তারা মূলত এইসব প্রাচ্যবিদের দ্বারাই অনুপ্রাণিত। এদের বক্তব্যকে তারা সর্বোচ্চ মূল্য দিতে অভ্যস্ত এবং এদের চিন্তার কক্ষপথে তারা আবর্তন করেন অনবরত। প্রাচ্যবিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আবেগের তোড়ে এই অনুকারীতার ফল যে কতো [illegible], এটা ভাবার হুশটুকুও তারা হারিয়ে ফেলেন।

এই ভয়াবহতাই প্রকাশ পেলো ড. আবদুস সামাদের এক লেখায়। 'ধর্ম ও মুক্তবুদ্ধি' শীর্ষক এক প্রবন্ধে তিনি দাবি করেছেন- 'ইসলামের নবী সা. এতোই প্রখর দৃষ্টি, উদার ও প্রতিভাবান ছিলেন যে, 'মাত্র বারো বছর বয়সে বুহায়রা পাদ্রীর সান্নিধ্যে ধর্মের যে গুঢ়তত্ত ও অনুভব করলেন, একে তিনি পরবর্তী জীবনে কী সুনিপুন সাফল্যে সুশোভিত করে তুললেন।'

আবদুস সামাদ রাসূলে পাকের সা. প্রশংসাই তো করলেন। কিন্তু এ হচ্ছে নির্বোধ এ নির্জ্ঞানের বিপজ্জনক প্রশংসা। অথবা এ হচ্ছে প্রশংসাচ্ছলে ইসলামের সত্য ও হেদায়েতকে রাসূল সা. কর্তৃক উদ্ভাবিত বলে দাবি করার ধূর্ততা। তবে এ ধূর্ততার জন্য আবদুস সামাদ কৃতীত্ব দাবি করতে পারবেন না। আমার মতে এটা কৃতিত্ব দাবীর জন্য তার কোনো চালাকি নয়, বরং সৎভাবেই তিনি পূর্বসূরী প্রাচ্যবিদদের বক্তব্যকে ব্যাক্ত করেছেন মাত্র। এর ভেতরে গরল আছে কী না, ভেবে দেখেননি। তিনি আসলে স্যার উইলিয়্যাম ম্যুর কর্তৃক প্রভাবিত হয়েছেন। উইলিয়াম ম্যুর মিথ্যা ও আজগুবি কাহিনীসমূহ জড়ো করে চরম বিদ্বেষ বিষাক্ত এক বই লিখেন- 'দি লাইফ অব মুহাম্মদ। এ বইয়ে মিথ্যা ও ভ্রান্তির মাত্রা এতো বেশি ছিলো যে, মুসলিম চিন্তাবিদ স্যার সৈয়দ আহমদ একে চ্যালেঞ্জ করে পাল্টা এক বই লিখেন- লাইফ অব মুহাম্মাদ সা.। এতে ম্যুর সাহেবের প্রতিটি মিথ্যাকে উদঘাটন করা হয়। সৈয়দ আহমদের জবাবে কলম উঠাবার সাধ্য আর ম্যুরের হয়নি। এক যুগ পরে অনেক মিথ্যা বাদ দিয়ে লাইফ অব মুহাম্মদের দ্বিতীয় সংস্করণ তিনি প্রকাশ করেন। স্বীকার করেন প্রথম সংস্করণে তথ্যগত ভ্রান্তি থাকার কথা।

আবদুস সামাদ সাহেবের এসব জানার দরকার নেই। তিনি দেখেছেন উইলিয়াম ম্যুর, ড্রেপার, মারগোলিয়থ প্রমূখ প্রাচ্যবিদ বুহায়রা পাদ্রীর বিষয়টাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। একে নবীয়ে পাক সা. এর জীবনের মূল প্রভাবক হিসেবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বুঝাতে চেয়েছেন রাসূল সা. ওহী হিসেবে যা প্রচার করেছেন, তা মূলত বিভিন্নভাবে অর্জিত জ্ঞান-গরিমার সমাহার। বিশেষ করে বিভিন্ন দেশ সফরের মাধ্যমে তিনি প্রাজ্ঞ হয়ে উঠেন। একে প্রমাণের জন্য তারা বহু মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেন। যেমন লুইস লামায়া লিখেন- রাসূল সা. সমুদ্রপথে একবার মিসর ভ্রমণ করেছিলেন। সমুদ্রের তরঙ্গ, জাহাজের ছুটে চলা, সামুদ্রিক ঝড়ের ধেয়ে আসা ইত্যাদিক স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন। ফলে পরবর্তি জীবনে কোরআনের সমুদ্রের বিচরণ ও জাহাজের যাত্রা ইত্যাদির বর্ণনায় এর প্রভাব আমরা লক্ষ্য করি।

কতো বড় মিথ্যা, চিন্তা করুন। রাসূলে কারীম সা. মিসরে গিয়েছিলেন, এর কোনো দূরতম ইঙ্গিতও কোনো প্রমাণ্য ইতিহাসে নেই। এর কোনো সম্ভাবনাও তখন ছিলো না। কিন্তু প্রাচ্যবিদ লোকটি আজগুবি এক কাহিনী ফেদে নিলো। ভাগ্য ভালো, আবদুস সামাদ সাহেব এই মিথ্যার খপপরে পড়েননি।

তিনি যে কাহিনীর প্যাচে পড়েছেন, সেটা অবশ্য প্রসিদ্ধ ঘটনা। ঘটনাটি হলো হুজুর সা. বারো বছর বয়সে চাচা আবু তালিবের সাথে বাণিজ্যোপলক্ষে দামেশক সফরে যান। বসরা শহরে বুহায়রা নামক এক খৃস্টান পাদ্রীর আস্তানায় উপস্থিত হলেন। বুহায়রা রাসূল সা.কে দেখে বললেন– ইনিই হচ্ছেন সেই নবী, যার প্রতিশ্রুতি ইঞ্জিল শরীফে আছে। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। লোকেরা বললো– আপনি তা বুঝলেন কীভাবে? বুহাইরা বললেন– তোমরা যখন পাহাড় থেকে নামছিলে, তখন সমস্ত গাছ ও পাথর তার সম্মানে সেজদা করছিলো। ঘটনাটি এখানেই শেষ।

মাত্র অল্পসময়ের সাক্ষাৎ। হুজুর সা. সাথে বুহায়রার কোনো কথাবার্তা হয়নি। কোনো কিছু শিক্ষা নেয়া-দেয়ার তো প্রশ্নই উঠে না। এ ছাড়া এ কাহিনীর মূলভিত্তিটাও প্রশ্নবিদ্ধ। প্রথম যিনি একে বর্ণনা করেছেন, তিনি ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন না। তিনি কার কাছে ঘটনাটি শুনেছেন, তাও উল্লেখ করেননি। যতসূত্রে ঘটনাটি বর্ণিত, সব সূত্রই মুরসাল। ইমাম তিরমিযী রহ. এ বর্ণনাটিকে হাসান ও গরীব স্যাবস্ত করেছেন। এমনিতেই হাসান বর্ণনার মর্যাদা সহীহ বর্ণনার নিচে। এর উপর তা আবার গরীব তথা একটি মাত্র সূত্রে বর্ণিত। বুঝাই যাচ্ছে বর্ণনাটির মর্যাদা অনেক কম। এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে গাযওয়ান রয়েছেন। কেউ কেউ তাকে নির্ভরযোগ্য বললেও অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে বিশ্বস্ত মনে করেন না। মীযানুল ই'তেদাল গ্রন্থে ইমাম যাহাবী রহ. তাকে অযোগ্য হাদীস বর্ণনাকারী সাব্যস্ত করেছেন। আর বুহাইরা বিষয়ক বর্ণনাটিকে তার সবচে বড় মুনকার বলে অভিহিত করেছেন। এ হাদীসে হযরত বেলাল ও আবু বকর রা.কে রাসূল সা. এর ভ্রমণসঙ্গী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ এটা সম্পূর্ণ অবাস্তব। এমনটি হওয়ার কোনোই সম্ভাবনা ছিলো না। ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বর্ণনাকারীদের সম্মান রক্ষার্থে একে শুদ্ধ বলে উল্লেখ করলেও ইবনে গাযওয়ানের প্রতি সন্দেহ পোষণ করেছেন।

তাহযীবুত তাহযীব গ্রন্থে লিখেছেন– 'তিনি ভুল করতেন।' এ ছাড়া বানোয়াট হাদীস তৈরিকারী মামালীকের কাছ থেকে তিনি শুনে শুনে বর্ণনা করতেন। অনুরূপভাবে ইমাম হাকিম রহ. মুস্তাদরাক গ্রন্থে একে গ্রহণযোগ্য অভিহিত করলেও পরবর্তী বিশ্লেষণে এ হাদীসের কোনো কোনো দিককে বানোয়াট বলে উদঘাটন করেন।

এ রকম একটি দুর্বল, সন্দেহজনক ঘটনা নিয়ে প্রাচ্যবিদরা যে মাতামাতি করেছেন তা বিস্ময়কর। স্যার উইলিয়াম ম্যুর তার লাইফ অব মুহাম্মদ গ্রন্থে লিখেন –' সিরিয়ার বুহায়রা পাদ্রী মুহাম্মদ সা. একত্ববাদের শিক্ষা দিলো। মুহাম্মাদ সা. অসাধারণ উপলব্ধি এই শিক্ষার মূলতত্ত্বকে নিমিষেই গ্রহণ করে নিলো। পরবর্তি জীবনে তিনি একত্ববাদী হয়েই থাকলেন। মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে ঘৃণার প্রচার করলেন। বুহায়রার শিক্ষা কতো গভীরভাবে তাকে প্রভাবিত করেছিলো, এর প্রমাণ এতেই নিহিত।' পাদ্রী মন্টোগোমারি ওয়াট তো আরেক কাঠি সরস। তিনি এ ঘটনাকে অভিহিত করলেন আরবে নতুন ধর্মীয় বিপ্লবের সুতিকাগার হিসেবে।

প্রাচ্যবিদরা একে নানাভাবে রঙ চড়ায়, চড়াক। কারণ তারা এর দ্বারা প্রমাণ করতে চায় রাসূলে পাক সা. ওহীর যে শিক্ষা প্রচার করেছেন, তা খোদার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত নয়। বরং বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার সমাহারকে তিনি কোরআনের মাধ্যমে ভাষারূপ দিয়ে বিন্যস্ত করে ধর্মপ্রবর্তন করেছেন। অমুসলিম প্রচারকরা এ মিথ্যা রচনা ও রটনা করেছে, তাদের ক্রুসেডীয় মতলবে। কিন্তু মুসলিম নামধারী কেউ যখন এই প্রচারণার পালে হাওয়া দেন, তখন বুঝাই যায় ক্লাইভের সন্তানেরা মুসলমানদের ভেতর থেকে নতুন মীর জাফর খুঁজে পেয়েছে। তবে আবদুস সামাদ যদি ভুলবশত এই মিথ্যার খপপরে পড়েন, তবে তিনি মীর জাফর সাব্যস্ত হবেন না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো ইসলাম চর্চা করবেন, সীরাত নিয়ে আলোচনা করবেন, তো ইসলামী সূত্রসমূহ থেকে করুন। নাস্তিক্যবাদী মন নিয়ে ইসলাম চর্চা করবেন, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের মুল্লা-প্রতিক্রিয়াশীল সাব্যস্ত করে ক্রুসেডারদের বমিকে মুখে উঠাবেন, তাদের গরলকে উদগীরণ করবেন, এ হঠকারিতা আর কতো?

কিন্তু হঠকারিতাকে আজ প্রগতি বিবেচনা করে খুবই মূল্য দেয়া হচ্ছে। যারা এ কাজ করছেন, তাদের এক শ্রেণি ইসলামকে হত্যার জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। আরেক শ্রেণি নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়াচ্ছেন। এদের বাজার কম গরম নয় এখন। টাইমসের মত পত্রিকাও গজিয়ে উঠা এইসব ইসলামী চিন্তাবিদদের নিয়ে যখন প্রশংসাভরা প্রতিবেদন ছাপে তখন সাম্রাজ্যবাদের প্রিয়ভাজন হতে আগ্রহী কে না চাইবে এ রাস্তা ধরে এগিয়ে যেতে? সত্য না মিথ্যার চর্চা হচ্ছে সেটা বিবেচ্য নয়, যখন এ জাতীয় গবেষণায় নামলে ভাগ্য বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা ষোলআনা !!

(রচনা – সেপ্টেম্বর, ২০১১)

প্রাচ্যবিদদের গরল ও গোলামদের ইসলামচর্চা (৪)

সৈকত আসগরের কোন উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম আমার নজরে পড়ে নি। এক সময় নজরুল গবেষক হবার চেষ্টায় ছিলেন। "গদ্যশিল্পী নজরুল" নামে একটি বই লিখেছিলেন। বইটিতে প্রতিভার ঝিলিক ছিলো, কিছু উন্মোচক বৈশিষ্ট ছিল। ভালো এক প্রতিশ্রুতি ছিলো। কিন্তু পরে সেই প্রতিশ্রুতি তার মধ্যে বেঁচে থাকেনি। বিখ্যাত হবার মোহ তাকে অস্থির করে তুলে। নানাদিকে ঘুরবৃত্তির প্রবণতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত তিনি মনে করেন ইসলাম নিয়ে কথা বলার ক্ষমতা তার হয়েছে। নিজের ক্ষমতা যেখানে কিছুটা ছিল, সেখানে লেগে থাকলে তিনি তৃতীয় সারির একজন নজরুল গবেষক হতে পারতেন। কিন্তু সিভিল সোসাইটিতে স্থান পাবার মোহ তাকে যে দিকে নিয়ে গেলো, সেদিকে তার কোন সাফল্য এলো না। এক ধরনের হতাশা তাকে শেষ পর্যন্ত ইসলাম নিয়ে গবেষণায় প্রণোদিত করলো। প্রাচ্যবিদদের আবর্জনা ঘাটাঘাটি ছাড়া এক্ষেত্রে তিনি কিছুই করেননি। ফলে শেষ পর্যন্ত একজন আবর্জনা বিশারদ হিসাবে

নিজেকে "বিশেষ এলাকায়" তৃতীয় সারির এক প্রিয়জনে পরিণত করতে সক্ষম হন।

আসগর সাহেব চালাক, এতে সন্দেহ নেই। তিনি এমন সব জায়গায় তীর ছুঁড়েন, যার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে নেতিবাচক হতে বাধ্য। আবেদনময় ক্রিয়া দ্বারা আলোচিত হওয়ার পরিবর্তে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়াকে উস্কে দিয়ে আলোচিত হবার ঘোড়ারোগ বরাবরই কিছু লোকের থাকে। ওদের কেউ কেউ জনতার কাছে নিন্দিত ও ধিকৃত হয়ে লক্ষ্য পূরণ করে। কেউ কেউ যথেচ্ছ বকাবকি করে। কেউ কেউ পাণ্ডিত্ব ও বুদ্ধিবৃত্তির খোলসের আড়ালে থাকতে ভালোবাসে। আসগর সাহেবের খোলস আছে। তিনি পাণ্ডিত্বের ভান করে লিখেছেন "কাবা প্রচীন গৃহ এটা কথার কথা। ইতিহাস নয়। ইসলামে মিথ গ্রহণীয় না হলেও কাবার প্রচীনত্বের ধারণা বিশ্বাসের মর্যাদা পেয়ে আসছে। কোনোভাবে যদি ইতিহাসের স্বীকৃতি এর পক্ষে থাকত, তাহলে অন্তত মুখরক্ষা হতো। কিন্তু কই?"। (মিথ ও ধর্মবিশ্বাসঃ দৈনিক জনকণ্ঠ ৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮)

প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে তার প্রশ্নটি তার প্রতি উচ্চারণ করতে হয়। বলতে হয়- কোনভাবে যদি ইতিহাসের স্বীকৃতি এর বিপক্ষে হতো তাহলে অন্তত আসগর সাহেবদের মুখ রক্ষা হতো। কিন্তু কই?

ইতিহাস কখন প্রমাণ করলো কাবা প্রাচীন নয়? কোথায় তিনি পেলেন এ তত্ত্ব? পবিত্র কুরআনের পাঠক মাত্রই জানেন আল্লাহর পরিস্কার ঘোষণা- "মানবজাতির জন্য প্রথম যে পবিত্র ঘর নির্মিত হয়, তা হচ্ছে এ বাক্কায় প্রতিষ্ঠিত ঘর"।

বাক্কার পরিচয় স্পষ্ট করে ওল্ড টেস্টামেন্ট। যে কোন মনোযোগী পাঠক তার ৬ষ্ঠ খণ্ডে পড়ে থাকবেন- "বাক্কার উপত্যকা অতিক্রম করার সময় একটি কূপের কথা বলা হয়, যা বরকত ও কল্যাণের দ্বারা মাওরাকে বেষ্টন করে রেখেছে।" দাউদ (আ.) প্রার্থনা করেছেন- "ওগো মহান!" সকল বাহিনীর প্রভূ। তোমার ঘর কতো মধুর, কতো আনন্দময়! আমার হৃদয় মন আল্লাহর ঘর দেখতে উদগ্রীব। আল্লাহর ঘরের প্রেমিক হে প্রভূ! তোমার নামে তোমার দাস যেখানে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছিলো, সে জায়গা কতো মহান। প্রভূ! ধন্য হোক তারা যারা সর্বদা তোমার ঘরে অবস্থান করছে। তোমার নামের পবিত্রতা ঘোষণা করছে।"

বাইবেল স্পষ্ট করল পবিত্র কূপ এর অবস্থান যেখানে, সেখানেই মক্কা। সেখানে আছে মাওরা তথা মারওয়া। সেখানে জীবন বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল খোদার দাস, সেখানে পবিত্র ঘর। সে ঘর এতো মহান, যাতে দাউদ (আ.) গিয়ে

ধন্য হতে চান। তাহলে দেখা যাচ্ছে বাইবেলের বাক্কা জমজম কূপ, ইসমাঈল (আ.)এর কোরবানী স্থল, মারওয়া, এবং পবিত্র ঘরের অধিকারী। অতএব বাক্কা যে মূলত মক্কা, তা কারো কাছে অস্পষ্ট নয়। আরবরা হুজুর (সঃ) এর আবির্ভাবের বহু আগ থেকেই মক্কাকে বাক্কা হিসাবে অভিহিত করতো। বাক্কা দ্বারা কাবা ঘর বুঝাতো, মক্কা দ্বারা গোটা শহর বুঝাতো। আরবী ভাষাবিদগণ কাবা সন্নিহিত নিষিদ্ধ এলাকাকেই বাক্কা হিসেবে অভিহিত করেছেন। কেউ কেউ বাক্কা বলতে গোটা শহর বুঝিয়েছেন। সেই বাক্কায় নির্মিত হয় হয় মানবজাতির প্রথম গৃহ। যার প্রাচীনতার সাক্ষ্য দিচ্ছে ওল্ড টেস্টামেন্ট। সুতরাং কা'বার প্রাচীনত্ব ধর্মগ্রন্থের সত্য, বিশ্বাসের সত্য। মিথ বা কিংবদন্তি নয়।

কিংবদন্তির উৎস লোকশ্রুতি। যা নিশ্চিত সত্যের সাথে চলতেই পারে না। তা রূপান্তরিত হয় এবং মুখের রটনা দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। বিশ্বাসের সত্য সর্বদাই এক ও অপরিবর্তনীয়। সে জীবন পায় ঐশী উৎস থেকে। কা'বার প্রাচীনত্ব ঐশী উৎস থেকে প্রমাণিত। একে তাই ধারণা হিসেবে উপস্থাপন করা এক ধরনের শঠতা। মিথ হিসেবে হাজির করা স্পষ্ট দূরভিসন্ধি। এর লক্ষ্য হলো ইসলামের প্রতিষ্ঠিত সত্যকে সন্দেহের জায়গায় নিয়ে যাওয়া। কুরআনের বক্তব্যকে অনৈতিহাসিক ও লোকশ্রুতির কথা হিসাবে চিহ্নিত করা।

এটা মূলত চরম ইসলামবিদ্বেষী এক শ্রেণির ইহুদী-খ্রিস্টান প্রাচ্যবিদের প্রকল্প। তারা ইসলামচর্চার নামে ইসলামের ভীতকে ধ্বসিয়ে দেয়ার কৌশলী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা অসংখ্য বিষয়ে সন্দেহের ধুলো-বালি ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করছে। ছোট-বড় কোন কোন কিছুকেই বাদ রাখেনি। তার মধ্যে কা'বার প্রাচীনত্ব এক নতুন সংযোজন। বিষয়টি নিয়ে প্রথমে মাঠে নামেন ইহুদী প্রাচ্যবিদ মারগোলিয়থ। তিনি রটনা করেন কা'বার প্রচীনত্ব অস্বীকারের তত্ত্ব।

নিরেট এক বিভ্রান্তির জঠর থেকে এর জন্ম। মারগোলিয়থ তার 'মুহাম্মদ' প্রবন্ধে লিখেছেন- "যদিও ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মুসলমানগণ বিশ্বাস করেন তাদেও ধর্মীয় কেন্দ্র অতিপ্রচীনকালে নির্মিত; কিন্তু বিশুদ্ধ বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, মক্কার সর্বাধিক প্রাচীন গৃহটি মুহাম্মদ (স.) এর মাত্র কয়েক পুরুষ পূর্বে নির্মিত হয়েছিলো"।

দাবির সমর্থনে তিনি উদ্ধৃতি দেন জালাল উদ্দিন সুয়ূতীর (রহ.) 'আল ইসাবা ফি তাময়িযিস সাহাবা' গ্রন্থের। অথচ ইসাবা গ্রন্থ মারগেলিয়থের দাবীকে প্রমাণ করে না। সেখানে লেখা আছে- 'মক্কার সর্বপ্রথম পাকা গৃহ নির্মাণ করেন সাঈদ ইবনে ওমর অথবা সাআদ ইবনে ওমর।'

এর অর্থ কি সাঈদ ইবনে ওমর কাবার প্রথম নির্মাতা। তিনিই প্রথম পাকা গৃহ নির্মাণ করেন। এর আগে মক্কায় কেউ এমনটি করেনি। কারণ কাবাগৃহের

আশেপাশে পাকা ঘরবাড়ি নির্মাণ করাকে আরবরা কাবার অপমান মনে করতো। তারা বসবাস করতো তাবু ও সামিয়ানা টাঙ্গিয়ে। এ কারণে যুগ যুগ ধরে মক্কায় কোন পাকা ঘর নির্মিত হয়নি। গোটা শহর ছিলো বিশাল এক তাবুর নগরী। সর্বপ্রথম এ প্রথা যিনি ভঙ্গ করেন, তিনি সাঈদ ইবনে ওমর। সুয়ুতী এ কথাই বলতে চেয়েছেন।

এ কথাই প্রমাণিত হয় তাবারী, ইবনুল আসির, ইবনে হাযম সহ অসংখ্য ঐতিহাসিকের ভাষ্যে। কিন্তু সৈকত আসগর এ সব ভাষ্যের সহায়তা নেবেন কেন? সত্য তো তার লক্ষ্য নয়। তিনি চেয়েছেন ইসলামবিদ্বেষী মহলের সন্তুষ্টি। অতএব মালগোলিয়াথদের সাথে কণ্ঠ না মেলালে কীভাবে হয়। তার জানা উচিৎ ছিলো মারগোলিয়থ এ তত্ত্ব বাজারজাত করতে গিয়ে ইতিহাসের শক্ত মার খেয়েছেন।

ইনসাইক্লোপোডিয়া অব ব্রিটানিকায় 'মুহাম্মদ' শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি দাবী করেন- "প্রাচীন ইতিহাসে মক্কা শহরের কোন নাম নিশানা পাওয়া যায় না। যবুরের এক জায়গায় ওয়াদিয়ে বাক্কার উল্লেখ আছে মাত্র।" কিন্তু ইনসাইক্লোপিডিয়ার আরেক প্রাবন্ধিক ফরাসী প্রাচ্যবিদ ডুজি ভিন্ন এক প্রবন্ধে প্রমাণ করেন- বাক্কা হচ্ছে সেই স্থান, যাকে গ্রীক ভূগোলবিদগণ মকরুবা বলে উল্লেখ করেছেন। এর মানে হাজার হাজার বছর আগেও গ্রীকদের গ্রন্থে এর উল্লেখ ছিল!

প্রাচ্যবিদ টমাস কার্লাইল তার হিরো এন্ড হিরোজ ওয়ারশিপে জনাচ্ছেন- ঈসা মসীহের (আ.) জন্মের ৫০ বছর আগে জনৈক রোমান ঐতিহাসিক কাবা গৃহের আলোচনা করতে গিয়ে লিখেন- এ উপসনালয় দুনিয়ার সকল উপাসনালয় থেকে প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ। কাবাগৃহ যদি ঈসা (আ.) এর জন্মের বহুকাল আগে বিদ্যমান থাকে, তাহলে মক্কাও হবে সেকালের এক নগরী।"

ইয়াকুব হামাভীর মু'জামুল বুলদানের উদ্বৃতি রয়েছে মারগোলিয়াথের বিভিন্ন রচনায়। অথচ এ গ্রন্থে হামাভীর ভাষ্য- "প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত বাৎলামিয়োসের ভৌগলিক বর্ণনামতে মক্কার দৈর্ঘ-প্রস্থ ছিলো নিম্নরূপ- দৈর্ঘ্যঃ ৮৭ ডিগ্রী, প্রস্থঃ ৩ ডিগ্রী"। অতি প্রাচীন গ্রন্থকার বাৎলামিয়োসের গ্রন্থে মক্কার উল্লেখ থাকার পর আর কোন যুগের প্রাচীন গ্রন্থে তা থাকলে মারগোলিয়থের কাছে তা "প্রাচীন" হতো?

এসব প্রশ্নের কোন জবাব সৈকতদের কাছে পাওয়া যায় না। ওরা বিবেকী কোন জিজ্ঞাসাকে ঘৃণ্য অভিধায় উড়িয়ে দিয়ে মুখ রক্ষা করতে চায়। বরাবরই বিপরীত দিক থেকে উচ্চারিত সত্যের মুখোমুখি না হয়ে উচ্চারণকারীকে লাঞ্ছিত ও অগ্রহণযোগ্য করার চাল আঁটে এবং মিথ্যার উপর আরো বেশী মিথ্যার স্তুপ তৈরী করে। ভেতরে ভেতরে ওরা যতোই ফোকলা হয়, ততোই হম্বিতম্বির

মাধ্যমে দুর্বলতাকে আড়াল করতে চায়। অসহিষ্ণু ও উদ্ধত কণ্ঠস্বরে উন্মত্ততা প্রদর্শন করে। আর এর ফাঁকে নিজেদের মুখোশ কখন যে খসে পড়ে, তা ওরা টেরই পায় না। কীভাবে যে ওরা নিজেদের ঘৃণ্য স্বরূপ নিজেরাই ফাঁস করে দেয়, তা বোঝার হুঁশ তখন কাজ করে না।

যেমনটি ঘটেছে সৈকতের ক্ষেত্রে। মিথ ও ধর্ম নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ইসলামের জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর। বুঝাতে চাইলেন ইসলাম বিশ্বমানবতার জ্ঞানসম্পদের শত্রু। দেখাতে চাইলেন দর্শনগতভাবে ইসলাম বিশ্বজনীন জ্ঞানরাজীকে প্রয়োজনের বাইরের জিনিস হিসেবে দেখে। এর ধ্বংস কামনা করে। নিজের দাবীকে প্রতিষ্ঠা দিতে তিনি হানা দিলেন ওমর (রা.) এর শাসনামলে। মিসর বিজয়ের পরে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ধ্বংসের উদ্ভট গল্প আওড়ালেন। "ইসলামেরে মিসর জয় লাইব্রেরির ভাগ্য নির্ধারণ করে দিলো। তার বেঁচে থাকার দিন শেষ হয়ে এলো। কারণ যে বিদ্যা কুরআনে নেই তা হারাম। লাইব্রেরিতে কুরআনের বিদ্যা ছিলো না। ফলে তার বেঁচে থাকার প্রশ্নই উঠে না। অতএব খলিফার আদেশ -লাইব্রেরি ধ্বংস করে দাও। বিশ্বের কোন জ্ঞানই প্রয়োজনীয় নয়। যেহেতু কুরআন আছে"।

একদম মিথ্যাচার। আগাগোড়া বিভ্রান্তি। হযরত ওমর (রা.)এর মিসর জয়ের সময় আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির কোন অস্তিত্বই ছিলো না। রোমান সেনাপতি জুলিয়াস সিজার আলেকজান্দ্রিয়া অবরোধ করলে তার সৈন্যরা আগুন লাগিয়ে লাইব্রেরিটি নষ্ট করে দেয়। এটা ছিল তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ লাইব্রেরি। সাত লক্ষ পুস্তক ছিল এতে। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম টলেমি। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩-৫০ সাল পর্যন্ত বিজয়ী জুলিয়াস মিসরে অবস্থান করেন। তার সাক্ষাৎ হয় মিসরের রাণী ক্লিউপেট্রার সাথে। ভেনি, ভিডি, ভিসি (এলাম, দেখলাম, জয় করলাম) পর্ব সেরে সিজার চলে যান মিসর থেকে। রাণী ক্লিউপেট্রার আমলে পারগামস নামক দার্শনিক ও মার্ক এন্টনির চেষ্টায় আংশিকভাবে লাইব্রেরিটি জীবন ফিরে পায়। এভাবেই চলে প্রায় ৪০০ বছর। ৩৯১ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট থিওডিরাস লাইব্রেরিটিকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। কারণ আর্কবিশপ থিউফিলাস তাকে আদেশ করেন অখ্রিস্টান গ্রন্থাবলিতে ভর্তি এ লাইব্রেরি খ্রিস্টজগতে ধর্মহীনতা ছড়াবে। তাই একে পূর্ণভাবে শেষ করে দিতে হবে। থিওডিরাস লাইব্রেরীটির কোনো চিহ্নই বাকি রাখলেন না। তার ধ্বংসকর্মের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন আল্লামা শিবলী নোমানী। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি গ্রন্থে তিনি তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে লাইব্রেরি বিলুপ্ত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ৩৯১ এর পরে তার কোন অবশিষ্টই অস্তিত্বে ছিল না। পশ্চিমা ঐতিহাসিক গীবন সাহেব রোমান সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস গ্রন্থে এ সত্যকে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু

আবুল ফারাজ নামক জনৈক আরব খ্রিস্টান লাইব্রেরি ধ্বংসের আদেশদাতা হিসাবে ওমরের উল্লেখ করে এক গল্প তৈরী করেন। ব্যাস এতোটুকুই। ইউরোপে ভূমিধ্বস প্রচারণা শুরু হলো। ধ্বংসপ্রাপ্ত লাইব্রেরিকে ইসলামের কলঙ্ক হিসেবে অভিহিত করা হলো। সভ্যতা ও জ্ঞানচর্চার শত্রু হিসাবে মুসলিমদের উপস্থাপন করা হলো।

কোন এক নৈয়ায়িক লাইব্রেরি ধ্বংস নিয়ে তৈরী করলো এক ডিলেমা। যাতে দেখা যায়- ওমর (রা.) বলেছেন-

(ক) আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে লক্ষ লক্ষ পুস্তক আছে, সেগুলো যদি কুরআনে নিহিত জ্ঞানরাশির অতিরিক্ত কিছু শিক্ষা না দেয়, তাহলে তা একান্তই অপ্রয়োজনীয়।

(খ) এসকল পুস্তক যদি কুরআনের বাইরের কোনো জ্ঞান মানুষকে শেখায়, তাহলে তা হারাম।

(গ) অতএব কোনো মতেই এগুলো বাঁচিয়ে রাখা যায় না।

নৈয়ায়িকের এ ডিলেমা স্থান পেলো লজিকের গ্রন্থে। এমনকি পাঠ্যপুস্তকেও। কিন্তু ইতিহাসের শুদ্ধ বয়ান যখন এর সবগুলো ভীত ধ্বসিয়ে দিলো, তখন এর অতিউৎসাহী প্রচারকদের চক্ষু চড়কগাছ না হয়ে পারেনি। ঐতিহাসিক শিবলী নোমানি এ ডিলেমাকে চ্যালেঞ্জ করলেন। ভিত্তিহীন এই কেচ্ছার অসারতা উপস্থাপন করলেন। এরপর যে গর্ত থেকে উৎপত্তি, সেখানেই কাহিনীটি সমাধিত হলো। প্রাচ্যবিদরা এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করছে না। কিন্তু গোলামদের চরিত্রই আলাদা। মনিবদের পুরনো বমিকেও তারা অমৃত হিসেবে দেখে। একে তারা মহার্ঘ্য বিবেচনায় উপস্থাপন করে। কিন্তু অচিরেই এর র্দুগন্ধ ভেতরের গোপন কথা প্রকাশ করে দেয়।

ফলে সৈকত আসগরেরা বুদ্ধিজীবিতার নামে কীসের ফেরি করেন, তা বানান করে বুঝিয়ে দিতে হয় না। লোকে লোকে এমনিতেই জানাজানি হয়ে যায়।

(রচনা : ৩-৫-২০০২)

প্রসঙ্গ ভাস্কর্য
হুমায়ূন আহমেদের উদ্দেশ্যে যা লিখেছিলাম

মূর্তি ও ইসলাম একটি আরেকটির প্রতিপক্ষ। যদিও মূর্তি উপাসকদের মূর্তিপূজার স্বাধীনতা ইসলাম দিয়ে থাকে। তাদের প্রতিমা ও উপাসনালয়ের নিরাপত্তা বিধান করে। কিন্তু মুসলিম জীবনে মূর্তির সাথে দূরতম সংশ্রব কিংবা তার প্রতি নূন্যতম আকর্ষণ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য। ইসলামের নবী (সা.) শিখিয়েছেন কোনো মুসলমানকে যদি আগুনে পুড়ানো হয়, কিংবা শুলিতে চড়ানো হয় তবুও যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হয় (মূর্তি ইত্যাদি) সে যেনো তাদের মেনে না নেয়। (মিশকাত শরীফ)

পবিত্র কুরআনে প্রতিমা ইত্যাদিকে "ফিস্‌ক ও রিজ্‌স' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। রিজ্‌স তথা গর্হিত, অপবিত্র ও কদর্যতার প্রতীক। ফিস্‌ক মানে পাপাচার, দুষ্কৃতি ও প্রকাশ্য অপরাধ। এগুলো মানুষের অপমান। মানুষের হাতে গড়া মূর্তি –যার সামনে সে শ্রদ্ধাবনত হয়– তার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনের নির্দেশে এগুলোকে মা'বুদ হিসেবে সে গ্রহণ করে। সঙ্গত কারণেই ইসলাম মূর্তিপূজাকে নিষিদ্ধ করেছে। রাসূলে কারীম (সা.) মক্কা বিজয়ের পর কা'বা ঘরের চারপাশে রক্ষিত মূর্তিসমূহকে নির্মূল করেছিলেন। আল্লাহর রাসূল তখন পাঠ করেছিলেন

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ...সত্য সমাগত, মিথ্যা অপসৃত। বস্তুত মিথ্যা তো অপসৃত হবেই।"

এই সত্যের সমর্থনে রয়েছে সাহাবায়ে কেরামের সাক্ষ্য যা বর্ণিত আছে সিহাহ সিত্তার কিতাবাদিতে। শরীয়তে ইসলামীতে কুরআন মজীদের পরই ক্রমানুযায়ী সিহাহ সিত্তার কিতাবসমূহের মর্যাদা। এগুলোর মোকাবেলায় অন্য কোন উৎসের দলীল ধর্তব্য নয়।

কিন্তু বিগত ২৭ শে অক্টোবর ২০০৮ ইং দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকায় হুমায়ূন আহমেদ কিছু দলিল পেশ করার চেষ্টা করেছেন যাতে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন প্রস্তাবিত বাউল মূর্তি নির্মাণকে বৈধতা দেয়া যায়। তিনি লিখেছেন– .... আমাদের মহানবী (সা.) কা'বা শরীফের ৩৬০টি মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেয়ালের সব ফ্রেসকো নষ্ট করার কথাও তিনি বলেন। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়লো কা'বার মাঝখানের একটি স্তম্ভে। যেখানে বাইজেন্টাইন যুগের মাদার মেরির একটি অপূর্ব ছবি আঁকা। নবীজী (সা.) সেখানে হাত রাখলেন এবং বললেন- এই ছবিটা তোমরা নষ্ট করো না।'

বক্তব্যের সমর্থনে তিনি সূত্র হিসেবে পেশ করেন আরব ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক লিখিত সীরাতে রাসূল বিষয়ক গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ "দি লাইফ অব মুহাম্মদ" কে। গ্রন্থটি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন আলফ্রেড গিয়োম। বর্ণনাটি পড়ে বিস্মিত হলাম যে, দু'লাইনের বক্তব্যে ৩টি বিচ্যুতি।

প্রথমতঃ লিখা হয়েছে মহানবী (সা.) কা'বা শরীফের ৩৬০ টি মূর্তি অপসারণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। নির্দেশ যে দেননি, তা নয়। কিন্তু তিনি স্বয়ং যে কাজটি করলেন, নেতৃত্ব দিলেন, সেখানে শুধু মৌখিক আদেশেরই কথা উল্লেখেই দায়সারা ঐতিহাসিক বিচ্যুতি।

দ্বিতীয়তঃ কা'বার মাঝখানের একটি স্তম্ভে মূর্তি অঙ্কিত ছিলো বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা অনির্ভরযোগ্য। মূর্তিগুলো প্রধানত ছিলো কা'বা ঘরের বাইরে দেয়ালের সাথে টেস দেয়ানো।

তৃতীয়তঃ বলা হয়েছে বাইজেন্টাইন যুগের মাদার মেরির ছবি অঙ্কিত ছিলো। এটা ভুল। কেননা কা'বা ঘর কেন্দ্রিক মূর্তিপূজা শুরু হয় বাইজেন্টাইন যুগের পরে। এ ছাড়া মক্কায় তখন কোন খ্রিস্ট্রীয় প্রভাব ছিলো না। তারা ইব্রাহীম আঃ এর দ্বীনে হানীফের অনুসারী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতেন। (আল ফওযুল কাবীরঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ)।

সেখানে কাবা ঘরে মা মেরির মূর্তি কীভাবে অঙ্কিত হবে? কে অঙ্কন করবে? সংশয় সৃষ্টি হলো, এ রকম বক্তব্য ইবনে ইসহাসের সীরাত গ্রন্থে আদৌ আছে

কিনা? থাকলে তা কীভাবে?

গ্রন্থটির মূল কপির সাথে ঠিক সংযোজন করে বৈরুত থেকে নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সেই সংস্করণে গ্রন্থের মূল কপি অবিকৃত রয়েছে। কিন্তু গ্রন্থটি তালাশ করে আরেকবার বিস্মিত হলাম যে, হুমায়ূন আহমেদ বর্ণিত মূল দাবি আরবী গ্রন্থে নেই। অথচ আলফ্রেড গিয়োমের গায়ে ভর দিয়ে তিনি বলে বসলেন- "মহানবীর (সা.) ইন্তেকালের পরেও ৬৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ধর্মপ্রাণ খলীফাদের যুগে কা'বা শরীফের মতো পবিত্র স্থানে এই ছবি ছিলো"।

অথচ আল্লাহর রাসূলের ঘোষণা "যে গৃহে কোনো প্রাণীর ছবি থাকে, তাতে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশ করবেন না। (বোখারী শরীফ) হুমায়ূন সাহেব যদি হাদিসটি পড়তেন, তাহলে হয়তো চিন্তা করতেন যে আল্লাহর রাসূল সা: কোন যুক্তিতে ছবি বিদ্যমান রেখে কাবা শরীফে রহমতের ফিরিশতা প্রবেশের পথ রুদ্ধ করবেন? হাসবো না কাঁদবো ভেবে পেলাম না। হুমায়ূন আহমেদ কাজটা করলেন কী?

তথ্য সংগ্রহের জন্য তিনি এমন উৎসের দিকে হাত বাড়িয়েছেন, যে উৎস অবিশ্বস্থ, বিশেষত ইসলামের বেলায়। ইউরোপ আমেরিকার অনেকেই ইসলাম বিষয়ে লিখছেন। কিন্তু অধিকাংশ লিখাই বিকৃত। এমন কি তাদের হাতে কুরআনের বিকৃত কপিও রচিত হচ্ছে এবং প্রচার হচ্ছে ইন্টারনেটে। অতএব তাদের মধ্যকার আলফ্রেড গিয়োম ইবনে ইসহাকের সীরাতগ্রন্থকে বিকৃত করেছেন, তাতে অবাক হবার কী আছে?

হুমায়ূন আহমেদ হযরত আয়শার (রা.) পুতুল খেলাকে ভাস্কর্যের বৈধতার প্রমাণ বানাতে যেয়ে হাসির উদ্রেক করেছেন। কেননা, প্রাণীর ভাস্কর্য ইসলামে নিষিদ্ধ এ জন্যেই যে, তার মাধ্যমে মূর্তিপূজার প্রতি প্রচ্ছন্ন একাত্মবোধ প্রকাশ করা হয়। সম্মান প্রদর্শন করা হয় ভাস্কর্যকে। কিন্তু পুতুল নিছকই খেলার বস্তু। কেউ তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ লালন করে না। হযরত ওমর (রা.) কে সম্বন্ধিত করে তিনি আরেকটি সন্দেহের অবতারণা করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদ পত্রিকায় আব্দুল বাছির লিখিত 'ইসলাম ও ভাস্কর্যঃ শিল্প বিরোধ ও সমন্বয়' রচনাটিকে দলিল বানিয়ে তিনি লিখেছেন–... ৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রা.) জেরুজালেম জয় করেন। প্রাণীর ছবিসহ একটি ধুপদানি তার হাতে আসে। তিনি সেটি মসজিদে নববীতে ব্যবহারের আদেশ দেন"।

মূল প্রবন্ধে আব্দুল বাছির কিন্তু একটা মস্তবড় ফাঁকি রেখেছেন। ফাঁকিটা হলো ধুপদানিতে অঙ্কিত প্রাণীর ছবিটাকে নষ্ট করা হয়েছে, সেটা উল্লেখ করা না করা। হুমায়ূন সাহেব আব্দুল বাছিরের এই ফাঁকিটার উপর দাঁড়ালেন। তিনি যদি

প্রণিধানযোগ্য কোন ঐতিহাসিক সূত্র তালাশ করতেন, তাহলে বাছির সাহেবের ফাঁকিটা সহজেই ধরতে পারতেন। কিন্তু কি আর করা? গরজ বড় বালাই।

শেখ সা'দীর কবরের কাছে নাকি তার একটা ছবি আছে। অনুরূপ ফরিদ উদ্দীন আত্তার ও জালালুদ্দিন রুমীর (রহ.) কবরের কাছেও নাকি ছবি আছে। অতএব হুমায়ূন সাহেব বলতে চান, মূর্তিপূজা বৈধ। কিন্তু শেখ সা'দীর কবরে কে বা কারা ছবি আঁকলো, সেটার দ্বারা ইসলামের মৌলিক নীতির পরিবর্তন হয়ে যায় না। দেখতে হবে শেখ সা'দী, জালালুদ্দিন রুমী কিংবা ফরীদুদ্দীন আত্তার (রাহ.) ভাস্কর্য সম্পর্কে কী দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করতেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসন্ধানের দাওয়াত রইলো হুমায়ূন সাহেবের প্রতি।

তিনি যদি দাওয়াত কবুল করেন, তাহলে শেখ সা'দীর অমর কাব্য গুলিস্তা-বুস্তাঁর বিভিন্ন ছত্রে পাবেন ভাস্কর্যের সমালোচনা, তার প্রতি ঘৃণা ও তার সমর্থকদের উদ্ভট চিন্তার উদ্ঘাটন। অনুরূপভাবে পাবেন জালালুদ্দীন রুমীর বিশ্ববিখ্যাত মসনবিয়ে রুমী কাব্যে এবং ফরীদুদ্দীন আত্তার (রাহ.) এর পান্দেনামায়। তারা প্রত্যেকেই ভাস্কর্যের পূজারী হওয়া থেকে রক্ষা করায় পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

হুমায়ূন আহমেদ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করলে তাদের জীবন দর্শনের স্বচ্ছতা তালাশ করতে পারেন তাদেরই লিখনীতে। এইসব ইসলামী মনীষী জগদ্বাসীর জন্য ভাস্কর্য চেতনা বিরোধী যে শিক্ষা ও দর্শন রেখে গেছেন, তা যুগ যুগ ধরে মানবজাতিকে শুদ্ধ ও বুদ্ধ জীবনীশক্তির প্রাণপ্রবাহ যুগিয়েছে।

শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী কী উদ্দেশ্যে তাদেরকে টেনে এনে কী প্রমাণ করতে চাইলেন, তার আগা-মাথা বুঝতে পারলাম না। তবে এইটুকু বুঝতে পেরেছি যে, তিনি মূলত ভাস্কর্যকে যেনতেন প্রকারে বৈধতা দিতে চান। আর এ জন্যে দলিলের সন্ধানে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন ইতিহাসের পাতায়। কিন্তু দুঃখ হুমায়ূন আহমেদের জন্য! কিছুই প্রমাণ করতে না পেরে দুধের স্বাদ ঘোল দিয়ে মেটাচ্ছেন।

তার সেই প্রয়াস তাকে মোটেও মহিমান্বিত করেছে না; বরং বিকেল বেলার আকাশকে ঢেকে দিচ্ছে অপ্রিয় কালোমেঘ। তাওহিদী মানুষের আকাশে শিরকের আচ্ছন্নতা ডেকে এনে কে কবে বিশ্বাসী হৃদয়ের শ্রদ্ধা পেয়েছে এই বাংলায়? ইতিহাসের ক্যানভাসে এমন একজন মানুষের উপস্থিতিও দেখতে পাই না।

(০৫-১১-২০০৮)

স মা প্ত